বুনিয়াদি আকাইদ

মৌলিক ইসলামি আকিদাসমূহ

মাওলানা বেলাল বিন আলী

বুনিয়াদি আকাইদ

(মৌলিক ইসলামি আকিদাসমূহ)

মাওলানা বেলাল বিন আলী

নজরে সানি

শাইখ তাহমীদুল মাওলা
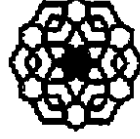
উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় দাদুকে, যিনি আজ পরকালের বাসিন্দা। যার নিয়ত ও পরামর্শে ১৪০০ বছরের এই নুরানি কাফেলায় আমার অংশগ্রহণ। দাদা-দাদিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

আমার মা-বাবাকে; যারা আজও আমার জন্য কষ্ট করে যাচ্ছেন; ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। মহান রব আমাদের তিন ভাইবোনের ওপর এই ছায়াকে আরও দীর্ঘ করুন। আমিন।

সেইসাথে আমার মুহতারাম সকল আসাতিজা; বিশেষত পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ (হাফি.), অত্যন্ত প্রিয় মুহসিন উস্তাজ মাওলানা আশরাফ হালিমী (হাতিয়ার হুজুর) (দা. বা.) এবং আমার 'মাদারে আসলি' মাদরাসাতুল মাদীনাহ-এর সকল আসাতিজায়ে কেরামকে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তার শান অনুযায়ী প্রতিদান দিন; মুহতারাম মরহুম নাজেম সাহেব হুজুর রহ.-কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

সর্বশেষ আমার দুই কন্যা সাওদাহ ও সাদীদাহ, আল্লাহ ওদের কবুল করে নিন এবং তাদের মায়ের ত্যাগ ও শ্রমের উত্তম বিনিময় মহান আল্লাহ তাআলা তাকে দান করুন। আমিন।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যার কোনো শরিক ও সমকক্ষ নেই, তিনি যাবতীয় দোষ, ক্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, স্থান, সময়, কাল, সীমা-পরিসীমা থেকে চিরপবিত্র; চিরপবিত্র দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। তাঁর পবিত্র সত্তা ছাড়া বাকি সবকিছু সৃষ্ট ও ধ্বংসশীল। সৃষ্ট কিছুই তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনিও সৃষ্টির সদৃশ নন। তিনিই আদি; তাঁর পূর্বে কিছু ছিল না। তিনিই অন্ত; তাঁর পরেও কিছু থাকবে না। তিনি এখনো তেমন আছেন, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন। দরুদ ও সালাম সকল নবি-রাসুলের ওপর; বিশেষত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

বলাবাহুল্য, যেকোনো ধর্মের মৌলিক ভিত্তি সাধারণত দুটি জিনিসের ওপর–ঈমান ও আমল। এ দুটির মধ্যে আবার মূল হচ্ছে ঈমান। কারণ ঈমান ছাড়া আমল প্রাণহীন দেহের ন্যায়। ফলে ঈমান যত মজবুত ও পরিপক্ব হবে, আমলও হবে তত সুন্দর ও অনুপুঙ্খ। হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে নসিহত করে বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى.

> তুমি আহলে কিতাবের একটি কওমের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান আনে।[১]

সেই ঈমানের রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র আকিদা ও বিশ্বাস; যা পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ব হওয়া ব্যতীত না শুদ্ধ হবে আমল, আর না সম্ভব পরকালীন মুক্তি। শুধু তাই নয়, নিত্যনতুন শিরক-কুফরের ছোবল থেকেও নিজেকে রক্ষার জন্য আকিদা পরিপক্ব করা এবং আকিদার পাঠ নেহায়েত জরুরি।

তা ছাড়া যুগ যত এগোচ্ছে, ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকিদা ও মতবাদ তত বাড়ছে। সেগুলোর উপস্থাপনও বেশ চাকচিক্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। আকিদা সম্পর্কে না জানা বা স্বল্প জানা যে-কেউ এই চাকচিক্যের ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে। ফলে ঈমান রক্ষার তাগিদে চাই প্রকৃত আকিদার জ্ঞান। আর তার জন্য আবশ্যক সালাফদের আকিদা জানা ও সে সংক্রান্ত বিশুদ্ধ কিতাবাদি পড়া।

আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, এ বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু লেখার তাওফিক দিয়েছেন। তবে এত তাড়াতাড়ি কোনো কিতাব লেখার ইচ্ছা আমার কখনো ছিল না। আমার মনে হতো এখন মুতালাআ করতে থাকি; বয়স যখন ৫০ বা তার থেকেও বেশি হবে, তখন বেঁচে থাকলে ও আল্লাহ তাআলা চাইলে লিখব। তবে এখন মনে হচ্ছে চিন্তাটি নিতান্তই ভুল ছিল।

তা ছাড়া গত কবছর নিয়মিত তাখাসসুসে দরস দানের সুবাদে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা অনেক তালিবুল ইলমের আকিদার হালতও নজরে এসেছে। না বলে পারছি না, তাদের অনেকের আকিদাসংক্রান্ত দৈন্যদশা আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করত। হাশাবি, হুলুলি, দেহবাদী ইত্যাদি অনেক আকিদাই তাদের কাছে অস্ফুট ও অস্পষ্ট।

দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা একজন তালিবুল ইলমের নিকট আকিদার বিষয়গুলো পুরোপুরি স্পষ্ট না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে বলে মনে হয় :

[১] দেশীয় মাকতাবাগুলোতে সঠিক ও বিশুদ্ধ আকিদার কিতাব ও শরাহ খুব কম পাওয়া যায়। অধিকাংশ কিতাব ও শরাহ দেহবাদী ও হাশাবিদের লিখিত। তালিবুল ইলমগণ যখন দেখে, দামও কম, ভাষাও সহজবোধ্য,

---

১. *বুখারি*, ৭৩৭২

তখন সরল মনে সংগ্রহ করে নেয় এবং নিজেদের অজান্তেই ভ্রান্ত আকিদার জালে জড়িয়ে যেতে থাকে।

[২] আকিদার পাঠও ততটা সুবিন্যস্ত না। মিশকাত জামাতে 'শরহুল আকাইদ' পড়ানো হয়, অথচ এটি আকিদার বেশ উঁচু স্তরের একটি কিতাব। এটি পড়ানো হয় এমন তালিবুল ইলমদের, যাদের অনেকের আকিদার সাথে পরিচয় হয় এই কিতাবের মাধ্যমে। আবার কারও ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে আকিদার সাথে পরিচয় থাকলেও এই কিতাবটি পড়ার জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও তথ্য জানা ছাড়াই কিতাবটি পড়া শুরু করে। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল তো অর্জন হয়ই না, বরং বিষয়বস্তু ও ইবারত জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মূল আকিদার তুলনায় কিতাবটির ইবারত হল করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

[৩] 'শারহুল আকাইদ' পড়ানোর সময় বিভিন্ন বাতিল ফেরকার আকিদা ও খণ্ডন নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বা বিশেষ করে আমাদের দেশের বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে আমাদের বিরোধটা কোথায় এবং তার জবাব কী, এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা না হওয়ার কারণে তালিবুল ইলমদের নিকট বিষয়গুলো অস্পষ্টই থেকে যায়।

[৪] জালালাইন জামাতে 'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া' কিতাবটি পড়ানো হয়। বেশ উপকারী ও মাকবুল একটি কিতাব। কিন্তু বেশ কিছু মাদরাসার তালিবুল ইলমদের সাথে আলোচনা করে ও খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তারা যে নুসখা বা কপি পড়ে এবং যে-সকল শরাহ মুতালাআয় রাখে, তা বিভিন্ন দেহবাদী ও হাশাবিদের লিখিত, যা খুবই দুঃখজনক। ফলে কিতাবটি থেকে সঠিক আকিদা অর্জিত হয় না; বরং দেহবাদী নুসখা ও শরাহ মুতালার কারণে দেহবাদী আকিদা অর্জনের মধ্য দিয়ে *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*র মতো একটি মাকবুল ও বিশুদ্ধ আকিদার কিতাবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

এমন আরও বেশ কিছু কারণে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা তালিবুল ইলমদের নিকট আকিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অস্পষ্ট থেকে যায়। আল্লাহ তাআলা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। আমিন।

তাখাসসুসের তালিবুল ইলমদের সাথে আকিদা নিয়ে আলোচনার পর প্রতি বছরই মনে হতো, একটা কিতাব লেখা দরকার এবং তারাও বলতেন, লেখা

দরকার ও খুবই জরুরি। কিন্তু পরে আর শুরু করা হতো না। অবশেষে করোনাকালে যখন আল্লাহ তাআলা মুতালাআর ফুরসত বাড়িয়ে দিলেন, তখন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর আমি এ কিতাবটি সংকলনের কাজে হাত দিই এবং ১৩ জুন ২০২১ তারিখে কিতাবের মৌলিক কাজ সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পরে দীর্ঘ একটি সময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাঝে দেওয়া হয়। অবশেষে কিতাবটি আজ সম্মানিত পাঠকের হাতে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।

কিতাব নিয়ে কিছু কথা

➥ কিতাবটিকে দুটি ভাগ করা হয়েছে; প্রথমভাগে আকিদার বুনিয়াদি ছয়টি বিষয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আকিদাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। মূল প্রতিটি বিষয় সাব্যস্তের জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দেওয়া হয়েছে। শাখাগত বিষয়ে কখনো কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দেওয়া হয়েছে, আবার কখনো সালাফদের বক্তব্য দ্বারা। কিছু বিষয় সকলের নিকট স্বতঃসিদ্ধ ও মতবিরোধমুক্ত হওয়ায় দলিল উল্লেখ না করে শুধু আকিদা উল্লেখ করা হয়েছে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কখনো ভিন্ন মতাবলম্বী ফিরকার মত উল্লেখ করে খণ্ডন করা হয়েছে, আবার কখনো মত উল্লেখ না করে সঠিক মত ও দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

➥ দ্বিতীয়ভাগে আকিদার সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু বিষয়কে দালিলিকভাবে পেশ করা হয়েছে, যে-সকল বিষয়কে পুঁজি করে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের দেহবাদী, হাশাবি ও বিদআতি বানিয়ে দিচ্ছে।

➥ কিতাবটিতে দলিল হিসেবে উল্লেখিত সকল হাদিস সহিহ ও হাসান পর্যায়ের। যে কিতাব থেকে মতন উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেই কিতাবের হাওলাই দেওয়া হয়েছে। কখনো সম্পূর্ণ আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে আবার কখনো শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ হয়েছে।

➡ প্রতিটি বিষয়ের মূল ও শাখাগত বিষয়গুলো বোঝা ও মুখস্থ রাখার সুবিধার্থে নম্বর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

➡ আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নির্ভরযোগ্য ইমামদের কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল ও শাখাগত গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলো যাচাই-বাছাই করে একত্ররূপে পেশ করা হয়েছে।

➡ বিভিন্ন বাতিল ফিরকার সাথে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল উল্লেখের সাথে সাথে সালাফদের বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কখনো শুধু সালাফদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে; যেন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারে, কারা প্রকৃত 'সালাফি'।

➡ আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মধ্যকার মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কখনো উল্লেখযোগ্য সকল মত ও দলিল উল্লেখ করে শেষে মজবুত ও প্রণিধানযোগ্য মতটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কখনো সকল মত উল্লেখ না করে শুধু প্রণিধানযোগ্য মতটি দলিলসহ বা কোনো ইমামের বক্তব্যসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

➡ আকিদাগুলো যথেষ্ট সহজ-সরল ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তালিবুল ইলম এবং সাধারণ পাঠক সহজেই বুঝতে ও শিখতে পারেন।

➡ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা বিস্তারিত পেশ করার পর শেষে আবার খোলাসা আকারে পেশ করা হয়েছে; যেন স্মরণ রাখতে ও মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

➡ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহে নিজ থেকে কোনো মত দেওয়া হয়নি। তবে যে মতটি প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে, তা কোনো ইমামের বক্তব্যসহ নকল করা হয়েছে।

➡ কিতাবটিতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে কিছুটা নতুনত্বসহ সালাফদের ধাঁচে লিখতে চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে জালালাইন ও মিশকাতের তালিবুল ইলমগণ *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া* ও *শারহুল আকাইদ* পড়ার সময় কিতাবটি মুতালাআয় রাখলে আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আকিদা ও আকিদা-সংক্রান্ত আলোচনার খোলাসা ও বিভিন্ন

ইখতেলাফের ভিত্তি ও পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবে। সাথে সাথে আকিদার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইবারতের বিষয়ে সঠিক বুঝ ও স্পষ্ট ধারণাও পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

➥ ইখতেলাফপূর্ণ বিষয়গুলোতে ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এবং হানাফি মাজহাবের অন্যান্য ইমামের বক্তব্য উল্লেখের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ-এর কিছু বক্তব্যের সঠিক অর্থ ও মর্মও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা দেহবাদীসহ বাতিল ফিরকাগুলো তার আকিদাকে গোমরাহ বলে না ঠিক; কিন্তু তার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মুসলিমদের গোমরাহ করে।

➥ কিছু বিষয়ের শেষে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লিখে বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো নুকতা বা পয়েন্টের দিকে ইশারা ও সতর্ক করা হয়েছে।

❋❋❋
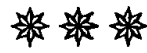
পরিশেষে সম্মানিত দুজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। একজন হলেন মুহতারাম উস্তাজ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা সাহেব দা. বা.। তিনি অত্যন্ত দরদ, আন্তরিকতা ও সময় নিয়ে অধমের এ কিতাবটি পড়েছেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে দিয়েছেন।

আরেকজন হলেন আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর মাওলানা নুরুল্লাহ মারুফ। বহু ব্যস্ততার মাঝে তিনি আমার কিতাবটি পড়েছেন এবং ভাষাগত সম্পাদনা করে আমার লেখাগুলোকে পড়ার উপযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা উভয়কে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

এ ছাড়াও যারা নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, যাদের তাসনিফাত বা কিতাবসমূহ আমাকে পথনির্দেশ করেছে, এবং আমার মতো অজানা-অচেনা একজনের কিতাব প্রকাশের জন্য যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; বিশেষত চেতনা প্রকাশনের কর্ণধার মাওলানা বোরহান আশরাফী—আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন, আমিন।

সবশেষে মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিতাবটিতে বারংবার চোখ বোলানো সত্ত্বেও ভুল রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকের খেদমতে আমার আরজ, কোথাও যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, নির্দ্বিধায় আমাকে জানানোর অনুরোধ। পরবর্তী সংস্করণে তা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হবে ইনশাআল্লাহ।

পাঠক সমীপে একটি দোয়ার নিবেদন করে কথা শেষ করি। সবকিছু যদি ঠিক থাকে, তাহলে আগামী রমজান (১৪৪৪ হিজরি/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ইনশাআল্লাহ কোনাপাড়ায় **মারকাযু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ**[২] নামে একটি মাদরাসার যাত্রা শুরু হচ্ছে। মক্তব, হিফজ ও মাদানি নেসাবের পাশাপাশি যে বিভাগটির প্রতি আমার বেশি আগ্রহ, সেটি হচ্ছে আকিদা বিভাগ। এক বছর মেয়াদি এ বিভাগটি নিয়ে আমি বেশ আশাবাদী। ইনশাআল্লাহ, আকিদা বিভাগে মৌলিক ছয়টি বিষয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলিলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে সকল আকিদা জানা এবং ফিরাকে বাতিলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে। সেইসাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, তিনটি স্তরের আকিদার কিতাব পড়ানো হবে এবং বোঝা ও বোঝানোর মতো যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া ও *বুনিয়াদি আকাইদ*—কিতাব দুটিকে সামনে রেখে আগামী রমজানে মাত্র ১৬ দিনের আকিদার একটি তাদরিবের প্রস্তুতির কাজ চলছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাদরিবটিতে আকিদা-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমিন।

মক্তব ও হিফজ বিভাগে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিফজ সম্পন্ন করে কিতাব বিভাগে আনার চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া মাদানি নেসাবের আদলে গড়ে তোলা কিতাব বিভাগটিতে নিয়মতান্ত্রিক সিলেবাসের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে আকিদা গঠনের প্রতি, ইনশাআল্লাহ। আমার দৃঢ় ইচ্ছা অন্তত মেশকাত জামাতের

---

২. এই নামকরণ করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর প্রধান মুফতি ও শাইখুল হাদিস এবং হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা আল্লামা মুফতি আহমদুল্লাহ সাহেব দা. বা.। মাওলানা রেজাউল করিম বোখারী ভাই এ ক্ষেত্রে যারপরনাই সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

পূর্বেই যেন প্রত্যেক তালিবুল ইলমের আকিদা মজবুত ও পরিপক্ব হয়ে যায় এবং আকিদাবিষয়ক যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।[৩]

তাওফিক ভিক্ষা চাই মহান আল্লাহর দরবারে। দোয়ার নিবেদন করি পাঠকদের কাছে। যেন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় প্রতিকূলতা দূর করে দ্বীনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার তাওফিক দান করেন এবং একে তাঁর দ্বীন রক্ষার ঘাঁটি হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন।

মাওলানা বেলাল বিন আলী
ই-মেইল : belalbinali24@gmail.com
২০ রমজান ১৪৪৩

৩. ঠিকানা : সামসুল হক খান স্কুল রোড, মডার্ন হারবাল সংলগ্ন, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬২। যোগাযোগের নম্বর : ০১৮৬২-৫০৯৩৩৯

সূচিপত্র

কেয়ামত সম্পর্কে আকিদা □ ৯৮

পরকাল সম্পর্কিত আকিদা □ ১১১

কলম, লাওহে মাহফুজ, আরশ, কুরসি, রুহ সত্য □ ১৫০

আকিদাসংক্রান্ত অন্যান্য জরুরি আলোচনা □ ১৭২

ঈমানের পরিচয় ও তার প্রকার

১. ঈমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা, যেমন ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাদের বাবাকে বলেন,

﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾

> আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই।[৪]

২. ঈমানের পারিভাষিক অর্থ

যে-সকল বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা এবং মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া। যেগুলো বিস্তারিত, তার ওপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা আর যেগুলো সংক্ষিপ্তরূপে প্রমাণিত, তার ওপর সংক্ষিপ্তরূপে ঈমান আনা।

৩. ঈমানের দাবি হলো

কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ছাড়া, প্রশান্তচিত্তে বিশ্বাস করবে এবং স্বীকার করবে, আল্লাহ সত্য, ইসলাম সত্য এবং সর্বশেষ নবি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা-কিছু নিয়ে এসেছেন সব সত্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৪. সুরা ইউসুফ, ১৭

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন। এবং ওই কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাজিল করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও কেয়ামত দিবসকে, সে চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।[৫]

সাধারণ মুসলিমদের জন্য হাদিসে জিবরিল অনুযায়ী ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ . قَالَ "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" ، قَالَ صَدَقْتَ .

সে বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবিগণ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।[৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله حق.

তাওহিদের মূল এবং যার ওপর বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয় তা এই যে, অবশ্যই বলতে হবে, আমি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, শেষ দিবস, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান, তাকদির, যার ভালো ও মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং হিসাব, মিজান, জান্নাত, জাহান্নামের ওপর ঈমান এনেছি। আর এ সবই সত্য।[৭]

---

৫. সুরা নিসা, ১৩৬

৬. *মুসলিম*, ১

৭. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৪

৪. ঈমানের রোকন ও স্তম্ভ :

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان.

ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[৮]

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.

ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[৯]

ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

الإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة.

অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট ঈমান হলো জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।[১০]

ব্যাখ্যা : ঈমানের রোকন ও স্তম্ভ হলো দুইটি :

ক. মূল রোকন।

খ. অতিরিক্ত রোকন।

ঈমানের মূল রোকন হলো, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, যা সর্বদা থাকা আবশ্যক। আর অতিরিক্ত রোকন হলো, মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেওয়া। উল্লেখ্য, মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি অতিরিক্ত রোকন হলেও পার্থিব নানান হুকুম কার্যকর হওয়ার স্বার্থে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একবার হলেও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি দেওয়া শর্ত।

৫. মানুষের প্রকার ও তার হুকুম :

ক. যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করবে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেবে, সে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের নিকট মুমিন বলে গণ্য হবে।

---

৮. *আল-ওয়াসিয়্যাহ*, ৪৯

৯. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ২১

১০. *বাহরুল কালাম*, ৭৭

খ. যে ব্যক্তি অন্তরে অবিশ্বাস করবে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেবে না, সে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের নিকট কাফের বলে গণ্য হবে।

গ. কেউ যদি মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেয়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না করে, যেমন মুনাফেক, সে মানুষের নিকট মুমিন বলে গণ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট নয়।

ঘ. কেউ যদি অন্তরে বিশ্বাস করে কিন্তু মৌখিকভাবে একবারও স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। তবে যদি মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না দিতে সে বাধ্য হয়, অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহলে কাফের হবে না।

৬. ঈমানের মাঝে কোনো সন্দেহ থাকা কুফর। এজন্য সন্দেহের সাথে বলা যাবে না, 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন'।

৭. হারাম জেনে কোনো মুমিন গুনাহ করলে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় না। চাই তা গুনাহে কবিরা হোক বা সগিরা। তবে কোনো গুনাহ যদি স্পষ্ট কুফর বোঝায়, তাহলে তা ভিন্ন। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা। কুরআনকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া (নাউজুবিল্লাহ), বা অন্যভাবে অপমান করা ইত্যাদি।

৮. ঈমান আনার পর যত গুনাহই করুক, কোনো ক্ষতি হবে না, এটা ভুল আকিদা।

৯. কোনো মুমিনকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করা যাবে না, যতক্ষণ না সে এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে, যা সে বিশ্বাস করার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে জবানে অস্বীকার করা বা অন্তরে অবিশ্বাস করা অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে বিশ্বাস ও সত্যায়ন না করা। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.

> বান্দা ঈমান থেকে বের হবে না। তবে যদি সে এমন কিছুকে অস্বীকার করে, যা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে ইসলামে প্রবেশ করেছে, তাহলে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে।[১১]

---

১১. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ২১

১০. ঈমান ও কুফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয় মৃত্যুর সময়। যেমন কেউ সারাজীবন মুসলিম ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময় নিজ ইচ্ছায় কুফরি কালিমা উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সে কাফের বলে সাব্যস্ত হবে। আরেকজন সারাজীবন কাফের ছিল, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্বে ঈমানসুলভ কোনো কালিমা উচ্চারণ করল, তাহলে সে মুমিন বলে সাব্যস্ত হবে।

১১. মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কিংবা স্বচক্ষে কেয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকাবস্থায় ঈমান আনলে তা কবুল হয় না। কারণ মুমিন বলা হয় যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর থেকে বর্ণিত সকল বিষয়ের ওপর না দেখেই ঈমান আনবে। যদিও কোনো বিষয় তার বুঝে না আসে।

১২. ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য :

আভিধানিক অর্থে ঈমান হচ্ছে কোনোকিছুকে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা। আর ইসলাম হচ্ছে 'আত্মসমর্পণ'। ফলত ইসলাম আভিধানিকভাবে ঈমানের তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কেননা ইবাদত করা যেমন আত্মসমর্পণ, তেমনই বিশ্বাস করাও একপ্রকার আত্মসমর্পণ।

তবে হ্যাঁ, পরিভাষায় ঈমান ও ইসলাম এক। কতক ইমাম অবশ্য বলেন, এক নয়, বরং উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঈমানের সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের সাথে আর ইসলামের সম্পর্ক হলো আমলের সাথে। অবশ্য এ পার্থক্যসত্ত্বেও একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। যেমন ইসলাম যদি হয় দেহ, ঈমান তার প্রাণ। ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক সমর্পণ, আর ঈমান হচ্ছে আত্মিক সমর্পণ। আবার কতক ইমাম বলেন, একসাথে যদি উভয় শব্দ ব্যবহার হয়, তখন অর্থ হবে ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে যদি পৃথকভাবে ব্যবহার হয়, তাহলে যেকোনো একটি উভয় শব্দের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৩. ঈমানের জন্য কি আমল শর্ত?

আলেমদের মধ্যকার এ বিষয়ক ইখতেলাফ হচ্ছে শব্দগত ইখতেলাফ। আমলকে যারা ঈমানের অংশ মনে করেন, তারা খাওয়ারিজদের ন্যায় এমন অংশ বলেন না যে, আমল না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুমিনই থাকবে না। আবার আমলকে যারা ঈমানের অংশ মনে করেন না, তারা আমলের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

والعمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال : ارتفع عنه الإيمان ، فإن الحائض رفع الله سبحانه وتعالى عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال : رفع عنها الإيمان وأمرها بترك الإيمان ... ويجوز أن يقال : ليس على الفقير الزكاة ولا يجوز أن يقال : ليس على الفقير الإيمان.

আর আমল যেমন ঈমান নয়, ঈমানও তেমনই আমল নয়। যেমন অনেক সময় আছে, মুমিনের জিম্মা থেকে আমল রহিত হয়ে যায়। (এর ফলে) তার থেকে ঈমান রহিত হয়ে গেছে এমন কথা বলা বৈধ নয়। যেমন ঋতুমতী নারী থেকে আল্লাহ নামাজকে রহিত করে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, তার থেকে ঈমানকে রহিত করে দিয়েছেন এবং তাকে ঈমান ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।... একইসাথে গরিবের ওপর জাকাত নেই এমন কথা বলা বৈধ হলেও (জাকাতের বিধান নেই বলে) 'গরিবের ঈমান নেই' বলা কিন্তু বৈধ নয়।[১২]

তিনি আরও বলেন,

فالمؤمنون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويذكرون الله وليس من قبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بالله يؤمنون.

মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস থেকেই নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত এবং আল্লাহর জিকির ইত্যাদি আদায় করে। বিষয়টা এমন নয় যে, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাতের কারণে তারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে।[১৩]

❋❋❋

১২. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫০
১৩. *আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম*, ৩৬

ঈমান ও আমল

ঈমানের জন্য আমলকে শর্ত করার বিষয়ে কয়েকটি মাজহাব :

ক. খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতে আমল ঈমানেরই অংশ। কাজেই আমল ছেড়ে দিলে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।

ঈমান থেকে বের হওয়ার ফলে কাফের হয়ে যাবে কি না তা নিয়ে আবার তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়ারিজদের দাবি, আমল ছাড়ার ফলে ঈমান থেকে বের হয়ে সরাসরি কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি। আর মুতাজিলাদের দাবি, কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে থাকবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি, তবে তাদের আজাব কাফেরদের আজাব থেকে হালকা হবে।

খ. মুরজিয়াদের বক্তব্য হলো, আমলের কোনো প্রয়োজনই নেই। পরকালীন নাজাতের জন্য শুধু 'অন্তরের বিশ্বাসই' যথেষ্ট।

গ. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বক্তব্য হলো, ঈমানের সাথে সাথে নিশ্চয় আমলেরও প্রয়োজন আছে। তবে অলসতা করে আমল ছেড়ে দিলে ফাসেক ও গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফের হবে না। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে আজাব দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। তবে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না।

বলাবাহুল্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত যেমন খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতো বাড়াবাড়ি করেন না, তেমনই মুরজিয়াদের মতো শিথিলতাও করেন না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> واعلم أني أقول : أهل القبلة مؤمنون، لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيئ من الفرائض، فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندنا، من ترك الإيمان والعمل كان كافرا من أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضيع شيئا من الفرائض كان مؤمنا مذنبا، وكان لله تعالى فيه المشيئة، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

জেনে রাখো আমার মত হলো, আহলে কিবলা মুমিন। কোনো ফরজ বিধান নষ্ট করার কারণে আমি তাদেরকে ঈমান থেকে বের করে দেবো না। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সকল ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে আমাদের নিকট জান্নাতি। আর যে ঈমান ও আমল (উভয়টা) ছেড়ে দেবে, সে কাফের, জাহান্নামি। আর যার ঈমান আছে কিন্তু কোনো ফরজ বিধান নষ্ট করেছে, সে গুনাহগার মুমিন, তার বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছা থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আজাব দেবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।[১৪]

১৪. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا تتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا.

ঈমান বাড়েও না, কমেও না। কেননা ঈমান কমে যাওয়ার মানে যেমন কুফর বৃদ্ধি পাওয়া, তেমনই ঈমান বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো কুফর হ্রাস পাওয়া। সুতরাং একই ব্যক্তি একসাথে মুমিন, আবার কাফের, এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে?।[১৫]

ব্যাখ্যা : ঈমানের দুটি দিক রয়েছে—

ক. ঈমানের সত্তাগত দিক।

খ. ঈমানের গুণগত দিক।

ক. ঈমানের সত্তাগত দিক : সত্তাগত দিক থেকে ঈমান এমন কোনো জিনিস নয়, যা ভাগ ও খণ্ড খণ্ড হতে পারে। এ কারণেই সত্তাগত দিক থেকে সকল মুমিনের ঈমান যেমন এক ও সমান, তেমনই সেই একই কারণে সত্তাগত দিক থেকে ঈমান বাড়েও না, কমেও না। কেননা ঈমান কমে যাওয়ার অর্থ হলো কুফর বৃদ্ধি পাওয়া আর ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো কুফর কমে যাওয়া। এটা তো স্পষ্ট যে, ঈমান ও কুফর পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি জিনিস। সুতরাং তা একসাথে হওয়া অসম্ভব।

---

১৪. *রিসালাতু আবি হানিফা ইলা উসমান আল-বাত্তি*, ৬

১৫. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৪৯

খ. ঈমানের গুণগত দিক : ঈমানের গুণগত দিকটি হলো ঈমানের নুর ও পূর্ণতা। আমলের মাধ্যমে ঈমানের নুর যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই গুণগত দিক থেকে তা পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সত্তাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধিও পায় না এবং হ্রাসও হয় না। কাজেই আমলের সাথে ঈমানের সত্তাগত দিকের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এর সম্পর্ক হলো ঈমানের গুণগত দিকের সাথে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নবি-রাসুল, সিদ্দিকিন ও সাধারণ মানুষের ঈমান সত্তাগত দিক থেকে সমান হলেও শক্তি ও মজবুতির দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নবিদের ঈমান বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব, কেননা তা বাস্তব দেখার মাধ্যমে অর্জিত। সিদ্দিকিনদের ঈমান মজবুত দলিলের মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় টলাতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল মানুষের ঈমান সর্বদা একটা ঝুঁকিতে থাকে। কেননা তা নবি ও সিদ্দিকিনদের মতো মজবুত দলিলের মাধ্যমে অর্জিত নয়। এজন্যই তারা সর্বদা দোয়ায় বলবে,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾

হে আমাদের রব! আপনি আমাদের হেদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত করবেন না।[১৬]

১৫. ঈমানে তাহকিকি ও ঈমানে তাকলিদি :

ঈমানে তাহকিকি হচ্ছে, যে-সকল বিষয়ে ঈমান রাখা জরুরি, তার প্রতিটি বিষয়ের ওপর দলিলসহ ঈমান রাখা। আর ঈমানে তাকলিদি হচ্ছে, দলিল না জেনে ঈমান রাখা। উভয় প্রকার ঈমানই গ্রহণযোগ্য। দলিলসহ ঈমান রাখা ঈমানের মূল শর্ত নয়, বরং ঈমান পূর্ণতার শর্ত।

❋❋❋

---

১৬. সুরা আলে-ইমরান, ৮

শিরক ও তার প্রকার

শিরকের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের মাঝে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

পরিভাষায় শিরক বলা হয়, আল্লাহ তাআলার জাত, সিফাত, ইবাদত, হুকুম, ইলম ও ক্ষমতার মাঝে শরিক তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, কোনোকিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করো না।[১৭]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

নিশ্চিত জেনো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম।[১৮]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শারিকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেউ যদি কোনো কাজ করে এবং তাতে আমি ছাড়া অপর কাউকে আমার সাথে শরিক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।[১৯]

---

১৭. সুরা নিসা, ৩৬

১৮. সুরা মায়েদা, ৭২

১৯. *মুসলিম*, ২৯৮৫

শিরকের প্রকার

ক. জাত বা সত্তার মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার সাথে বিভিন্ন খোদা বা প্রভুতে বিশ্বাস করা শিরক। যেমন খ্রিষ্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজকরা একাধিক প্রভুতে বিশ্বাসী।

খ. সিফাতের মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত মাখলুকের জন্য সাব্যস্ত করা শিরক এবং তাঁকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া শিরক। যেমন—

১. কোনো নবি বা অলি-পির সম্বন্ধে এই আকিদা রাখা যে, তারা আমাদের সবকিছু শোনেন ও দেখেন এবং আমাদের সকল অবস্থা জানেন।

২. কোনো নবি বা অলি-পির সম্বন্ধে এই আকিদা পোষণ করা যে, তারা সব জায়গায় থাকেন ও আসতে পারেন।

৩. কোনো অলি-পির-দরবেশকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি তা শুনতে পাচ্ছেন।

৪. মানুষ যেমন দেহবিশিষ্ট, আল্লাহ তাআলাকে তেমন দেহবিশিষ্ট বলে মনে করা শিরক।

৫. কোনো অলি-পিরের কবরের নিকট সন্তান ও অন্য কোনো উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রার্থনা করা শিরক।

গ. ইবাদতের মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা যে-সকল ইবাদত বান্দাকে শুধু তাঁর জন্য করার আদেশ করেছেন, সে সকল ইবাদত গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা শিরক। যেমন—

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা বা রুকু করা।

২. কোনো কবরকে সেজদা করা।

৩. কোনো নবি বা অলি-পিরের জন্য রোজা রাখা।

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কুরবানি ও মান্নত করা।

৫. কারও দরগা বা কবরকে আল্লাহ তাআলার ঘরের মতো তাওয়াফ করা।

৬. কারও নামের অজিফা পাঠ করা।

৭. ছবি, ফটো বা মূর্তি রাখা। বিশেষত কোনো বড় ব্যক্তির ছবি সম্মানের জন্য রাখা ইত্যাদি।

ঘ. হুকুমের মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম, এই হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, শাসক, পির ও অলিকে তাঁর সমপর্যায়ের বিধানদাতা মনে করা শিরক।

ঙ. ইলমের মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : ইলমুল গাইব বা অদৃশ্যের সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলা রাখেন। সুতরাং গাইরুল্লাহর জন্য ইলমুল গাইবের বিশ্বাস রাখা শিরক। যেমন—

১. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন বলে বিশ্বাস করা।

২. অমুক নবি বা ব্যক্তি গায়েব জানেন অথবা বিশ্বজগতের সবকিছু জানেন, এমন বিশ্বাসও শিরক।

৩. কোনো নবি, অলি-পির, জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন আকিদা রাখা যে, সে গায়েব জানে, তাহলে শিরক হবে।

৪. গণকের নিকট বা যার ঘাড়ে জিন সওয়ার হয়েছে, তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট জিজ্ঞাসা করা শিরক।

৫. পাখি বা বানরের মাধ্যমে অদৃষ্ট জানা শিরক।

৬. কারও জ্ঞান আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের মতো বিশ্বাস করা শিরক ইত্যাদি।

চ. ক্ষমতার মাঝে শিরক

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা সকলকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা-ই হয়, আর যা চান না, তা কখনো হয় না। সুতরাং কোনো মাখলুকের জন্য আল্লাহ তাআলার মতো ক্ষমতা সাব্যস্ত করা শিরক। যেমন—

১. কোনো পির বা অলি সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, এমন বিশ্বাস করা শিরক।

২. কোনো অলি-পির, জিন-পরি বা ভূত-ব্রাহ্মণকে লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করা শিরক।

৩. কুলক্ষণ বা সুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক।

৪. কোনো দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা শিরক।

৫. কারও ক্ষমতাকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার মতো মনে করা শিরক।

৬. ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাথরের প্রভাব বিশ্বাস করা শিরক।

একটি সংশয়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

> নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। শিরক ছাড়া অন্য যা গুনাহ আছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[২০]

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বুঝে বা না বুঝে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে সে ঈমান আনে এবং তাওবা করে, এখন কি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন?

উত্তর : উল্লিখিত আয়াতটি মৃত্যুসন্নিকটবর্তী অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুর সময় তিনটির যেকোনো একটি অবস্থায় থাকে—

১. মুশরিক অবস্থায় মারা যায়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। মৃত্যুর সাথে সাথে সে জাহান্নামে চলে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের তাফসির হলো, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা গেল, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।

২. মুসলিম অবস্থায় মারা গিয়েছে। তবে সে দুনিয়াতে চেষ্টা করেছে সগিরা ও কবিরা—সকলপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে। শয়তানের ধোঁকায় কখনো হয়ে গেলে, সাথে সাথে মন থেকে তাওবা করে নিয়েছে এবং তাওবার

---

২০. সুরা নিসা, ৪৮

পরবর্তী সকল শর্ত মেনে চলেছে। আশা করা যায় এমন ব্যক্তি মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। ইনশাআল্লাহ।

৩. মুসলিম অবস্থায় মারা গিয়েছে এবং জীবনে সগিরা ও কবিরা গুনাহও করেছে, কিন্তু তাওবা না করেই মৃত্যু হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। এমন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে আপন রহমতে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। অথবা তিনি যাদেরকে সুপারিশ করার অধিকার দেবেন, তাদের কারও সুপারিশের মাধ্যমে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে ঈমান থাকার কারণে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না, বরং কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

➥ কিছু বিষয়ের সাথে শিরক শব্দটির ব্যবহার পাওয়া গেলেও মূলত সেখানে প্রকৃত শিরক উদ্দেশ্য নয়। এগুলোকে ওলামায়ে কেরাম শিরকে খফি ও ছোট শিরক বলেন।

➥ তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, অসিলা ইত্যাদি কাজকে ঢালাওভাবে শিরক বলা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত আকিদাসমূহকে মৌলিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

ক. আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্তা সম্পর্কে আকিদা। এটার আবার দুটি ভাগ—

১. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে আকিদাসমূহ রাখা আবশ্যক।

২. আল্লাহ তাআলাকে যে আকিদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক।

খ. আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকিদা।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে আকিদাসমূহ রাখা আবশ্যক

ইমাম সানুসি রহ. বলেন,

ويجب على كل مكلف شرعا : أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل ، وما يجوز ، وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

শরিয়তের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ওপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কোন আকিদাগুলো রাখা ওয়াজিব এবং কোনগুলো তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব এবং কোনগুলো তাঁর জন্য বৈধ, এ সকল আকিদা সম্পর্কে জানা এবং নবি-রাসুলগণ আ. সম্পর্কেও অনুরূপ আকিদাগুলো জানা আবশ্যক।[২১]

১. আল্লাহ তাআলা এক, যার কোনো শরিক ও সমকক্ষ নেই।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্তার ক্ষেত্রে যেমন কাউকে শরিক করা যাবে না, তেমনই তাঁর সকল সিফাত ও গুণাবলির ক্ষেত্রেও কাউকে শরিক করা যাবে না।

২. আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই।

৩. তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁর থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি।

---

২১. আল-আকিদাতুস সুগরা, ১২৬

৪. তিনিই একমাত্র ফয়সালা দানকারী এবং একমাত্র বিচারক। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারেন অথবা বাতিলও করতে পারেন।

৫. আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফর। এ অবস্থায় মারা গেলে, চির জাহান্নামি। (আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন, আমিন।)

৬. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন।

ব্যাখ্যা : যখন কোনো বান্দা নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথ তালাশ করে অথবা সৃষ্টিকর্তার নিকট সঠিক পথ প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে তাকে সঠিক পথ দেখান এবং তার মধ্যে সঠিক পথ গ্রহণের অবস্থা তৈরি করে দেন। পক্ষান্তরে যখন কোনো বান্দা নিজ ইচ্ছায় গোমরাহির পথ বেছে নেয়, তখন তিনি তাকে গোমরাহ করেন। এটাই আল্লাহ তাআলার ন্যায়সংগত ফয়সালা।

৭. সকল অবস্থার খালিক ও মালেক একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

ব্যাখ্যা : ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, আরাম-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি সকল অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে এবং কোনো অবস্থাতেই এগুলো তাঁর হিকমত থেকে খালি নয়।

৮. সবকিছু আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন।

৯. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সকল সিফাত ও গুণ 'আজালি' তথা অনাদি। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

> ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته.
>
> আল্লাহ তাআলা তাঁর যাবতীয় অনাদি গুণসহ সমুদয় সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে এমন কোনো সিফাত বা গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে তাঁর সিফাত হিসাবে ছিল না।[২২]

---

২২. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ৯

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার জাত ও সকল সিফাত অনাদি। কাজেই তাঁর জন্য এমন কোনো সিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না, যা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর সিফাতরূপে ছিল না।

১০. আল্লাহ তাআলা ও তার সকল সিফাত আবাদি তথা চিরস্থায়ী। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.

> তিনি তাঁর যাবতীয় গুণসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনই এ সকল গুণসহ অনন্তকাল থাকবেন।[২৩]

ব্যাখ্যা : তিনি পূর্ব থেকেই যে-সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, অনন্তকাল তিনি সেসব গুণের অধিকারী থাকবেন। এমন নয় যে, কোনো গুণ আগে ছিল না, পরে হয়েছে। বা আগে ছিল কিন্তু পরে নেই; বরং তাবৎ সৃষ্টির আগে থেকে নিয়ে ধ্বংসের পর পর্যন্ত তিনি ও তাঁর সকল গুণ চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল।

১১. একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকলপ্রকার ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

১২. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে তিনি গঠিত নন।

১৩. তিনি সমগ্র সৃষ্টির একক নিয়ন্ত্রক, যার কখনো তন্দ্রা ও নিদ্রা পায় না।

১৪. আল্লাহ তাআলাই একমাত্র জীবন দানকারী এবং মৃত্যু দানকারী।

ব্যাখ্যা : তিনি যাকে যতদিন ইচ্ছা জীবিত রাখেন। আবার যখন যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করেন। তাঁর যতদিন ইচ্ছা, তিনি এই বিশ্বজগৎকে টিকিয়ে রাখবেন। আবার যখন ইচ্ছা হবে, সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন।

১৫. এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁকে পরাস্ত ও অক্ষম করতে পারে। অথবা তাঁর কোনো ফয়সালাকে কার্যকর করা থেকে তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

---

২৩. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ৯

১৬. মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তি দ্বারা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে ও তাঁকে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

১৭. আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা : আমাদের জানা ও আল্লাহ তাআলার জানা এক নয়। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জেনে থাকি এবং আমাদের জানার মাঝেও ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকে। যেমন সময়ের বিচারে যেকোনো বিষয়ে আমরা প্রথমে কিছুই জানি না। তারপর ধীরে ধীরে জানতে থাকি এবং একসময় অনেককিছু ভুলেও যাই। প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা সাধারণত বিভিন্ন জিনিস দেখে, পড়ে ও চিন্তা করার মাধ্যমে জানি। আবার সবকিছু জানার পরও মাঝে মাঝে দেখা যায়, আমাদের জানার মাঝে অনেক ভুল থেকে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু থেকে মুক্ত। তিনি শুরু থেকেই সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণরূপে জানেন এবং তাঁর জানা সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে চিরপবিত্র।

তিনি অনাদি এবং অনন্তকালের সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। যা-কিছু অস্তিত্বে এসেছে এবং ভবিষ্যতে আসবে কিংবা কখনোই আসবে না, সে সকলকিছু সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার জানেন। প্রতিটি বস্তু অস্তিত্বে আসার আগে কেমন ছিল এবং পরে কেমন হবে তা সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট জ্ঞাত। তাঁর এ সকল জানার মাঝে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন কখনো হয় না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তা ছাড়া তিনি কখনো কিছু ভুলে যান না।

আসমান ও জমিনের কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিসীমার বাহিরে নয়। তাঁর জ্ঞান উপস্থিত কোনো জ্ঞান নয় এবং কোনো মাধ্যম থেকেও অর্জিত নয়। জ্ঞানের জন্য তিনি কোনো মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মুখাপেক্ষী নন।

সৃষ্টি ও বান্দার ওপর তাঁর জ্ঞানের প্রভাব পড়ে না। যেমন অমুক এই অপরাধটি করবে, এটা তিনি জানেন বলে সে অপরাধটি করেছে ব্যাপারটা এমন নয়। (নাউজুবিল্লাহ)

১৮. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা : আমাদের ক্ষমতা আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা এক নয়। আমাদের ক্ষমতা সৃষ্ট। অর্জিত হয় বিভিন্ন মাধ্যম ও সাহায্য কর্তৃক। তা ছাড়া সবার ওপর আমাদের ক্ষমতা একরকমও হয় না। কারও বেলায় আমরা ভয়াল

দাপুটে, আবার কারও বেলায়-বা অক্ষম-অকর্মণ্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা এ সকল ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র।

তাঁর ক্ষমতাকে নাজায়েজ ও মন্দ জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যেমন এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু বলেন না। কিংবা তিনি জুলুম করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু করেন না। অথবা এ কথা বলা যে, তিনি মূর্খতাপূর্ণ কাজ করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু করেন না। এ জাতীয় কথা বলা ও বিশ্বাস করা জায়েজ নেই। আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাকে সম্পৃক্ত করা হবে কেবল সম্ভাব্য সকল জায়েজ বিষয়ের সাথে।

১৯. আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা।

ব্যাখ্যা : আমাদের শ্রবণ ও আল্লাহ তাআলার শ্রবণ এক নয়। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে শুনি এবং আমাদের শোনার মাঝে নানান ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকে। যেমন আমরা সবকিছু শুনতে পাই না। কাছের আওয়াজ শুনি কিন্তু দূরের আওয়াজ শুনি না। সশব্দ আওয়াজ শুনি কিন্তু শব্দহীন কিছু শুনি না। আবার শ্রবণশক্তিতে সামান্য হেরফের হলেও আমরা অনেককিছু শুনতে পাই না। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা এ সকল ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র।

প্রতিটি সৃষ্ট জীবন এবং সৃষ্ট বস্তুর স্বর ও আবেদন তিনি পরিষ্কার শুনতে পান, জমিনে হোক বা আকাশে। এমনকি জমিনের সপ্তম স্তরের নিচেও যদি কোনো ক্ষুদ্র পিঁপড়া হেঁটে বেড়ায়, তবে তার পায়ের আওয়াজটি পর্যন্ত তিনি শুনতে পান। গোটা বিশ্বে একই মুহূর্তে একইসাথে অনুরণিত সকল শব্দও তিনি বিনা অস্পষ্টতায় পরিষ্কার শুনতে সক্ষম। শোনার জন্য কান বা শ্রবণেন্দ্রিয় কিংবা অন্য কোনোকিছুরই মুখাপেক্ষী নন তিনি।

২০. আল্লাহ তাআলা সর্বদ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার দেখা আর আমাদের দেখা এক নয়। আমরা দেখি আমাদের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। দেখার মাঝেও রয়ে যায় অনেক ত্রুটি ও অপূর্ণতা। যেমন আমরা অনেক দূরের ও অতি ক্ষুদ্র জিনিস দেখি না। আলো ছাড়া দেখি না আবার আলো বেশি তীব্র হলেও দেখতে পাই না। এমনকি দৃষ্টিশক্তিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও অনেককিছু দেখতে পাই না। তা ছাড়া শুধু সামনের জিনিস দেখি, পেছনে কী হচ্ছে দেখতে পাই না। তার

ওপর আবার মাঝে মাঝে ভুলভালও দেখে ফেলি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা এ সকল ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র।

তিনি একসাথে সারাবিশ্বের সকল বস্তু দেখতে সক্ষম। কোনো আবরণ ও অন্ধকার তাঁর অবারিত দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। দেখার জন্য তিনি চোখ, দৃষ্টিকেন্দ্রিক কোনো ইন্দ্রিয় বা ভিন্ন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। একমাত্র মুমিন বান্দারাই জান্নাত থেকে আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

والله تعالى يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة.

আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দেখা পাওয়া যাবে। মুমিনগণ তাঁকে জান্নাত থেকে স্বচক্ষে দেখবে। কোনো উপমা ও ধরন ছাড়াই দেখবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে থাকবে না কোনো ব্যবধান ও দূরত্ব।[২৪]

২১. আল্লাহ তাআলা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া এই বিশ্বচরাচরে কোনোকিছুই হয় না। সকলকিছু তাঁর ক্ষমতাধীন কিন্তু কোন জিনিসটা কখন অস্তিত্বে আসবে এবং কখন বিলীন হবে, কোথায় কখন কী হবে এবং কীভাবে হবে, কতক্ষণ যাবৎ থাকবে এবং তার আকার ও পরিমাপ কতটুকু হবে, এ সবকিছু তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়। তাঁর ইচ্ছার প্রভাব বান্দার ওপর পড়ে না। যেমন তিনি ইচ্ছা করেছেন বলে অমুক মুসলিম বা অমুক কাফের, এমনটি নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইরাদাহ (الإرادة) ও মাশিয়াহ (المشيئة) আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট একই অর্থবোধক শব্দ তথা ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও আদেশ এক নয়। অনুরূপ তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিও এক নয়।

২৪. *আল-ফিকহুল আকবার*, ১০

২২. আল্লাহ তাআলা কালাম করেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার কথা ও আমাদের কথা এক নয়। আমরা কথা বলি আমাদের বাক্‌শক্তি দ্বারা। আমাদের কথাগুলো হয় শব্দে শব্দে এবং শব্দগুলো হয় পৃথক পৃথক। বয়সভেদে আমাদের কথা ও উচ্চারণেও পার্থক্য দেখা দেয়। কখনো স্পষ্ট, কখনোবা অস্পষ্ট। কখনো উচ্চ, কখনোবা অনুচ্চ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার কালাম শব্দ, স্বর এবং যাবতীয় বিভাজন থেকে চিরপবিত্র। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق.
>
> আমরা কথা বলি বিভিন্ন অঙ্গে ও শব্দে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কথা বলেন কোনো অঙ্গ ও শব্দ ছাড়া। শব্দ সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহর কালাম বা কথা সৃষ্ট নয়।[২৫]

২৩. আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান এবং ইচ্ছানুযায়ী যথাসময়ে প্রতিটি জিনিসকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। তাঁর কর্তৃক যেকোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার পারিভাষিক নাম 'আত-তাকবিন' (التكوين) তথা অস্তিত্বদান। তাকবিন সম্পৃক্ত হয় এমন বস্তুর সাথে যা অস্তিত্বে আসবে। এজন্য কুদরত তাকবিন থেকে আম বা ব্যাপক।

ব্যাখ্যা : সবকিছুর ওপর আল্লাহ তাআলা পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যখন কোনো বস্তুর অস্তিত্বে আসার সময় হয়, তখন তা তাঁর তাকবিন গুণটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তথা 'কুন' (হও) শব্দের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। তাকবিন গুণটির দলিল হলো কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি—

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

> তাঁর ব্যাপারটা হচ্ছে, তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়।[২৬]

---

২৫. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

২৬. সুরা ইয়াসিন, ৮২

জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও তাকবিন—এই সিফাত ও গুণগুলোর ব্যবহার বোঝার চেষ্টা করুন, শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত ও অসীম ক্ষমতাবান। কোন জিনিসটি কখন-কীভাবে অস্তিত্বে আসবে, কতক্ষণ যাবৎ থাকবে এবং তার আকার ও পরিমাপ কতটুকু হবে, তা পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই কোনোকিছুর অস্তিত্বে আসার সময় হলে, তখন তা তাঁর 'তাকবিন' গুণটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তথা 'কুন' (হও) আদেশের প্রেক্ষিতে অস্তিত্বে আসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাকবিন আল্লাহ তাআলার অনাদি একটি গুণ, কিন্তু তাকবিন গুণটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অস্তিত্বে আসা বস্তু অনাদি নয়, বরং তা সৃষ্ট।

২৪. একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। নিজের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি এ সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন।

ব্যাখ্যা : সকল সৃষ্টি, চাই তা বস্তু বা বস্তুর গুণ, শারীরিক অবয়ব বা শারীরিক গুণ, আসমান জমিন, পৃথিবী বা সৌরজগৎ কিংবা অন্য যা-কিছুই হোক না কেন, এ সবই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি।

ভালো-মন্দ উভয়টিরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলা, কিন্তু ভালোর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট আর মন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট। আলো-আঁধার, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ফেরেশতা-শয়তান, নেক ও বদ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু সন্তুষ্টির বিবেচনায় তিনি ভালো পছন্দ করেন এবং মন্দকে করেন অপছন্দ।

ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও ইচ্ছায় হয় বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রভাব সৃষ্টির ওপর পড়ে না। বরং সবকিছু তাঁর ক্ষমতা, ইচ্ছা ও বান্দার অর্জন—দুইয়ে মিলেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দা যখন কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করে, আল্লাহ তখন সেই কাজটির ইচ্ছা করেন এবং তার মাঝে সেই কাজটি করার ক্ষমতা দান করেন। অনুরূপ বান্দা যখন কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তিনি তখন সেই কাজটির ইচ্ছা করেন এবং তার মাঝে সেই কাজটি করার ক্ষমতা দান করেন।

কোনোকিছুই তিনি নিজ স্বার্থে ও প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি, বরং সকলকিছুই তিনি মাখলুকের প্রয়োজন ও কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি কখনোই

কিছুর মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। জিন ও ইনসানকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য।

২৫. আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা। কোনোপ্রকার কষ্ট ছাড়াই তিনি সকল সৃষ্টিকে রিজিক দান করেন।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টির রিজিক সরবরাহে আল্লাহ তাআলার কোনো বেগ ও কষ্ট পেতে হয় না। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকে তার রিজির ঠিকই কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। রিজিকের মধ্যে হালাল ও হারাম দুটোই আছে। নিজের ইচ্ছাতেই মানুষ সেই হালাল বা হারাম রিজিক নির্বাচন করে থাকে।

২৬. আল্লাহ তাআলাই একমাত্র জীবন দানকারী এবং তিনিই একমাত্র মৃত্যু দানকারী। মৃত্যুর পর তিনিই আবার সবাইকে পুনর্জীবন দান করে উত্থিত করবেন।

ব্যাখ্যা : জীবন ও মৃত্যু দানের একক ক্ষমতাধিকারী আল্লাহই। এ ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ভয় ও পরোয়া করেন না। তেমনইভাবে মৃত্যুর পর সবাইকে পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো কষ্ট ও অসুবিধা হবে না।

আল্লাহ তাআলাকে যে আকিদাসমূহ থেকে চিরপবিত্র মনে করা আবশ্যক

১. আল্লাহ তাআলা স্ত্রী, পরিবার-পরিজন থেকে চিরপবিত্র।

ব্যাখ্যা : হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা এবং হজরত মারইয়াম আ.-কে স্ত্রী মনে করা শিরক। সেইসাথে পবিত্র আত্মাকে তাঁর সত্তার অংশ মনে করা ও ফেরেশতাদেরকে তাঁর কন্যা মনে করাও শিরক।

২. সকল ধরনের দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কখনো অসুস্থ ও দুর্বল হন না।

৩. সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছিলেন। কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী ছিল না তাঁর সত্তা। ছিল না কোনো সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত এবং কোনো সৃষ্টিও ছিল না তাঁর সত্তার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ সে সময় তিনিই ছিলেন একমাত্র সত্তা। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كان الله ولم يكن شيئ غيره.

> (সকলকিছুর প্রারম্ভে) একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না তখন।[২৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

كان الله ولم يكن شيئ قبله.

> (সবকিছুর আগে) একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনোকিছুই ছিল না।[২৮]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> وفي رواية غير البخاري "ولم يكن شيئ معه"... وفيه دلالة على أنه لم يكن شيئ غيره ولا الماء ولا العرش ولا غيرهما.

---

২৭. *বুখারি*, ৩১৯১

২৮. *বুখারি*, ৭৪১৮

বুখারি ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় হাদিসটি এভাবে এসেছে, '(একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন) তাঁর সঙ্গে আর কিছুই ছিল না।' এ বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, সূচনায় আল্লাহ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। না পানি, না আরশ, না ভিন্ন কিছু।[২৯]

৪. আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র। তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

لو قيل : أين الله تعالى ؟ قيل له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، كان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيئ، وهو خالق كل شيئ.

যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা কোথায়? তাহলে বলা হবে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে (যখন) কোনো স্থান ছিল না, তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তিনি তখনও ছিলেন, যখন 'আইনা' (মানে 'কোথায়') শব্দটি বলার মতো কিছু ছিল না, আর ছিল না কোনো সৃষ্টি ও বস্তু। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন সকলকিছুকে।[৩০]

বাইহাকি রহ. বলেন,

المكان لا يضاف إلى الله سبحانه.

স্থানকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না।[৩১]

ইবনে আসাকির রহ. বলেন,

اعلم – أرشدنا الله وإياك – أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه ، ... موجود قبل الخلق ، ليس له قبل ولا بعد ، ولا فوق ولا تحت ، ولا يمين ولا شمال ، ولا أمام ولا خلف ، ولا كل ولا بعض ، ولا يقال : متى كان ؟ ولا أين كان ، ولا كيف ؟ كان ولا مكان ، كون الأكوان ودبر الزمان ، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان.

জেনে রাখো যে, (আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে সঠিক বুঝ দান করুন) 'আল্লাহ তাআলা তাঁর রাজত্বে এক', এটা যেমন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জানা থাকা আবশ্যক। (তেমনই এটাও জানা থাকা

---

২৯. *ফাতহুল বারি*, ৬/৩৬৪

৩০. *আল-ফিকহুল আবসাত*, ৯৬

৩১. *আল-আসমাউ ওয়াস-সিফাত*, ৪০৮

> আবশ্যক যে,) যাবতীয় সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি বিদ্যমান আছেন। তাঁর জন্য আগে-পরে, ওপরে-নিচে, ডানে-বামে, সামনে-পেছনে এমনকি পূর্ণ বা আংশিক বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে এ জাতীয় প্রশ্ন করা যাবে না যে, তিনি কখন থেকে আছেন, কোথায় আছেন বা কীভাবে আছেন। তিনি তো তখন থেকেই আছেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। (তারপর) তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং সময়কে পরিচালনা করেন। তিনি কোনো সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নন এবং কোনো স্থানের মধ্যেও আবদ্ধ নন।[৩২]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এমন এক সত্তা, যার কোনো শুরু-শেষ নেই। তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুর শুরু আছে এবং শেষও আছে। তিনি তখনও ছিলেন, যখন অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম, ওপর-নিচ, আসমান জমিন এবং আরশ বা দিক বলতে কোনোকিছুই ছিল না। অতঃপর তিনি এ সবকিছুকে 'নাই' থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এলেন। একদিন আবার এ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি থেকে যাবেন তখনও।

কাজেই সবকিছুর পূর্বে যেমন আল্লাহ তাআলা কোনো সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী বা কোনোকিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এবং তার সাথেও কোনো সৃষ্টির সংযুক্তি ছিল না, তেমনই সকলকিছু সৃষ্টির পরেও তিনি কোনো স্থানকালপাত্র, দিক বা আরশ ইত্যাদির প্রতি মুখাপেক্ষী ও যুক্ত নন। অনুরূপ সবকিছু ধ্বংসের পরেও তিনি কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হবেন না এবং কারও সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমন আছেন। ইমাম কুশাইরি রহ. বলেন,

فهو الآن على ما كان.

> আর তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) এখন তেমন আছেন, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন।[৩৩]

ইমাম শিরাজি রহ. বলেন,

فدل على أنه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما عليه كان ، فإن قيل: إذا قلتم إنه ليس على العرش ولا في السماوات ولا في جهة من

---

৩২. *তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা*, ৪/৩৮১

৩৩. *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ*, ৮৪

الجهات فأين هو ؟ ، يقال لهم : أول جهلكم وصفكم له بأين لأن "أين" استخبار عن المكان والرب عز وجل منزه عن ذلك.

(উল্লিখিত আলোচনা) প্রমাণ করে যখন স্থান ছিল না, তখন (আল্লাহ তাআলা) ছিলেন। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেন। ফলে তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।

যদি প্রশ্ন করে, তোমরা যদি বলো তিনি আরশে নেই, আসমানে নেই এবং কোনো দিকেও নেই, তাহলে তিনি 'কোথায়'?

জবাবে বলা হবে, তোমাদের প্রথম অজ্ঞতা হচ্ছে, তোমরা তাঁর সাথে 'আইনা' বা কোথায় (শব্দটি) ব্যবহার করেছ। অথচ 'আইনা' বা 'কোথায়' (শব্দটি) দ্বারা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র।[৩৪]

ইবনে আসাকির রহ. বলেন,

وأنه لا يحل في شيئ ، ولا يحل فيه شيئ ، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان ، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان.

(আল্লাহ তাআলা) কোনোকিছুর মাঝে অবস্থান করেন না। তাঁর মাঝেও কিছু অবস্থান করে না। কোনো স্থান তাঁকে আবদ্ধ করা থেকে তিনি পবিত্র, তেমনই তিনি পবিত্র কোনো সময় তাঁকে আবদ্ধ করা থেকে। সময় ও স্থান সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন। তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু) সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন।[৩৫]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

الله تعالى منزه عن المكان، كما هو منزه عن الزمان بل هو خالق الزمان والمكان ولم يزل موجودا ولا زمان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان.

আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে যেমন চিরপবিত্র, তেমনই তিনি সময় থেকেও চিরপবিত্র, বরং তিনি তো স্থান ও কালেরই স্রষ্টা। তিনি

---

৩৪. *আল-ইশারাতু ইলা-মাজহাবি আহলিল হক*, ১৫১
৩৫. *তাবয়িনু কাজিবিল মুফতারি*, ৫৫২

তখনও ছিলেন, যখন কোনো সময় ও স্থান ছিল না। তদ্রূপ তিনি এখনো তেমনই আছেন, যেমন পূর্বে ছিলেন।[৩৬]

ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিন আবদিস সালাম রহ. বলেন,

كان قبل أن كون المكان ودبر الزمان ، وهو الآن على ما عليه كان.

(আল্লাহ তাআলা) স্থান সৃষ্টি ও সময় পরিচালনার পূর্বে ছিলেন। তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩৭]

মুরতাজা আজ-জাবিদি রহ. লেখেন,

كان تعالى قبل أن خلق الزمان والمكان والعرش والكرسي والسماوات والأرضين وهو الآن على ما عليه.

স্থান, কাল, আরশ, কুরসি, আসমান ও জমিন—সকল সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা ছিলেন। এখনো তিনি তেমনই আছেন, যেমন তিনি (সবকিছু সৃষ্টির) পূর্বে ছিলেন।[৩৮, ৩৯]

৫. আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দিক, সীমা-পরিসীমা, পরিধি, স্থান থেকে চিরপবিত্র।

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন, لا حد له—অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কোনো সীমা নেই।[৪০]

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

تعالى عن الحدود والغايات ... لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সীমা, পরিধি থেকে চিরপবিত্র। সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয়টি দিক তাঁকে (আল্লাহ তাআলাকে) বেষ্টন করতে পারে না।[৪১]

---

৩৬. *আল-মুফহিম*, ২/১৪৩
৩৭. *তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা*, ৩/৩৬০
৩৮. *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*, ২/২৫
৩৯. বিষয়টি নিয়ে কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা রয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ১৮৫)
৪০. *আল-ফিকহুল আকবর*, ৬
৪১. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়াহ*, ১৫

গাজালি রহ. বলেন,

ندعي : أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست.

আমাদের দাবি হচ্ছে যে, তিনি (আল্লাহ তাআলা) ছয় দিকের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো দিকে নেই।[৪২]

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

وهو أن الدلائل الواضحة قد قامت على أن البارى تعالى ليس بجسم ولا محتاجًا إلى مكان يحله ويستقر فيه؛ لأنه تعالى قد كان ولا مكان وهو على ما كان، ثم خلق المكان فمحال كونه غنيا عن المكان قبل خلقه إياه، ثم يحتاج إليه بعد خلقه له ، هذا مستحيل.

বহু স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট নন। অবস্থান ও ওঠার জন্য তিনি কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন, কেননা যখন স্থান ছিল না তখনও তিনি ছিলেন আর তিনি তেমন আছেন। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেন। যিনি স্থান সৃষ্টির পূর্বে স্থানের অমুখাপেক্ষী ছিলেন, তিনি স্থান সৃষ্টির পর স্থানের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবেন, এটা অসম্ভব।[৪৩]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

أنه تعالى ليس مختصا بجهة ... من الجهات الست ولا في مكان من الأمكنة.

আল্লাহ তাআলা ছয় দিকের কোনো দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট নন এবং তিনি কোনো জায়গায় নেই।[৪৪]

বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন,

قد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان.

একটি সুসাব্যস্ত বিষয় বা আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা দেহময় নন। সুতরাং তিনি এমন কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন, যেখানে তিনি

---

৪২. *আল-ইকতিসাদ*, ১৫৪
৪৩. *শারহুল বুখারি*, ১০/৪৬৭
৪৪. *আল-মুসায়ারাহ*, ১৮১

অবস্থান করবেন, বা উঠবেন। কারণ তিনি তো তখনও ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না।[৪৫]

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো স্থানে নেই।[৪৬]

ইমাম সানুসি রহ. বলেন,

ولم يقل بالجهة أحد من أهل السنة ، وإنما قال بها طائفة من المبتدعة ، وهم الحشوية والكرامية.

আহলে সুন্নাতের কেউ (আল্লাহ তাআলা কোন দিকে আছেন) এটা বলে না। এটা বলে বিদআতি হাশাবি ও কাররামিয়ারা।[৪৭]

মুহাম্মাদ আরাবি আত-তাব্বানি রহ. বলেন,

اتفق العقلاء من أهل السنة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته.

শাফেয়ি, হানাফি, মালেকি ও সঠিক ধারার হাম্বলি এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য সকল বিজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত যে, মহান আল্লাহ তাআলা দিক, দেহ, সীমা, স্থান ও সমস্ত মাখলুকের সদৃশ হওয়া থেকে চিরপবিত্র।[৪৮]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাকে বিভিন্ন দিক, সীমা-পরিসীমা, পরিধি ও স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট ও যুক্ত না করার অর্থ হলো, এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা ডানে আছেন বা বামে আছেন। কিংবা সামনে বা পেছনে আছেন। অথবা এটাও বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা ওপরে আছেন বা নিচে আছেন।

---

৪৫. *উমদাতুল কারি*, ২৫/১৭৮

৪৬. *শরহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার*, ৮৯

৪৭. *শরহুল আকিদাতিল উসতা*, ১২৫

৪৮. *বারাআতুল আশআরিয়িন*, ১/৭৯

তদ্রূপ এটাও বলা যাবে না যে, তিনি অমুক জায়গাতে আছেন। অথবা তিনি হুলুলের সাথে 'সব জায়গায় আছেন' কিংবা তিনি সত্তাগতভাবে শুধু 'আরশে' আছেন, কোনোটাই বলা যাবে না; বরং এ সবগুলোই গোমরাহি আকিদা। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, **তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন।**

৬. আল্লাহ তাআলা ভেতর-বাহির থেকে চিরপবিত্র।

গাজালি রহ. বলেন,

وهو أن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه.

আর আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বিভিন্ন দিক ও প্রান্ত থেকে। তিনি না বিশ্বের ভেতরে আছেন না বাহিরে। তিনি না বিশ্বের সাথে যুক্ত না তিনি বিশ্ব থেকে পৃথক।[৪৯, ৫০]

৭. আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্তা স্বাদ, কষ্ট, ব্যথা ইত্যাদি গ্রহণ থেকে চিরপবিত্র।

৮. আল্লাহ তাআলা এমন কোনো সত্তা নন, যা বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গ দ্বারা গঠিত, বরং তিনি শারীরিক সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

تعالى ... عن الأعضاء والأدوات.

আল্লাহ তাআলা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র।[৫১]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

الغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية ، وأن الله تعالى شخص ذو جوارح ، كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الملة.

দেহবাদী বিশ্বাস ইহুদিদের ওপর প্রবল এবং (তারা বিশ্বাস করে,) আল্লাহ তাআলা এমন এক সত্তা, যার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। যেমন ইহুদিপন্থী কট্টর হাশাবিরা এ আকিদায় বিশ্বাসী।[৫২]

---

৪৯. *ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন*, ১৮১০

৫০. বিষয়টি নিয়ে কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা রয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২২৫)

৫১. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৫

৯. আল্লাহ তাআলা দেহ ও শরীর থেকে চিরপবিত্র।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, بلا جسم—(আল্লাহ তাআলা) দেহ ও শরীরবিহীন সত্তা।[৫৩]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

أنه تعالى ليس بجسم.

আল্লাহ তাআলা দেহময় নন।[৫৪]

১০. দেহের জন্য অপরিহার্য, যেমন পানাহার করা, ফরসা-কালো, লম্বা-খাটো হওয়া ইত্যাদি সকলকিছু থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র।

১১. আল্লাহ তাআলা সুরাত ও আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র।

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه : أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية.

আমরাসহ সকল মুসলিমের এটা জেনে রাখা আবশ্যক (বা এই আকিদা রাখা ওয়াজিব) যে, আমাদের প্রতিপালক সুরাত বা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট কোনো সত্তা নন। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সুরাত বা আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র।) কেননা আকৃতি থাকার দাবি হলো, ধরন থাকা। কিন্তু 'ধরন' আল্লাহ তাআলা ও তার সিফাত থেকে মুক্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত ধরন থেকে চিরপবিত্র)।[৫৫]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

ليس سبحانه بذي لون ولا رائحة ولا صورة ولا شكل.

আল্লাহ তাআলা রং, ঘ্রাণ, সুরাত ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট কোনো সত্তা নন।[৫৬]

---

৫২. *আল-মুফহিম*, ৭/৩৮৯
৫৩. *আল-ফিকহুল আকবর*, ৬
৫৪. *আল-মুসামারা*, ১৬৭
৫৫. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২৮২
৫৬. *আল-মুসামারা*, ১৭১

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনে বাত্তাল রহ. থেকে নকল করেন,

"فيأتيهم الله في صورة" ... تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة.

'মুজাসসিমা' বা 'দেহবাদী' আকিদার অনুসারীরা, 'আল্লাহ আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন' (হাদিসের এ অংশটিকে) দলিল হিসাবে গ্রহণ করে। তারপর আল্লাহ তাআলার জন্য সুরাত বা আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করে।[৫৭]

ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা সুরাত ও আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, গোমরাহ মুজাসসিমা বা দেহবাদীদের আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সুরাত ও আকার-আকৃতি রয়েছে।[৫৮]

১২. আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্তা এবং তাঁর সকল সিফাত কাইফিয়াত বা ধরন থেকে চিরপবিত্র। ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية.

(আল্লাহ তাআলার সুরাত বা আকার-আকৃতি থাকার অর্থ হচ্ছে,) কাইফিয়াত বা 'ধরন' থাকা। অথচ 'ধরন' আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর সিফাত থেকে মুক্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং সিফাত 'ধরন' থেকে চিরপবিত্র।)[৫৯]

ইমাম আলাউদ্দিন বুখারি রহ. বলেন,

الله تعالى يوصف بصفة الوجه واليد مع تنزيهه جل جلاله عن الصورة والجارحة ... أن إثبات الصورة والجارحة مستحيل وكذا إثبات الكيفية.

الوجه – اليد-কে আল্লাহ তাআলার সিফাত হিসাবে উল্লেখ করা হবে। সাথে সাথে তাঁকে সুরাত বা আকার-আকৃতি এবং দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করতে হবে, কারণ তাঁর জন্য আকৃতি ও

---

৫৭. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫০৭
৫৮. বিষয়টি নিয়ে কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা রয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৩১০)
৫৯. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২৮২

দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা অসম্ভব। অনুরূপ 'কাইফিয়াত' বা 'ধরন' সাব্যস্ত করাও অসম্ভব।[৬০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার জাত ও সত্তা এবং সিফাত ও গুণের জন্য কোনোপ্রকার ধরন সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ কোনো জিনিসের ধরন থাকার অর্থই হলো তার একটি সুরাত ও আকার-আকৃতি থাকা। ফলে আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত ধরন থেকে চিরপবিত্র। কাজেই এমন কথা বলা যাবে না, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের একটি ধরন রয়েছে; আল্লাহর ধরন আল্লাহর মতো, মাখলুকের মতো নয় বা আমরা জানি না। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত কোনোপ্রকার ধরন ছাড়াই আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও সকল গুণকে স্বীকার করেন।

১৩. সত্তাগত দিক থেকে অথবা গুণগত দিক থেকে সৃষ্টির কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার মতো ও সদৃশ নয় এবং তিনিও সৃষ্টির মতো ও সদৃশ নন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, لا مثل له—অর্থাৎ (আল্লাহ তাআলার) সদৃশ কিছু নেই বা কোনোকিছুই তাঁর মতো বা সদৃশ নয়।[৬১]

ইমাম নববি রহ. বলেন,

اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيئ وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق.

আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার মতো বা সদৃশ নয়। সেইসাথে তিনি যাবতীয় দেহ, স্থানান্তর, কোনো দিকে অবস্থান করা এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে চিরপবিত্র।[৬২]

ব্যাখ্যা : মাখলুকের দেখার জন্য চোখ লাগে, বলার জন্য জবান লাগে, শোনার জন্য কান লাগে, অস্তিত্বের জন্য দেহ লাগে কিন্তু আল্লাহ তাআলা মাখলুকের মতো নন। তিনি সব দেখেন, কিন্তু দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী নন, তিনি কালাম করেন, কিন্তু কালামের জন্য জবানের মুখাপেক্ষী নন, তিনি সব শোনেন, কিন্তু শোনার জন্য কানের মুখাপেক্ষী নন। অস্তিত্বের জন্য তিনি জিসিম বা দেহের মুখাপেক্ষী নন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

---

৬০. *কাশফুল আসরার*, ১/৯৪

৬১. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

৬২. *আল-মিনহাজ*, ৩/২৪-২৫

لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيئ من خلقه.

তিনি আপন সৃষ্টির কোনোকিছুর সদৃশ নন এবং আপন সৃষ্টির কোনোকিছু তাঁর সদৃশ নয়।[৬৩]

ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

فإن الله تعالى سميع بلا جارحة، بصير بلا عين، عالم بلا إله، مريد بلا قلب، متكلم بلا لسان وشفتين.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অঙ্গ ছাড়াই শোনেন, চক্ষু ছাড়াই দেখেন, মাধ্যম ছাড়াই জানেন, অন্তর ছাড়াই ইচ্ছা করেন, জিহ্বা ও ঠোঁট ছাড়াই কালাম করেন।[৬৪]

মানুষ ও আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো মিল বা সদৃশ সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি আংশিক বা ন্যূনতম মিলও সাব্যস্ত করা যাবে না, বরং আংশিক মিল সাব্যস্ত করাও দেহবাদী আকিদা। যেমন এভাবে বলা যে, 'মানুষের যেমন হাত-পা-চোখ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তেমনই আল্লাহ তাআলারও হাত-পা-চোখ রয়েছে। তবে তাঁর ধরন কেমন তা আমরা জানি না।' এটা হলো দেহবাদী আকিদা। কেননা তখন বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে আংশিক একটা মিল সাব্যস্ত করা হয়। যেমন উভয়ে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত। তবে মাখলুকের ধরন জানা যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ধরন জানা যায় না। এ আকিদা সুস্পষ্ট কুরআনবিরোধী। কেননা তিনি ইরশাদ করেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

কোনোকিছুই (আল্লাহ তাআলার) মতো বা সদৃশ নয়।[৬৫]

উল্লিখিত আয়াতে লাইসা শব্দটি নফি বা না-বাচক। যার পর شَيْءٌ শব্দটি আনা হয়েছে, যা নাকিরা বা অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আরবি ভাষার নিয়মানুসারে তা আম ও ব্যাপকতার অর্থ দেবে। সে ক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে, কোনো সৃষ্টি সত্তাগত দিক থেকে হোক বা গুণগত দিক থেকে,

---

৬৩. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৪

৬৪. *বাহরুল কালাম*, ৪০

৬৫. সুরা শুরা, ১১

আল্লাহ তাআলার মতো বা সদৃশ হওয়া অসম্ভব এবং সৃষ্টির সকল গুণবৈশিষ্ট্য থেকে তিনি চিরপবিত্র।

১৪. আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং তাঁর সকল সিফাত অপরিবর্তিত।

ইমাম আবুল ফজল আত-তামিমি, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর আকিদা হিসাবে উল্লেখ করে লেখেন,

والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.

আল্লাহ তাআলার (মাঝে) কোনো বদল ও পরিবর্তন হয়নি এবং দিক ও সীমা তাঁর সাথে যুক্ত হয়নি। না আরশ সৃষ্টির পূর্বে, না আরশ সৃষ্টির পর।[৬৬]

ইমাম কামালুদ্দিন বায়াদি রহ. বলেন,

لا يجري عليه تعالى ما يجري على المخلوقات ، من التغير والزمان فلا يتصف ذاته تعالى وصفاته بقبول التغير.

সৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য, আল্লাহ তাআলার জন্য তা অপরিহার্য নয়। যেমন পরিবর্তন হওয়া, সময় (ইত্যাদি)। ফলে তাঁর সত্তা ও সকল গুণ কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করে না।[৬৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাতের মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়নি আর হবেও না। এমন না যে, তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে একরকম ছিলেন আর এখন ভিন্নরকম আছেন। অথবা এমনও না যে, তিনি এখন যেমন আছেন, সকলকিছু ধ্বংসের পর আর তেমন থাকবেন না। সুতরাং যারা বলে, 'সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ কোথায় ছিলেন তা আমরা জানি না, তবে এখন তিনি আরশে আছেন।' তাদের এই আকিদা সঠিক নয়। কারণ এতে তাঁর সত্তার মাঝে পরিবর্তন সাব্যস্ত হয়।

১৫. নড়াচড়া, স্থানান্তর, স্থির হওয়া, ওঠাবসা এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

---

৬৬. *ইতিকাদুল ইমাম আল-মুনাব্বাল*, ৩৮

৬৭. *ইশারাতুল মারাম*, ২৪৪

معتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول.

পূর্ববর্তী ইমাম ও পরবর্তী হাদিসবিশেষজ্ঞ বা আহলুল হাদিসদের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা নড়াচড়া, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হওয়া এবং 'হুলুল' বা সবকিছুর সাথে মিশে যাওয়া থেকে চিরপবিত্র।[৬৮]

মুরতাজা আজ-জাবিদি রহ. লেখেন,

أنه تعالى مقدس منزه عن التغير من حال إلى حال والانتقال من مكان إلى مكان وكذا الاتصال والانفصال فإن كلا من ذلك من صفات المخلوقين.

এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াসহ যুক্ত হওয়া ও পৃথক হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র। কারণ এ সবকিছু সৃষ্টির গুণাবলি।[৬৯]

ব্যাখ্যা : নড়াচড়া করা, স্থানান্তর ও রূপান্তরিত হওয়া, ওঠা ও নামা— কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। মোটকথা, সৃষ্টির কোনো গুণই তাঁর জন্য নির্ধারণের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আরশে উঠলেন, এমন কথাও বলা যাবে না। কারণ তখন 'কোত্থেকে উঠলেন', 'ওঠার আগে কোথায় ছিলেন' ইত্যাকার নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। তা ছাড়া ওঠানামা-জাতীয় শব্দগুলো স্থানান্তর বোঝায়। অথচ দেহবাদী আকিদার বিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ তাঁর সম্পর্কে ওঠানামা-জাতীয় শব্দগুলো বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। আল্লাহ তাআলা দেহবাদীদের এ সমস্ত কথা থেকে চিরপবিত্র।

---

৬৮. *ফাতহুল বারি*, ৭/১৪৮

৬৯. *ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকিন*, ২/২৫
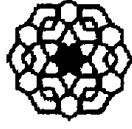
আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তাআলার নাম সম্পর্কিত আকিদা

১. আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

> আল্লাহরই জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো।[৭০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

> আল্লাহ তাআলার ৯৯ অর্থাৎ এক কম ১০০টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭১]

২. আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও সিফাত তাওকিফি[৭২] এবং তাঁর নাম কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। তবে হাদিসে ৯৯ সংখ্যা উল্লেখের কারণ হচ্ছে, ৯৯টি মুখস্থের ফজিলত বর্ণনা করা।

৩. বিভিন্ন কিতাবে নির্দিষ্টভাবে তাঁর ৯৯টি নাম বলে যে-সকল নাম এবং যে সিলসিলায় পাওয়া যায়, তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, বরং তা মুদরাজ বা পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারীর থেকে অনুপ্রবিষ্ট।

৪. আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তা এক নয় বরং ভিন্ন, তবে তাঁর নাম ও গুণ সত্তা থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্নও নয় এবং তাঁর সত্তার মতো সকল নাম ও গুণ অনাদি। যখন তাঁকে তাঁর সুন্দর কোনো নামে ডাকা হয়, তখন তা তাঁর

---

৭০. সুরা আরাফ, ১৮০

৭১. *বুখারি*, ২৭৩৬

৭২. অর্থাৎ নাম ও সিফাতটি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হতে হবে। কতক ইমামের মতে কোনো নামের ক্ষেত্রে ইজমা পাওয়া গেলে তা তাঁর নাম হিসাবে বিবেচিত হবে।

পবিত্র সত্তাকেই বোঝায়। যেমন 'রহমান' তাঁর একটি নাম, যখন 'রহমান' নামে তাঁকে ডাকা হয় তখন তাঁর পবিত্র সত্তাকেই ডাকা হয়।

৫. দুর্বল হাদিস দ্বারা নাম সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হচ্ছে, ভিন্ন করিনা বা লক্ষণ না থাকলে সাব্যস্ত হবে না, কিয়াসের মাধ্যমে কোনো নাম সাব্যস্ত হবে না, কেননা তা তাওকিফির বিপরীত।

৬. প্রতিটি ভাষায় আল্লাহ তাআলার নাম, গুণ ও সত্তাকে বোঝানোর উপযুক্ত শব্দ রয়েছে। ভাষাভাষীদের জন্য তা ব্যবহার জায়েজ। যেমন ফারসিতে 'খোদা', ইংরেজিতে 'গড', বাংলায় দয়ালু, চিরদয়াময় ইত্যাদি। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

ويجوز أن يقال بروي خداى.

'বরুয়ে খোদা' বলা জায়েজ আছে।[৭৩]

ইমাম ইজি রহ. বলেন,

> وليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات ، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال.
>
> বিভিন্ন ভাষায় (আল্লাহ তাআলার জন্য) নির্ধারিত নামবাচক বিশেষ্য (নিয়ে আলেমদের) কোনো কালাম বা ইখতেলাফ নেই। ইখতেলাফের স্থানটি হচ্ছে সিফাত বা গুণ, ফেয়েল বা ক্রিয়া থেকে নির্গত শব্দকে তাঁর নামরূপে সাব্যস্তের বিষয়ে।[৭৪]

৭. কিছু নাম শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট, ফলে তা অন্য কারও জন্য ব্যবহার জায়েজ নেই। যেমন—

> الله ، الرحمن ، القدوس ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، الباري ، المصور ، الرزاق ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الخلاق ، الفتاح ، القيوم ، الرب ، المحيط ، المالك ، الغفور ، الأحد ، الصمد ، الحق ، القادر.

---

৭৩. *আল-ফিকহুল আকবর*, ১২

৭৪. *শারহুল মাওয়াকিফ*, ৮/২৩২

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উল্লিখিত নামসমূহের পূর্বে (عبد) 'আবদ' শব্দ যুক্ত করে মানুষের জন্য ব্যবহার জায়েজ। যেমন আবদুর রহমান ইত্যাদি।

৮. যে-সকল নাম আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত, অনুরূপ ভিন্ন অর্থে কুরআন, হাদিস, উরফ ও সালাফদের মাঝে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এমন নাম রাখাতে সমস্যা নেই। যেমন—

عزيز، علي، كريم، رحيم، عظيم، رشيد، بديع، كفيل، واسع، حكيم وغيره.

৯. ইসমে আজম বা মহান ও সর্বোত্তম নাম কোনটি? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে বড় ইখতেলাফ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. *ফাতহুল বারি*তে ইসমে আজম নির্ধারণের বিষয়ে প্রায় ১৪টি মত উল্লেখ করেন। তবে নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে, নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি নামকে ইসমে আজম বলার মতো কোনো দলিল শরিয়তের মাঝে পাওয়া যায় না, ফলে তাঁর সকল নামই ইসমে আজম এবং তাঁকে তাঁর সুন্দর সুন্দর সকল নামেই ডাকার চেষ্টা করা।

১০. অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও গুণ তাওকিফি। ফলে ইসম বা বিশেষ্য যেমন তাঁর নাম হয়, তেমনই তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত ফেয়েল বা ক্রিয়া, মাসদার বা ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে নাম নির্গত করা বৈধ। তবে তাঁকে কোনো নামে বা শব্দে ডাকতে নিষেধ করা হলে, সে নামে ও শব্দে ডাকা বৈধ নয়। অনুরূপ নির্গত কোনো নাম বা শব্দ যদি তাঁর মাঝে কোনো ত্রুটি বা অসম্মান বোঝায়, তাহলে সে নাম ও শব্দকে অবশ্যই তাবিল বা ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ﴾

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন।[৭৫]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলার সাথে 'ভুলে যাওয়া' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে বলে এটা বলার অবকাশ নেই যে, তিনি ভুলে যান (নাউজুবিল্লাহ)।

---

৭৫. সুরা তাওবা, ৬৭

কিংবা এর রেশ ধরে কেউ দোয়ার মধ্যেও এভাবে সম্বোধন করতে পারবে না যে, 'ইয়া নাসি' (হে বিস্মরণশীল বা অমনোযোগী সত্তা)।

কারণ এটা বলাবাহুল্য যে, ভুলে যাওয়া একটি ত্রুটি। আর মনে রাখতে হবে, অতি অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সকলপ্রকার ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র। সুতরাং শব্দটি যদিও কুরআনে তাঁর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক অর্থ এখানে গ্রহণ করা যাবে না, বরং এর তাবিল ও ব্যাখ্যা জরুরি।

একইভাবে আল্লাহ তাআলা 'সর্বোত্তম চক্রান্তকারী' এবং তিনি 'উপহাস' করেন, এ জাতীয় সকল শব্দই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শব্দগুলোকে বাহ্যিক ও দৃশ্যমান অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, বরং অবশ্যই একে তাঁর শান উপযোগী শব্দ দ্বারা তাবিল করতে হবে।

সারকথা

কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার নামরূপে উল্লিখিত কিংবা তাঁর শানে প্রয়োগকৃত সকল শব্দই ব্যবহার করা যাবে। শর্ত শুধু শব্দটি ত্রুটি ও মন্দ অর্থহীন হতে হবে।
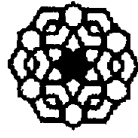
আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণ পাঁচ প্রকার—

১. الصفات النفسية—আস-সিফাতুন নাফসিয়া :

আস-সিফাতুন নাফসিয়া বলা হয় এমন কিছু শব্দকে, যা আল্লাহ তাআলার সত্তার বাহিরে অতিরিক্ত কোনো অর্থ বোঝায় না, বরং শব্দগুলো স্বয়ং সত্তাকেই বোঝায়। যেমন الله—আল্লাহ, موجود—তিনি বিদ্যমান, ذات—সত্তা, واجب الوجود شيئ।

২. الصفات السلبية—আস-সিফাতুস সালবিয়া :

আস-সিফাতুস সালবিয়া বলা হয় এমন সিফাতসমূহকে, যা তার বিপরীত অর্থকে আল্লাহ তাআলার জন্য নাকচ করে। এ জাতীয় সিফাতের সংখ্যা অনেক। তবে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি—

ক. القِدَم তথা অনাদি। অর্থাৎ তিনি সৃষ্ট নন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ.

হে আল্লাহ! আপনিই আদি। আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না।[৭৬]

খ. البقاء তথা আবাদি। অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ.

আর আপনিই অন্ত। আপনার পরেও কিছু নেই।[৭৭]

গ. المخالفة للحوادث তথা তিনি সত্তা ও সকল গুণে সৃষ্টির ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৭৬. *মুসলিম*, ২৭১৩

৭৭. *মুসলিম*, ২৭১৩

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾

কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়।[৭৮]

ইমাম কুশাইরি রহ. আয়াতটির তাফসিরে লেখেন,

قال الواسطي : ليس كذاته ذات، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة.

ওয়াসিতি বলেন, তাঁর (আল্লাহ তাআলার) সত্তার মতো কোনো সত্তা নেই, তাঁর কর্মের মতো কোনো কর্ম নেই, তাঁর সিফাতের মতো কোনো সিফাত নেই।[৭৯]

ঘ. القيام بالنفس তথা তিনি স্বনির্ভর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ﴾

আর আল্লাহই ধনী ও অমুখাপেক্ষী এবং তোমরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী।[৮০]

ঙ. الوحدانية তথা তিনি সত্তা ও সকল গুণে এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ।[৮১]

৩. صفات المعاني—সিফাতুল মায়ানি :

সিফাতুল মায়ানি বলা হয় এমন কিছু সিফাতকে, যা তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সত্তার বাহিরে অতিরিক্ত অর্থ বহন করে। এই সিফাতগুলোকে একইসাথে সত্তা ভাবা যেমন ভুল, আবার সত্তা থেকে পৃথক ভাবাও ভুল।

সিফাতুল মায়ানি মোট আটটি : ১. জীবন, ২. জ্ঞান, ৩. ক্ষমতা, ৪. ইচ্ছা, ৫. কথা, ৬. দেখা, ৭. শোনা, ৮. তাকবিন (تكوين)।

---

৭৮. সুরা শুরা, ১১
৭৯. *আত-তাহবির ফিত-তাজকির*, ১৯
৮০. সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮
৮১. সুরা বাকারা, ১৬৩

বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে উল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে এ শব্দগুলো মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনই মানুষেরও ক্ষমতা আছে। তবে হ্যাঁ, পার্থক্যও আছে। মানুষের ক্ষমতা সীমিত এবং নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ। আর তাঁর ক্ষমতা সর্বজনীন ও সর্বময়।

ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা জানেন এবং মানুষও জানে। এখানেও একই কথা, পার্থক্য আছে। মানুষের জানা অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ আর তাঁর জানা অসীম ও পূর্ণাঙ্গ।

অর্থাৎ সিফাতুল মায়ানির শব্দগুলো আল্লাহ তাআলা ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও দুইয়ের মাঝে পূর্ণতা ও সীমারেখার পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অসীম। আর মানুষের ক্ষেত্রে অপূর্ণ ও সসীম।

৪. الصفات الفعلية—আস-সিফাতুল ফেলিয়াহ বা কর্মগত সিফাত :

কর্মগত সিফাত বলা হয় সে সকল সিফাতকে, যার প্রভাব সৃষ্টির ওপর পড়ে এবং তিনি অনাদিকাল থেকে এ সকল গুণে গুণান্বিত। যেমন জীবন ও মৃত্যু দান করা, সৃষ্টি করা, রিজিক দান করা ইত্যাদি। কর্মগত সিফাতের মাঝে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

> وكما كان بصفاته أزليا ، كذالك لا يزال عليها أبديا ، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري ، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق.
>
> অনাদিকাল থেকে যেমন তিনি তাঁর সকল গুণে গুণান্বিত, তেমনই অনন্তকালও তিনি সকল গুণে গুণান্বিত থাকবেন। এমন নয় যে, মাখলুক সৃষ্টির পর তিনি খালিক (সৃষ্টিকর্তা) গুণটি অর্জন করেছেন। আবার এমনও নয় যে, সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বে আনার পর তিনি বারি (উদ্ভাবক) গুণটি অর্জন করেছেন। প্রতিপালনের গুণ তো তাঁর সে সময়ও ছিল, যখন কোনো প্রতিপাল্য ছিল না। সেইসাথে সৃষ্টিকর্তার গুণও তাঁর তখন থেকেই ছিল, যখন ছিল না কোনো সৃষ্টি।[৮২]

---

৮২. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ৯-১০

ইমাম আকমালুদ্দিন বাবারতি রহ. বলেন,

> أراد بهذا الكلام أن الله تعالى موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أزلا وأبدا ، سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة ، فإن كلها صفات له قائمة بذاته قديمات مصونات عن الزوال.
>
> এ কথা দ্বারা (ইমাম তাহাবির) উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সুন্দর নাম ও সম্মানিত গুণাবলিতে অনাদি কাল থেকে গুণান্বিত এবং অনন্তকাল পর্যন্ত গুণান্বিত থাকবেন। চাই সেটা তাঁর সত্তাগত সিফাত হোক, যেমন জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইরাদা, ইচ্ছা, শোনা, দেখা। কিংবা হোক সেটা তাঁর কর্মগত সিফাত, যেমন জীবন ও মৃত্যু দান করা, সৃষ্টি করা, তাকবিন ইত্যাদি। এসব সিফাত তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও অনাদি এবং তা বিলুপ্তি থেকে পবিত্র।[৮৩]

আল্লাহ তাআলার সকল সিফাত অনাদি বটে, কিন্তু সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু সৃষ্ট। যেমন অনাদিকাল থেকে তিনি সৃষ্টিকর্তার গুণে গুণান্বিত। কিন্তু সৃষ্টির গুণের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু হচ্ছে মাখলুক, এই মাখলুক কিন্তু সৃষ্ট। তিনি অনাদিকাল থেকেই রিজিকদাতার গুণে গুণান্বিত। কিন্তু রিজিকদানের যে গুণ, তার সাথে সম্পৃক্ত বস্তু রিজিক, তা সৃষ্ট। অর্থাৎ সহজ কথায়, **তাঁর কোনো সিফাত সৃষ্ট নয়, কিন্তু সিফাতের প্রকাশটা সৃষ্ট।**

সিফাত অনাদি হওয়ার কারণে সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুকেও অনাদি ভাবা গোমরাহি। অনুরূপ এ জাতীয় বিশ্বাস রাখাও গোমরাহি যে, সৃষ্টির পর তাঁর কর্মগত এমন কোনো গুণ অর্জিত হয়েছে, যা তাঁর পূর্বে ছিল না। যেমন আসমান জমিন সৃষ্টির পর তাঁর আরশে ওঠা বা অবস্থান করা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিশ্বাসও গোমরাহি যে, সৃষ্টির পূর্বে তাঁর একটি গুণ ছিল, কিন্তু এ গুণে কামাল তথা পূর্ণতা ছিল না বরং সৃষ্টির পর পূর্ণতা এসেছে।

৫. الصفات الخبرية—আস-সিফাতুল খাবারিয়া :

আল্লাহ তাআলার কিছু সিফাত এমন, মহাবিশ্বের স্রষ্টার জন্য এমন বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক ও আবশ্যক। এমনকি কুরআন-হাদিসে সে সম্পর্কে কোনোরূপ

---

৮৩. *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া*, ৪৭

বয়ান না পাওয়া গেলেও যুক্তির আলোকে তা সাব্যস্ত করা ছিল অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তাআলা আছেন, তিনি যা ইচ্ছা তা করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, তিনি সব দেখেন ও শোনেন ইত্যাদি।

আস-সিফাতুল খাবারিয়া দ্বারা এমন কিছু সিফাতকে বোঝানো হয়, কুরআন-হাদিসে যার সম্পর্কে বর্ণনা ও ব্যবহার পাওয়া যায়। কুরআন-হাদিসে না থাকলে যুক্তি দিয়ে তা সাব্যস্ত করার সুযোগ ছিল না। যেমন (وجه) চেহারা, (يد) হাত, (إصبع) আঙুল, (ضحك) হাসা ইত্যাদি।

এ প্রকার সিফাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বোঝার সুবিধার্থে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছি, তবে মনে রাখতে হবে, এ উদাহরণ দুটি কেবলই বিষয়টি বোঝার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার জন্য নয়, নাউজুবিল্লাহ।

উদাহরণ : ১

ধরা যাক, আমি আপনাকে বললাম, পুরো বাংলাদেশের ক্ষমতা এখন আপনার 'হাতে'। আমার এ কথা দ্বারা আপনি কি বুঝবেন যে, আপনার যে 'হাত' আছে, আমি এটা বোঝাচ্ছি? নিশ্চয় এমন কিছু নয়? বরং আপনি ভালো করেই জানেন যে, আমার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও বিশালতা বোঝানো। এবার আপনি কুরআনের এই আয়াতটি লক্ষ করুন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

বরকতময় সেই সত্তা, যার 'হাতে' সর্বময় কর্তৃত্ব।[৮৪]

এ আয়াতটির প্রতি লক্ষ করলে দেখবেন, এখানে আল্লাহ তাআলা এটা বোঝাতে চাননি যে, হে বান্দা! জেনে রাখো, আমার কিন্তু 'হাত' আছে। এ আয়াত দ্বারা বরং আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি বোঝানো উদ্দেশ্য।

উদাহরণ : ২

আপনার বাবা আপনাকে বললেন, কাজটি তুমি আমার চোখের সামনেই করো।

---

৮৪. সুরা মুলক, ১

এই কথা দ্বারা কিন্তু মোটেও আপনার বাবার এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, আপনার বাবার চোখ আছে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাজটি যেন আপনি তার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনামতে করেন। সুতরাং এবার এ আঙ্গিকে আপনি কুরআনের এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

আর তুমি আমার 'চোখের' সামনে কিশতি তৈরি করো।[৮৫]

উপরোল্লেখিত উদাহরণটির প্রেক্ষিতে আপনি এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন, এখানেও আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এটা বোঝানো নয় যে, হে বান্দা! জেনে রাখো, আমার চোখ আছে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে নির্দেশ করছেন, সেভাবে করো। আমরা বলে থাকি 'দেয়ালেরও কান আছে', 'আপনাদের সুদৃষ্টি কামনা করছি', এ জাতীয় কথা বলে আমরা নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গকে উদ্দেশ্য নিই না, বরং একটি বক্তব্যকে জোরদার করি।

একইভাবে কুরআনের যত আয়াতে ইয়াদ, আইন, ওয়াজ তথা হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে, সেসব আয়াতের পূর্বাপর মেলালে দেখা যাবে যে, সেখানে আল্লাহ তাআলার জন্য শারীরিক কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের মূল বক্তব্যকে জোরদার করা।

আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে কেন্দ্র করে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত ও কয়েকটি বাতিল ফেরকার অবস্থান

ক. মুতাজিলা ও জাহমিয়্যা

এ ফেরকা দুটি আকিদা এবং এ জাতীয় শব্দগুলোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। আকিদা যেহেতু বলছে, আল্লাহ তাআলা দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র, সেহেতু তারা যখন দেখল যে, কুরআনে আল্লাহ তাআলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত হয় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তখন তারা ঢালাওভাবে শব্দগুলোর তাবিল ও ব্যাখ্যা করল এবং সেগুলোকে তাঁর সিফাত হওয়ার ব্যাপারেই অস্বীকার করল। (নাউজুবিল্লাহ)

---

৮৫. সুরা হুদ, ৩৭

খ. মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা

এরা আবার সম্পূর্ণ উলটো কাজ করেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাতীয় শব্দগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহ তাআলার জন্য রীতিমতো শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সাব্যস্ত করে দিয়েছে, নাউজুবিল্লাহ। যেমন তাদের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলার হাত-চোখ-চেহারা ইত্যাদি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। অবশ্য তার ধরন কেমন তা সম্পর্কে তারা বলে, 'আমরা জানি না।'

গ. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত

আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং শব্দগুলো যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত বিশ্বাস করে যে, এ শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার সিফাত। কোনো অর্থেই এগুলো তাঁর সিফাত হওয়াকে তারা অস্বীকার করে না। তবে তিনি যেহেতু দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কাইফিয়াত বা ধরন থেকে চিরপবিত্র, তাই তারা শব্দগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে তাঁকে চিরপবিত্র মনে করে। ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف.
>
> আল্লাহ তাআলা কুরআনে চেহারা, হাত, নফস ইত্যাদি বলে যে-সকল শব্দ উল্লেখ করেছেন, তা মূলত আল্লাহর ধরনহীন গুণ।[৮৬]

ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

> وكذلك اليد من الصفات الأزلية بلا كيف ولا تشبيه ولا جارحة ، فنقر باليد ، والمراد به : ما أراده الله تعالى.
>
> অনুরূপ ইয়াদ (হাত) কোনো ধরন ও উপমা ছাড়াই অনাদি সিফাতের অন্তর্ভুক্ত এবং (তা) কোনো অঙ্গ নয়। সুতরাং আমরা ইয়াদকে (সিফাত হিসাবে) স্বীকার করব, তবে (ইয়াদ দ্বারা) আল্লাহ তাআলা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেটাই (আমাদের) উদ্দেশ্য।[৮৭]

---

৮৬. *আল-ফিকহুল আকবর*, ৬
৮৭. *বাহরুল কালাম*, ৪০

বাইহাকি রহ. বলেন,

(يدين) صفتين لا من حيث الجارحة

(يدين) তথা দুই ইয়াদ (হাত) তাঁর সিফাত। কিন্তু (দুই হাত) দৈহিক অঙ্গের অর্থে নয়।[৮৮]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

إن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له تعالى ، لا بمعنى الجارحة ، بل على وجه يليق به ، وهو سبحانه أعلم به.

নিশ্চয় হাত, আঙুল এবং এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ আল্লাহ তাআলার সিফাত। তবে এগুলো দৈহিক অঙ্গের অর্থে সিফাত নয়, বরং তাঁর শান অনুযায়ী (এগুলোর) অর্থ রয়েছে এবং সে সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত।[৮৯]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى ، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به.

ইয়াদ বা হাত শব্দটি কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত এ বিষয়ে একমত যে, হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয় যা সৃষ্টির গুণাগুণ। তারা এ সকল শব্দকে (সিফাতরূপে) সাব্যস্ত করেন এবং ঈমান রাখেন।[৯০]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আরও বলেন,

ومعاذ الله أن يكون لله جارحة.

আল্লাহ তাআলার কোনো অঙ্গ রয়েছে এমন কথা থেকে তাঁর নিকট পানাহ চাই।[৯১]

---

৮৮. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২৯৮
৮৯. *আল-মুসামারা*, ২০৩
৯০. *ফাতহুল বারি*, ১/২৬৯-২৭০
৯১. *ফাতহুল বারি*, ৩/৫৬৭

মোটকথা আস-সিফাতুল খাবারিয়া অথবা যে-সকল শব্দ আল্লাহ তাআলার জন্য দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টির মতো হওয়া বোঝায়, যেমন হাত-পা-চোখ, হাসি-ক্রোধ ইত্যাদি, **শব্দগুলোকে কোনো ধরন ছাড়াই তাঁর সিফাত হিসাবে স্বীকার করতে হবে এবং শব্দগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে তাঁকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করতে হবে।** তবে দেহবাদী ও মুশাব্বিহা ফেরকার আবির্ভাবের পর আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের পরবর্তী ইমামদের কেউ কেউ সাধারণ মানুষদেরকে দেহবাদী আকিদা থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে এই প্রকারের কিছু শব্দকে শর্তসাপেক্ষে তাবিল ও ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তাবিল অধ্যায়ে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

সারাংশ ও উপসংহার

- কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার যত সুন্দর ও মনোহর নাম রয়েছে, সে সকল নামেই তাঁকে ডাকা। তাঁর নাম নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সকল নাম তাওকিফি। ফলে দুর্বল বর্ণনা ও কিয়াসের মাধ্যমে কোনো নাম সাব্যস্ত করা যাবে না। প্রতিটি ভাষায় তাঁর নাম, গুণ ও সত্তাকে বোঝানোর উপযুক্ত শব্দ রয়েছে, ভাষাভাষীদের জন্য তা ব্যবহার জায়েজ। তাঁর নাম ও সত্তা এক নয়, বরং ভিন্ন। যে-সকল নাম শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, তা অন্য কারও জন্য ব্যবহার জায়েজ নেই এবং যে-সকল নাম কুরআন, হাদিস, উরফ ও সালাফদের মাঝে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এমন নাম রাখাতে সমস্যা নেই। নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি নামকে ইসমে আজম বলা যাবে না।

- কুরআন-হাদিসে আল্লাহ তাআলার নাম হিসাবে ব্যবহৃত কিংবা তাঁর শানে প্রয়োগকৃত সকল শব্দই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু কোনো নাম ও শব্দ যদি তাঁর মাঝে কোনোপ্রকার ত্রুটি ও অসম্মান বোঝায়, তবে তা অবশ্যই ব্যাখ্যাযোগ্য।

- সত্তাগত ও কর্মগত সকল সিফাত ও গুণ তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অনাদিকাল থেকে তিনি এ সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল অবধি থাকবেন। মনে রাখতে হবে, সিফাত অনাদি বটে, কিন্তু সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু অনাদি নয়, বরং সৃষ্ট। সৃষ্টিকুল অস্তিত্বে

আসার পর তাঁর মাঝে এমন কোনো গুণের সৃষ্টি হয়নি, যা পূর্বে ছিল না। আবার এমনও হয়নি যে, কোনো গুণ পূর্বে হয়তো অপূর্ণ ছিল, সৃষ্টির পর তা পূর্ণতা লাভ করেছে, নাউজুবিল্লাহ।

➥ আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ ও ধরন ছাড়াই তাঁর সিফাতরূপে স্বীকার করতে হবে এবং শব্দগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে তাঁকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করতে হবে। সাথে সাথে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করতে হবে।[৯২]

❋❋❋

---

৯২. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত ও নামধারী সালাফিদের মধ্যে আস-সিফাতুল খাবারিয়া-সংক্রান্ত তফাতের আলোচনা কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৮৫)
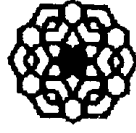
নবি-রাসুলগণ সম্পর্কে আকিদা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে (এ বার্তা দিয়ে) রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত (তথা মিথ্যা উপাস্য) থেকে দূরে থাকো।[৯৩]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন। এবং ওই কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাজিল করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও কেয়ামত দিবসকে, সে চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।[৯৪]

পরিচয়

১. নবি-রাসুল বলা হয় এমনসব মহান ব্যক্তিকে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জিন ও ইনসানের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। কাজেই জিন ও মানুষের জন্য তাদের ইত্তেবা ও অনুসরণ ফরজ।

২. নবি ও রাসুল এক, উভয়ের মাঝে পার্থক্য নেই। তবে কতক ইমামের মত হলো, নবি বলা হয় যার কাছে ওহি পাঠানো হয়, চাই তাকে তা পৌঁছানোর আদেশ দেওয়া হোক, বা না হোক। আর রাসুল বলা হয় যার

---

৯৩. সুরা নাহল, ৩৬

৯৪. সুরা নিসা, ১৩৬

নিকট ওহি পাঠানোর সাথে সাথে তাঁকে তা পৌছানোর আদেশ দেওয়া হয়। আবার কেউ বলেছেন, নবি-রাসুল উভয়ের কাছে ওহি পাঠানো হয় এবং তা পৌছানোর আদেশও দেওয়া হয়। কিন্তু নবি বলা হয় যাকে পূর্ববর্তী নবির শরিয়ত পৌছানোর আদেশ দেওয়া হয়, আর রাসুল বলা হয় যার নিকট নতুন শরিয়ত অবতীর্ণ করা হয়। তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, নবি ও রাসুলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

সত্তা

৩. নবি-রাসুলগণ আল্লাহ নন, আল্লাহর পুত্র নন, এমনকি আল্লাহর রূপান্তরিত (অবতার) কোনো সত্তাও নন, বরং তারা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। বস্তুত সকল নবি-রাসুলের ওপর ঈমান রাখা ফরজ।

৪. সকল নবি-রাসুল মানুষ ও পুরুষ ছিলেন। ফলে তারা রোগাক্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু মানুষের ঘৃণার উদ্রেক হয়—যেমন কুষ্ঠরোগ—এমন কোনো রোগ নবিদের দেওয়া হয়নি। কারণ তাদেরকে পাঠানোই হয় মানুষদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দেওয়ার জন্য। ঘৃণার দরুন যদি মানুষ তাদের কাছে যেতেই না পারে, তাহলে এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা থেকে যায়।

সংখ্যা

৫. নবি-রাসুলগণের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো বর্ণনামতে ১ লাখ ২৪ হাজার। কোনো বর্ণনামতে ১ লাখ ৩৪ হাজার। কোনো বর্ণনামতে ২ লাখ ২৪ হাজার। আবার কোনো বর্ণনামতে ৩ লাখ থেকেও বেশি। তবে শুদ্ধতার বিচারে কোনো সংখ্যাই চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে নবি-রাসুলগণের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন, আমরা তাদের সকলের ওপর ঈমান রাখি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾

> আর আমি (পাঠিয়েছি) এমন (কতিপয়) রাসুল যাদের বিবরণ আমি বর্ণনা করেছি আপনার কাছে ইতিপূর্বে এবং (পাঠিয়েছি) এমন (বহু) রাসুল যাদের বিবরণ আমি বর্ণনা করিনি আপনার কাছে (ইতিপূর্বে)।[৯৫]

---

৯৫. সুরা নিসা, ১৬৪

৬. পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ২৫ জন নবি হলেন, হজরত আদম আ., হজরত ইদরিস আ., হজরত নুহ আ., হজরত হুদ আ., হজরত সালিহ আ., হজরত ইবরাহিম আ., হজরত লুত আ., হজরত ইসমাইল আ., হজরত ইসহাক আ., হজরত ইয়াকুব আ., হজরত ইউসুফ আ., হজরত শুআইব আ., হজরত আইয়ুব আ., হজরত জুলকিফল আ., হজরত মুসা আ., হজরত হারুন আ., হজরত দাউদ আ., হজরত সুলাইমান আ., হজরত ইলিয়াস আ., হজরত ইয়াসা আ., হজরত ইউনুস আ., হজরত জাকারিয়া আ., হজরত ইয়াহইয়া আ., হজরত ঈসা আ., হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ওহি

৭. নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি আসত স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। ফেরেশতা বা অন্য কোনো মাধ্যমে। তারপর তারা তা পৌঁছে দিতেন মানুষের কাছে।

কিতাব ও সহিফা

৮. কিতাব ও সহিফা কতক নবি-রাসুলের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আবার কতকের ওপর অবতীর্ণ করা হয়নি।

শিক্ষা

৯. দুনিয়াতে নবি-রাসুলগণ কারও থেকে লেখাপড়া শেখেন না, বরং আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুদরতি উপায়ে তাদেরকে ইলম দান করেন।

ঈমান ও মর্যাদা

১০. ঈমান আনতে হবে সকল নবির ওপর। কোনো এক নবিকে অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না।

১১. নবিদের ওপর ঈমান না এনে আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর সকল নবির ওপর যে ঈমান আনবে, কেবল তার ঈমান গ্রহণযোগ্য।

১২. প্রতিজন নবি-রাসুলের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পোষণ করতে হবে। ইচ্ছাকৃত কারও প্রতি ন্যূনতম অসম্মান ও বেয়াদবি প্রকাশ করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

প্রথম ও শেষ নবি

১৩. প্রথম নবি ছিলেন হজরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবি হলেন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুজিজা

১৪. নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবি-রাসুলদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার হুকুমে অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। সেসব ঘটনাকে মুজিজা বলে। এগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। বিশ্বাস না করে জাদু, মিথ্যা, ধোঁকা ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া স্পষ্ট গোমরাহি। তবে মুজিজার ঘটনায় বাড়াবাড়ি রকম আকিদা পোষণ করা, যেমন নবিরা সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন, এটাও গোমরাহি।

পার্থক্য ও সমতা

১৫. নবুয়তের বিবেচনায় সকল নবি-রাসুলই সমান। ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা যাবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

আমরা তাদের (নবিদের) কারও মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করি না।[৯৬]

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به.

রাসুলদের কারও মাঝে আমরা কোনোরূপ পার্থক্য করি না। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তারা যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সবকিছুতেই আমরা তাদেরকে সত্যায়ন করি।[৯৭]

ব্যাখ্যা : এখানে পার্থক্য মানে একজন নবির প্রতি ঈমান আনা ও আরেকজনের প্রতি না আনা। অথবা একজনের নবুয়তকে স্বীকার করা ও আরেকজনেরটা অস্বীকার করা। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যেটা করে। তবে হ্যাঁ, ফজিলত ও মর্যাদার জায়গা থেকে নবিদের মাঝে তারতম্যের ব্যাপারটা স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৯৬. সুরা বাকারা, ১৩৬

৯৭. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ২২

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

আমি সেই রাসুলদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৯৮]

নবুয়ত স্বোপার্জিত নয়

১৬. নবুয়ত এমন কোনো জিনিস নয়, ইবাদত ও চেষ্টার মাধ্যমে যা অর্জন করা যায়, বরং এটা সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার দান। যাকে ইচ্ছা তিনি এর জন্য নির্বাচন করেন এবং নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কাজেই কোনো অলি ও বুজুর্গ ইবাদত, চেষ্টা-মুজাহাদা ও সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলেও তা অর্জন করা অসম্ভব এবং ইবাদত-মুজাহাদার মাধ্যমে কোনো নবির স্থান পর্যন্ত পৌঁছাও অসম্ভব।

নবিগণ সত্যবাদী ছিলেন

১৭. নবিগণ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তারা কখনো মিথ্যা বলেননি। উপরন্তু তারা প্রত্যেকেই উন্নত চরিত্র ও সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। মানুষকে তারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন এবং জাহান্নামের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। সদা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেছেন।

১৮. নবিদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। তাদের স্বপ্ন ওহি ও দলিল।

শিরক ও গুনাহ

১৯. নবুয়তের আগে-পরে কখনোই কোনো নবি-রাসুল শিরক ও মূর্তিপূজার ধারেকাছেও যাননি। ইচ্ছাকৃত সগিরা ও কবিরা গুনাহ এবং সকলপ্রকার মন্দ কাজ ও স্বভাব থেকে নবুয়তের আগে-পরে তারা নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিলেন। তবে নবুয়তের আগে-পরে ভুলে ও অনিচ্ছাকৃত সগিরা গুনাহ হওয়া সম্ভব। যেমন হজরত আদম আ.-এর ঘটনা। বলাবাহুল্য, পৃথিবীতে নবি-রাসুলগণ ছাড়া আর কেউই মাসুম তথা নিষ্পাপ নয়।

মিথ্যা ও খেয়ানত

২০. আল্লাহ তাআলার বার্তা ও আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নবিরা কখনো কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি এবং কোনোপ্রকার এদিক-সেদিকও

---

৯৮. সুরা বাকারা, ২৫৩

করেননি। কোনো কথা গোপন করা, লুকোচুরি করা কিংবা সত্য প্রকাশে কার্পণ্য ও ত্রুটিবিচ্যুতির সম্মুখীন হওয়া, কোনোটিই তাদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়নি, বরং তারা সকলকিছু সফল ও সঠিক নিয়মে এবং যথাযথভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন।

বিচ্যুতি

২১. কোনো নবি-রাসুলকে তাঁর নবুয়ত থেকে বিচ্যুত বা বরখাস্ত করা হয়নি। না জীবদ্দশায়, আর না মৃত্যুর পর। উল্লেখ্য, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার ফলে নবিদের নবুয়ত বাতিল হয়ে যায় না।

মৃত্যুর পরও তারা জীবিত

২২. মৃত্যু সবার জন্যই অবধারিত। পার্থিব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবিগণ দুনিয়ার জীবন থেকে বিদায় নিলেও মৃত্যুর পর তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জীবন লাভ করেছেন। তাই তারা কবরে জীবিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الأَنْبِيَاءُ أَحيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّون.

নবিগণ তাদের কবরে জীবিত, (সেখানে) তারা নামাজ আদায় করেন।[৯৯]

অন্য হাদিসে এসেছে,

مَرَرْتُ عَلَى مُوْسٰى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

আমি মেরাজের রাতে (বাইতুল মাকদিসের পাশে) লাল বালুর স্তুপের কাছে যখন মুসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন।[১০০]

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء.

---

৯৯. *হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকি*, ৭২, হাদিস : ২
১০০. *মুসলিম*, ২৩৭৫

সকল নবির রুহ কবজ করার পর তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই শহিদদের ন্যায় তারা তাদের রবের কাছে জীবিত।[১০১]

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, নবিদের কবরজীবন দুনিয়ার মতো নয়। স্বাভাবিকভাবে যথেচ্ছ গমনাগমন, সরাসরি কাউকে আদেশ-নিষেধ, পরামর্শ দান, সামনাসামনি সাক্ষাৎ প্রদান, বাহ্যিক কথোপকথন ও মুসাফাহা ইত্যাদির ক্ষমতাবিষয়ক শরয়ি কোনো দলিল নেই। তবে স্বপ্ন, কাশফ বা কারামতের মাধ্যমে যদি এগুলোর কোনোটি ঘটতে দেখা যায়, তবে সেটি ভিন্ন বিষয়।

ঈমান ও বিশ্বাস

২৩. সমস্ত নবি-রাসুলের দ্বীন তথা ঈমান ও বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। এতে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি। তবে হ্যাঁ, তাদের শরিয়ত তথা বিধিবিধানের মাঝে তারতম্য ছিল।

২৪. নবিদের সকল কথা মেনে নেওয়া জরুরি। একটি কথায়ও অবিশ্বাস ও সংশয় পোষণ করলে কিংবা হাসি-ঠাট্টা ও তামাশামূলক মনোভাব লালন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। নবিদের অনুসরণ মানে যেমন আল্লাহ তাআলার অনুসরণ, তেমনই নবিদের বিরোধিতা মানেও আল্লাহ তাআলারই বিরোধিতা।

নবিদের জন্য আল্লাহর গুণ

২৫. নবিদের জন্য আল্লাহ তাআলার সিফাত ও গুণ সাব্যস্ত করা জায়েজ নেই। যেমন তারা সবখানেই থাকেন, সমস্তকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, এমনকি যা ইচ্ছা করতে পারেন ইত্যাদি। (নাউজুবিল্লাহ)

হজরত ঈসা আ.

২৬. হজরত ঈসা আ. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে বিশ্বাস ও জ্ঞান করা শিরক।

২৭. আল্লাহ তাআলার কুদরতে তিনি বাবা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন। আবার সম্পূর্ণ নিজ কুদরতেই তিনি তাঁকে সশরীরে জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করেনি, করতে সক্ষম

---

১০১. *আল ইতিকাদ*, ৪১৫

হয়নি। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে তিনি আবার আমাদের নবির উম্মত হয়ে দুনিয়াতে আগমন করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন, খ্রিষ্টধর্মের পতন ঘটাবেন, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন ও ইসলামি শরিয়ত দ্বারা সমস্ত বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। সেইসাথে ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলোকে পুনর্জীবিত করবেন। এরপর নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমগণ জানাজা পড়িয়ে তাঁকে দাফন করবেন।

২৮. হজরত ঈসা আ. এবং ইমাম মাহদি এক নন, বরং তারা দুজন আলাদা ও ভিন্ন ব্যক্তি। তা ছাড়া হজরত ঈসা আ. হলেন নবি আর ইমাম মাহদি হলেন খলিফা।

২৯. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত দ্বীন বা ধর্ম একাধিক নয় বরং একটি, তা হলো ইসলাম। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو: دين الإسلام.

> আসমান ও জমিনে আল্লাহর দ্বীন হলো একটি, আর তা হলো ইসলামধর্ম।[১০২]

সকল নবির ধর্ম ছিল ইসলাম, কিন্তু শরিয়ত ও বিধিবিধানের মাঝে ভিন্নতা ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

> আমি তোমাদের প্রত্যেক (দল)-কে (ভিন্ন) জীবনবিধান ও পথপদ্ধতি দান করেছি।[১০৩]

প্রচলিত আছে আসমানি ধর্ম হলো তিনটি, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম, এটা স্পষ্ট ভুল। কেননা হজরত মুসা আ. ও হজরত ঈসা আ.-এর ধর্ম ছিল ইসলাম। ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ হলো তাদের ধর্মের বিকৃত রূপ, সুতরাং ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ কীভাবে আসমানি ধর্ম হতে পারে? বরং আসমানি ধর্ম হলো একটি, আর তা হলো ইসলাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

---

১০২. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ৩১

১০৩. সুরা মায়েদা, ৪৮

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।[১০৪]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১০৫]

❋❋❋

১০৪. সুরা আলে-ইমরান, ১৯

১০৫. সুরা আলে-ইমরান, ৮৫
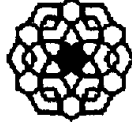
হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু আকিদা

ব্যাপ্তি

১. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠী বা এলাকার জন্য পাঠানো হয়নি, বরং তাঁকে গোটা জিন, ইনসান ও সমগ্র বিশ্বজগতের নবি করে পাঠানো হয়েছে। কাজেই নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে যত জিন-ইনসান ছিল, আছে ও আসবে, সকলের জন্যই তিনি নবি। সুতরাং তাঁর আনীত শরিয়তের মেয়াদ নির্দিষ্ট কোনো সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে এবং তা অনুসরণের মাঝেই সকলের মুক্তি নিহিত।

ইলম

২. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল নবি ও মানুষের চেয়ে বেশি ইলম ও জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, তিনি সর্বদা সবকিছু সম্পর্কে জানতেন বা তিনি গায়েব জানতেন। তিনি বরং সেটুকুই জানতেন, যেটুকু আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানাতেন।

শেষ নবি

৩. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পরে কেয়ামতের পূর্বে আর কোনো নবি আসবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

(হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি।[১০৬]

---

১০৬. সুরা আহজাব, ৪০

হাদিসে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ... وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ...অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, যাদের সকলেই দাবি করবে যে, সে নবি। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি, আমার পরে আর কোনো নবি নেই।[১০৭]

নবিজি আরও বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ "أَنْت مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي".

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলি রা.-কে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছে তেমন, হজরত মুসা আ.-এর কাছে হারুন আ. যেমন। তবে আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।[১০৮]

ব্যাখ্যা : হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি ও রাসুল। কেয়ামতের পূর্বে আর কোনো নবি আসবে না। ছায়া নবি, আসল নবি, শরিয়তহীন নবি, শরিয়তসহ নবি—কোনো প্রকারের কোনো নবিই আর আসবে না। নবুয়ত ও রিসালাতের মর্যাদা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে কেউ যদি নবি দাবি করে, তাহলে সে স্পষ্ট কাফের এবং জেনেবুঝে তাকে যে নবি মানবে, সেও কাফের। মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع.

আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুয়তের দাবি করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর।[১০৯]

---

১০৭. *তিরমিজি*, ২২১৯
১০৮. *মুসলিম*, ২৪০৪
১০৯. *শারহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার*, ২৭৪

৪. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কিতাব এবং তাঁর শরিয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে।

কীসের তৈরি তিনি

৫. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তাগতভাবে মাটির তৈরি ছিলেন। তবে গুণগতভাবে তিনি 'নুর' ছিলেন। অর্থাৎ নিজেও আলোকিত ছিলেন এবং অন্যকেও আলোকিত করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখতেন। সুতরাং যে-সকল জায়গায় তাঁকে বাশার বা রজুল (بشر/رجل) বলা হয়েছে, সেখানে তাঁর সত্তাগত দিক উদ্দেশ্য। আর যে-সকল জায়গায় তাঁকে নুর বলা হয়েছে, সেখানে তাঁর গুণগত দিক উদ্দেশ্য।

সম্মান ও ভালোবাসা

৬. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মাখলুক থেকে, এমনকি নিজের প্রাণ থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে। তাঁর প্রতি সম্মান লালন করা সকল উম্মতের ওপর ফরজ।

মেরাজ

৭. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজকে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় তিনি ইসরা তথা মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পরিভ্রমণ, মেরাজ তথা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বগমন করে সপ্ত-আসমান পেরিয়ে, আল্লাহ তাআলা যতটুকু চেয়েছেন সে পর্যন্ত যাওয়া। তারপর পুনরায় মক্কায় ফিরে আসা।

ইসরা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, ফলে তা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে, আর মেরাজ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ফলে তা অস্বীকার করলে কাফের হবে না, কিন্তু গোমরাহ ও বিদআতি সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

وخبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع.

আর মেরাজের ঘটনা সত্য। সুতরাং কেউ তা বিশ্বাস না করলে সে গোমরাহ, বিদআতি।[১১০]

---

১১০. *শরহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার*, ২২৮

ومن أنكر المعراج ينظر : إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر، وإن أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر.

কেউ যদি মেরাজকে অস্বীকার করে, তাহলে দেখতে হবে, যদি সে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস সফরকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের। আর যদি বাইতুল মাকদিস থেকে (ঊর্ধ্বগমনকে) অস্বীকার করে, তাহলে কাফের হবে না।[১১১]

মর্যাদা

৮. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজিলত ও মর্যাদাগত দিক থেকে সকল নবি-রাসুল ও মাখলুক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেয়ামতের দিন তিনি সকল নবি-রাসুলের সর্দার হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

রওজা মুবারকে তিনি জীবিত

৯. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রওজা মুবারকে জীবিত। সেখানে কেউ দরুদ পাঠ করলে তিনি তা নিজেই শুনতে পান। আর দূর থেকে কেউ দরুদ পড়লে তা ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তাঁর পিতামাতা

১০. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামাতা সম্পর্কে ইমাম ইবনু আবিদিন শামি রহ. বলেন,

ألا ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به ، كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم ، كما أحيي قتيل بني إسرائيل ليخبر بقاتله . وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى .

তুমি কি দেখছ না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন তাঁর পিতামাতাকে জীবন দানের মাধ্যমে,

---

১১১. *ফাতাওয়া আলামগিরি*, ১/১৪১

অতঃপর তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। যেমনটা এক হাদিসে এসেছে, হাদিসটিকে ইমাম কুরতুবি, ইবনু নাসিরিদ্দিনসহ অন্যান্য ইমাম সহিহ বলেছেন। ফলে তারা নিয়মবহির্ভূতভাবে মৃত্যুর পর ঈমান আনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। (এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) তাঁর নবিকে সম্মান দেওয়া। যেমন তিনি জীবিত করেন বনি ইসরাইলের নিহত ব্যক্তিকে, যাতে সে তার হত্যাকারী সম্পর্কে বলে দেয়। ঈসা আ.-ও মৃতদের জীবিত করতেন।[১১২]

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

أما إسلام أبويه ففيه أقوال ، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামাতা ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। উম্মাহর বড় বড় ইমাম এ কথাতে একমত।[১১৩]

উল্লিখিত বক্তব্য *মুসলিমে* বর্ণিত[১১৪] হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামাতাকে জান্নাতি বলেন, তারা মুসলিমের হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, তা ছিল তাদেরকে জীবিত করার পূর্বের ঘটনা। আবার কতক ইমামের মত হলো, তারা আহলে ফাতরা (নবিহীন যুগ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এই বিষয়টার সাথে যেহেতু আমল ও আকিদার কোনো সম্পর্ক নেই এবং মৃত্যুর পরও এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হবে না, সেহেতু এ বিষয়ে চুপ থাকাটাই উত্তম ও নিরাপদ।

তারা কি নবি?

১. হজরত খিজির আ. একজন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞানের একটা বড় অংশ দান করেছিলেন। তবে তিনি এখনো জীবিত আছেন কি না, এমন কোনো সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

তাঁর নবি হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কারও কারও মতে তিনি নবি ছিলেন। ইমাম আইনি রহ. বলেন,

---

১১২. *ফাতাওয়া শামি*, ৬/৩৫৬
১১৩. শারহুশ শিফা, ১/৬০৫
১১৪. *মুসলিম*, ২০৩

والصحيح أنه نبي.

আর বিশুদ্ধ মত হলো, তিনি নবি ছিলেন।[১১৫]

২. অধিকাংশ আলেমের মতে হজরত লুকমান নবি ছিলেন না। হ্যাঁ, তিনি একজন মুত্তাকি-পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন। যাকে আল্লাহ তাআলা উচ্চমানের জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও গাম্ভীর্য দান করেছিলেন।

৩. জুলকারনাইন একজন সৎ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তবে তাঁর নবি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায় না। ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেন,

والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين.

বিশুদ্ধ মত হলো, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন।[১১৬]

৪. সকল নবি-রাসুল মানুষ ও পুরুষ ছিলেন। নারীদের মধ্য থেকে কেউ নবি হননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ﴾

আপনার পূর্বে আমি বহু পুরুষকে (রাসুলরূপে) প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহি পাঠাতাম।[১১৭]

❋❋❋

১১৫. *উমদাতুল কারি*, ২/৯১
১১৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/১০৩
১১৭. সুরা নাহল, ৪৩

আসমানি কিতাব সম্পর্কে আকিদা

১. মানুষ ও জিনজাতির আকিদা-আমল পরিশুদ্ধ এবং তাদেরকে হেদায়েত ও সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় নবি-রাসুলদের ওপর নানান ভাষায় হজরত জিবরিল আ.-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কিতাব ও সহিফা নাজিল করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল সহিফা অর্থাৎ পুস্তিকা বা কয়েক পাতার কিতাব। আবার কিছু ছিল বড় আকারের কিতাব।

৩. সকল আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান আনা মুমিনদের ওপর ফরজ। অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো কিতাবকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ﴾

আর আপনি বলুন, আমি ঈমান এনেছি (প্রত্যেক) সেই কিতাবের প্রতি, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।[১১৮]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, **কিতাবসমূহ,** রাসুলগণ এবং পরকালকে যে অস্বীকার করবে, সে চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।[১১৯]

৪. প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব ও সহিফা পাঁচটি—

ক. হজরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর অবতীর্ণ সহিফা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

১১৮. সুরা শুরা, ১৫

১১৯. সুরা নিসা, ১৩৬

﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

ইবরাহিম ও মুসার সহিফাসমূহে।[১২০]

হজরত মুসার সহিফা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরাত।

খ. তাওরাত, যা অবতীর্ণ করা হয় হজরত মুসা আ.-এর ওপর।

গ. জাবুর, যা অবতীর্ণ করা হয় হজরত দাউদ আ.-এর ওপর।

ঘ. ইনজিল, যা অবতীর্ণ করা হয় হজরত ঈসা আ.-এর ওপর।

ঙ. আল-কুরআন, যা অবতীর্ণ করা হয় সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং তিনি উভয়টাই সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুরা ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সুরা নাস-এ সমাপ্ত। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(এ) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, তা বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[১২১]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

القرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب ، وفي القلوب محفوظ ، وعلى الألسن مقروء وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل.

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম, যা মুসহাফে লিপিবদ্ধ, অন্তরে মুখস্থ, জবানের মাধ্যমে পঠিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ।[১২২]

৫. আল্লাহর প্রেরিত আসল তাওরাত, ইনজিল বর্তমান দুনিয়ার কোথাও নেই। ফলে এ সময়ের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নিকট যে তাওরাত ও ইনজিল রয়েছে, তার ওপর ঈমান আনা জরুরি নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের

---

১২০. সুরা আলা, ১৯

১২১. সুরা সাজদা, ২

১২২. *আল-ফিকহুল আকবর*, ৫

বিশ্বাস হবে, আল্লাহ তাআলা যে তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছিলেন, তা সত্য ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে তার ওপর ঈমান আনয়ন ও তদনুসারে আমল করা ফরজ ছিল।

৬. সকল আসমানি কিতাব আল্লাহর বাণী, মানবরচিত নয় কোনোটি।

৭. আসমানি কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ। এরপর আর কোনো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হবে না। কুরআনের কোনো ক্ষুদ্র আয়াত অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধান চলমান থাকবে। এর মাধ্যমে অন্যান্য আসমানি কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

৮. কুরআন আজ অবধি বিকৃত হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবেও না। কুরআন বিকৃত হয়ে গেছে, এমন কোনো আকিদা পোষণ করা কুফর।

৯. পুরো কুরআন একবারে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে আনা হয়। তারপর বিভিন্ন পেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ ২৩ বছরে তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করা হয়।

১০. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় ও গোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হতো। কিন্তু কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জিন ও ইনসানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই কুরআন ও তার বিধান কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

১১.পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নেননি। কিন্তু কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। ফলে ১৪০০ বছর পরে আজও কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি ছাড়া কুরআন পাওয়া যাচ্ছে এবং কেয়ামতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তা এভাবেই তিনি সংরক্ষণ করবেন।

১২. কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম এবং তাঁর কালাম সৃষ্ট নয়।

১৩. কুরআন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় মুজিজা এবং ইসলামের সত্যতার বড় একটি প্রমাণ।

১৪. কুরআনকে বর্তমানে যে তারতিব ও বিন্যাসে পাওয়া যায়, এ বিন্যাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। তবে কুরআনের শব্দ ও আয়াতের বিন্যাস হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সুরার বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইখতেলাফ রয়েছে। কতক ইমামের মত হচ্ছে সাহাবিদের ইজমা দ্বারা হয়েছে, আবার কতকের

মত হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিগ্‌নির্দেশনা ও আদেশ অনুযায়ী হয়েছে। হাদিসে এসেছে,

فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِيْ ...

আয়েশা রা. বলেন, তিনি (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে আমাকে বলেছিলেন, জিবরিল আ. প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দুবার পড়ে শুনিয়েছেন। মনে হচ্ছে আমার বিদায়বেলা উপস্থিত...[১২৩]

এই তেলাওয়াতের অবশ্যই একটি তারতিব ও বিন্যাস ছিল। পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ের কেরাম কুরআনকে সে বিন্যাসেই বিন্যস্ত করেন। বর্তমানে কুরআন সে বিন্যাসেই বিদ্যমান।

১৫. কুরআনে কিছু বিধিবিধান সংক্ষিপ্তরূপে এসেছে আবার কিছু বিধিবিধান বিস্তারিতরূপে এসেছে। অনুরূপ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজেও বিভিন্ন বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। কাজেই কুরআন যেমন দলিল, হাদিসও তেমনই দলিল।

১৬. সকল আসমানি কিতাব আল্লাহ তাআলার কালাম। কিন্তু তাঁর কালাম বা কথাতে না আছে অক্ষর আর না আছে স্বর। হিব্রু, গ্রিক বা আরবি—কোনো ভাষায়ই তাকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। তবে সকল আসমানি কিতাব তাঁর কালামে নাফসি বা সত্তাগত কথাকে ব্যক্ত করছে। সুতরাং তাঁর কালাম তাঁর মতোই। অক্ষর ও স্বর যেহেতু সৃষ্ট, তাই সৃষ্ট কিছু আল্লাহ তাআলার সিফাত হতে পারে না।[১২৪]

১৭. কুরআনের প্রতি ঈমান কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হবে। কুরআন মাজিদের কিছু বিধান মানা ও কিছু না মানা আবার ক্ষেত্রবিশেষ সিদ্ধান্তদাতা বলে স্বীকার করা, ক্ষেত্রবিশেষ স্বীকার না করা সম্পূর্ণ কুফর। গোটা কুরআনকে অস্বীকার করা যে পর্যায়ের কুফর, এটাও ঠিক সে রকমেরই কুফর।

---

১২৩. *বুখারি*, ৩৬২৪

১২৪. বিষয়টি নিয়ে কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা রয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৯২)

১৮. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের হেদায়েত ও সফলতা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ তাঁর স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের দিশারি ও আদর্শরূপে গ্রহণ করবে, দোজাহানের সফলতা কেবল তারই নসিবে হবে।
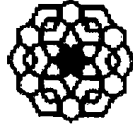
ফেরেশতা সম্পর্কে আকিদা

১. কিছু মাখলুককে আল্লাহ তাআলা নুর দিয়ে সৃষ্টি করে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রেখেছেন, তাদেরকে ফেরেশতা বলা হয়। তারা হলেন আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বান্দা। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾

বরং (ফেরেশতারা আল্লাহর) সম্মানিত বান্দা।[১২৫]

হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ...

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে...[১২৬]

২. ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ফরজ। কেউ অস্বীকার কিংবা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

আল্লাহ, **তাঁর ফেরেশতাগণ**, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ এবং পরকালকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হবে।[১২৭]

৩. কোনো কোনো ফেরেশতার দুই পাখা, কারও তিন, কারও-বা আবার চারটি পাখা। হাদিস থেকে জানা যায় যে, হজরত জিবরিল আ.-এর ৬০০ পাখা আছে। আদতে এই পাখা কেমন, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ভালো

---

১২৫. সুরা আম্বিয়া, ২৬

১২৬. *মুসলিম*, ২৯৯৬

১২৭. সুরা নিসা, ১৩৬

জানেন। কিংবা যিনি দেখেছেন, তিনি বলতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। ফেরেশতাদেরকে যিনি বানিয়েছেন বাণীবাহক। যাদের রয়েছে ডানা—দু-দুটি, তিন-তিনটি ও চার-চারটি।[১২৮]

৪. হজরত আদম আ.-এর সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. ফেরেশতা হলেন আল্লাহ তাআলা এবং নবি-রাসুলগণের মধ্যকার দূত, যেন বান্দা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান পৌঁছতে পারে।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন আসমানি কিতাব সংশ্লিষ্ট নবিদের নিকট পৌঁছেছে ফেরেশতার মাধ্যমেই।

৭. তারা পুরুষও নন, নারীও নন। উপরন্তু তাদেরকে নারী বলা কুফর।

৮. তারা খাওয়াদাওয়া, জুলুম-অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘুম, কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে পবিত্র।

৯. তাদের কোনো সন্তানসন্ততি নেই, নেই তাদের মাঝে সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশবিস্তারের প্রচলনও।

১০. বিভিন্ন আকার ও রূপ ধারণ করতে পারেন তারা। তা ছাড়া তারা বিরাট শক্তির অধিকারীও, ফলে বিভিন্ন কঠিন কঠিন কাজও আঞ্জাম দিতে পারেন তারা সহজেই।

১১.ফেরেশতারা কারও উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না, বরং সবাই আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী।

১২. সংখ্যায় তারা প্রচুর। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জ্ঞাত। তিনি ইরশাদ করেন,

---

১২৮. সুরা ফাতির, ১

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾

আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।[১২৯]

১৩. তারা সগিরা ও কবিরা—সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র।

১৪. তারা মাসুম তথা নিষ্পাপ। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেন না তারা কখনো। সর্বদা তারা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কার্যসম্পাদন করে থাকেন এবং তাঁর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও তারা করেন না।

১৫. ইবলিশের ব্যাপারে কতক আলেমের মত হলো, সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কতকের মত হলো যে, না, সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৬. সহিহ মতানুসারে হজরত হারুত ও মারুত আ. দুজন ফেরেশতা ছিলেন। তাদের থেকে কোনোপ্রকার কুফর ও গুনাহে কবিরা সংঘটিত হয়নি।

১৭. শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাগত দিক থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

১৮. আদমসন্তানদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিগণ, যেমন নবি-রাসুলগণ বিশেষ ফেরেশতা, যেমন হজরত জিবরিল ও মিকাইলসহ নৈকট্যপ্রাপ্ত অন্যান্য ফেরেশতা থেকে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ ফেরেশতাগণ অলি, সৎ, মুত্তাকিদের থেকে উত্তম। অলি, সৎ, মুত্তাকিরা সাধারণ ফেরেশতা থেকে উত্তম এবং সাধারণ ফেরেশতারা ফাসেক, পাপাচার, অসৎ মানুষ থেকে উত্তম। সাধারণ সকল আদমসন্তান সাধারণ সকল ফেরেশতা থেকে উত্তম।

১৯. তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২০. নবি-রাসুলদের নিকট ওহি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হজরত জিবরিল আ.।

২১. মেঘ প্রস্তুতকরণ, বৃষ্টিবর্ষণ ও আল্লাহর নির্দেশে মাখলুকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন হজরত মিকাইল আ.।

২২. হজরত ইসরাফিল আ. আছেন শিঙায় ফুৎকারের দায়িত্বে।

---

১২৯. সুরা মুদ্দাসসির, ৩১

২৩. মালাকুল মাউত তথা আজরাইল আ. আছেন জান কবজের দায়িত্বে।

২৪. জান কবজের ফেরেশতা একজন, না একাধিক? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا - الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

কাফেরগণ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন যদি আপনি দেখেন যে, ফেরেশতাগণ তাদের মুখে-পিঠে আঘাত করছে ও (বলছে যে,) তোমরা জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করো (তখন আপনি বড় করুণ দৃশ্য দেখতে পারতেন)।[১৩০]

উল্লিখিত আয়াতের (الْمَلَائِكَةُ) শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, 'জান কবজ'-এর ফেরেশতা একাধিক। অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

আপনি বলুন, তোমাদের জান কবজ করবে মৃত্যুর ফেরেশতা। যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে তোমাদের রবের কাছে।[১৩১]

উল্লিখিত আয়াতের (ملك الموت) শব্দ থেকে বোঝা যায় জান কবজের ফেরেশতা একজন। উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয় হলো, প্রাণ হরণ কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদের একটি জামাত ও দল আছে, যাদের প্রধান হলেন একজন। কাজেই প্রথম আয়াতটি পুরো দলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতটি শুধু প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

২৫. কাফেরের নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা এক ভয়ংকর আকৃতিতে উপস্থিত হয়। অতঃপর ভীষণ কষ্ট দিয়ে তার জান কবজ করে। পক্ষান্তরে মুমিনের কাছে উপস্থিত হয় বড় সুন্দর আকৃতিতে এবং তার জানও কবজ করে বেশ কোমলভাবে।

---

১৩০. সুরা আনফাল, ৫০
১৩১. সুরা সাজদা, ১১

২৬. আটজন ফেরেশতা কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশকে বহন করবে।

২৭. কিছু ফেরেশতা আছেন, যারা বান্দার প্রতিটি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

২৮. মুনকার-নাকির নামক দুজন ফেরেশতা আছেন। আকৃতির ভয়াবহতার কারণে এই শব্দে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়ার পর তারা দুজন এসে প্রশ্নোত্তর কার্যক্রম শুরু করেন।

২৯. সম্মানিত লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ছাড়াও কতক ফেরেশতা আছেন, যারা আদমসন্তানদের রক্ষাকারী হিসাবে নিযুক্ত।

৩০. কতক ফেরেশতা আছেন, যারা জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

৩১. কিছু ফেরেশতা আছেন, যারা বান্দাদের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

এ ছাড়াও আরও অনেক অনেক ফেরেশতা আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছেন।

কেয়ামত সম্পর্কে আকিদা

১. কেয়ামত বলা হয় এমন এক দিনকে যেদিন আল্লাহ তাআলা হিসাবের জন্য সকল প্রাণীকে পুনর্জীবিত করবেন। হিসাবনিকাশের পর একদল জান্নাতে যাবে, আরেক দল জাহান্নামে।

২. কেয়ামত সত্য এবং তার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। প্রত্যেক নবি তাঁর উম্মতকে কেয়ামত সম্পর্কে অবগত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

নিশ্চয় কেয়ামত আসবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।[১৩২]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[১৩৩]

৩. কেয়ামতের দিন নির্ধারিত। তবে তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। একটি হাদিস অনুযায়ী দিনটি হবে জুমার দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

নিশ্চয় কেয়ামতের ইলম শুধু আল্লাহর কাছেই আছে।[১৩৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ﴾

তোমরা আমাকে কেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করছ, অথচ তার ইলম তো একমাত্র আল্লাহর নিকট।[১৩৫]

---

১৩২. সুরা মুমিন, ৫৯

১৩৩. সুরা রুম, ১১

১৩৪. সুরা লুকমান, ৩৪

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾

জুমার দিনই সংঘটিত হবে কেয়ামত।[১৩৬]

৪. হজরত ইসরাফিল আ. শিঙায় ফুৎকার দিলে কেয়ামত হবে। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ ধ্বংস হবে। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আকাশ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ খসে পড়বে, পাহাড়-পর্বত ছিন্নভিন্ন হয়ে তুলার মতো উড়তে থাকবে। সকল মানুষ ও জীবজন্তু মরে যাবে, আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত জীবের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা সকলেই জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কতক ইমামের মতে দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে ৪০ বছর।

৫. কেয়ামতের দিন নেককারদের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বদকারদের শাস্তি দেওয়া হবে। প্রত্যেক জালেমকে তার জুলুমের বদলা দেওয়া হবে এবং যে-সকল মজলুম দুনিয়াতে জুলুমের ন্যায়বিচার পায়নি, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে। সেইসাথে প্রত্যেক হকদারের হক ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

৬. হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, আমাকে আল্লাহ আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ কি বলেননি,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

> যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাবনিকাশ সহজেই নেওয়া হবে।

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ আয়াতে আমলনামা কীভাবে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৩৭]

---

১৩৫. *মুসলিম*, ২৫৩৮
১৩৬. *মুসলিম*, ৮৫৪
১৩৭. *বুখারি*, ৪৯৩৯

কেয়ামতের ছোট আলামত

কেয়ামতের পূর্বে এর নিকটবর্তিতার প্রমাণস্বরূপ যে আলামতগুলো প্রকাশ পাবে, সেগুলোকে ছোট আলামত ও বড় আলামত এই পরিভাষায় আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট আলামতগুলো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার অনেক আগেই প্রকাশিত হবে। কিংবা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর থেকে নিয়ে ইমাম মাহদি আসার আগ পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে। এর মধ্যে কোনো কোনো আলামত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো আলামত নিঃশেষ হয়ে আবার প্রকাশ পাচ্ছে। কিছু আলামত আবার প্রকাশিত হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়েই যাচ্ছে। কিছু আলামত আছে, যেগুলো এখনো প্রকাশ পায়নি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ অনুযায়ী অচিরেই সেগুলো প্রকাশ পাবে।

কেয়ামতের ছোট আলামতের সংখ্যা অনেক। এ বিষয়ে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু হাদিসের সম্পূর্ণ অংশ উল্লেখ না করে হাদিসগুলোর শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হচ্ছে।

কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো হলো—

১. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও মৃত্যুবরণ।

২. সন্তানরা বাবা-মায়ের নাফরমানি করবে। বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিন্তু পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।

৩. পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্য হবে।

৪. দ্বীনি ইলম উঠে যাবে এবং অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে। আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে।

৫. অযোগ্যরা আমির ও বিচারক হবে এবং সর্বপ্রকার লেনদেন ও বিচারকার্য অযোগ্যদের দ্বারা সম্পন্ন হবে।

৬. সৎলোকের পরিবর্তে অসৎ ও খারাপ লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা।

৭. জালেম ও অসৎলোকদের অনিষ্ট ও জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তাদের সম্মান করা হবে।

৮. মিথ্যা, মদ্যপান ও মাদকের বিস্তার ঘটবে এবং জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বেড়ে যাবে এবং সত্য সাক্ষ্য লোপ পাবে।

১০. গানবাজনা ও গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবে। সেইসাথে নর্তকী ও গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং বাদ্যযন্ত্রসমূহের কদর করা হবে।

১১.দুনিয়ায় মুসিবত ও বিপদ-আপদ এত বেড়ে যাবে যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

১২. এই উম্মতের শেষ জামানার লোকেরা তাদের পূর্বযুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে।

১৩. শাসকরা দেশকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করবে।

১৪. প্রচুর ধনসম্পদ হবে এবং জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোক থাকবে না।

১৫. মানুষহত্যা বেড়ে যাবে।

১৬. সুদ-ঘুষ বেড়ে যাবে।

১৭. দ্বীনকে দুনিয়ার কাছে বিক্রি করে দেবে।

১৮. মসজিদে শোরগোল করা হবে।

১৯. অধিকহারে ভূমিকম্প হবে।

২০. মানুষের আকৃতি রূপান্তর, ভূমিধস ও আকাশ থেকে পাথর পড়বে।

২১. কাপড় পরিহিতাসত্ত্বেও উলঙ্গ নারীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

২২. আরব ভূখণ্ড আগের মতো তৃণভূমি ও নদনদীতে ভরে যাবে।

২৩. আমানতের খেয়ানত শুরু হবে এবং আমানত লুটের মালে পরিণত হবে। গনিমতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে এবং জাকাত জরিমানারূপে গণ্য হবে।

২৪. হিংস্র জীবজন্তু ও জড় পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলবে।

২৫. রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধ হবে।

২৬. কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে।

২৭. লজ্জা-শরম উঠে যাবে।

২৮. সর্বত্র জুলুম-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে।

২৯. পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। একজন পুরুষের ৫০ জন নারীকে দেখাশোনা করতে হবে।

৩০. মুসলিমরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

৩১. মুসলিমদের কেউ কেউ মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হবে। এমনকি অনেকে আবার মূর্তিপূজায়ও লিপ্ত হবে।

৩২. ফুরাত তার গর্ভস্থিত স্বর্ণ বের করে দেবে, যার পরিমাণ হবে পাহাড়সমান।

৩৩. ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে নবি বলে দাবি করবে।

❋❋❋

কেয়ামতের বড় আলামত

বড় আলামত বলা হয়, যা ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিয়ে শিঙায় প্রথম ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। উল্লেখ্য, বড় আলামতগুলো প্রকাশ পাবে কেয়ামতের খুব কাছাকাছি সময়ে। এসব আলামতকে সত্য-সঠিক জানা এবং তার ওপর ঈমান রাখা জরুরি। বড় আলামত প্রকাশ পাওয়াই প্রমাণ করবে কেয়ামত অতি নিকটে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সামান্য কিছু সময় বাকি আছে।

কেয়ামতের বড় আলামতগুলো হলো—

১. ইমাম মাহদির আগমন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.
>
> আমার পরিবারের একজন আরবের অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না। আমার নামের অনুরূপই তার নাম হবে।[১৩৮]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

> اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.
>
> মাহদি আমার পরিজন ফাতেমার সন্তানের বংশ হতে আবির্ভূত হবে।[১৩৯]

ইমাম মাহদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, মাহদি শব্দের শাব্দিক অর্থ হেদায়েতপ্রাপ্ত। কিন্তু যে মাহদির কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, তিনি হবেন একজন সৎ ব্যক্তি, তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি হবেন হজরত ফাতেমা রা.-এর বংশোদ্ভূত।

দৈহিক গঠন ও আখলাক-চরিত্রে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপই হবেন। তাঁর প্রকাশ হবে মক্কায়। ইরাক ও শামের অলি-

---

১৩৮. *তিরমিজি*, ২২৩০

১৩৯. *আবু দাউদ*, ৪২৮৪

আবদালগণ বাইতুল্লাহ তাওয়াফের সময় তাঁকে দেখে চিনে ফেলবেন এবং তাঁর হাতে বাইআত হবেন। প্রথমে তাঁর হুকুমত (রাজত্ব) শুধু আরবে হবে। তারপর সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে।

তাঁর যুগেই আবির্ভাব ঘটবে দাজ্জালের। তাঁর শাসনামলেই একদিন হজরত ঈসা আ. ফজরের নামাজের সময় দামেশকের পূর্ব প্রান্তে আসমান থেকে একটি সাদা মিনারার নিকট অবতরণ করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদির পেছনে মুক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করবেন। নাসারাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন।

ইমাম মাহদির বয়স যখন ৪০ বছর হবে, তখন তাঁর নিকট খেলাফতের বাইআত নেওয়া হবে। এ খেলাফতের সপ্তম বছরে বের হবে দাজ্জাল। তখন হজরত ঈসা আ. অবতরণ করলে দুই বছর ইমাম মাহদি হজরত ঈসা আ.-এর সঙ্গে থাকবেন। ৪৯ বছর বয়সে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। হজরত ঈসা আ. তাঁর জানাজা পড়াবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁকে দাফন দেওয়া হবে।

২. দাজ্জাল

দাজ্জাল সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ.
>
> এমন কোনো নবি প্রেরিত হননি, যিনি তার উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে হবে কানা। (অপরদিকে) তোমাদের রব কিন্তু কানা নন। তার দুচোখের মাঝখানে কাফের (كَافِرٌ) শব্দটি লেখা থাকবে।[১৪০]

আখেরি জামানায় কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমন কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বড় আলামত। এর চেয়ে বড় বিপদ মানবজাতির জন্য আর নেই। দাজ্জাল হবে দেখতে স্থূলকায়। গায়ের রং হবে লাল। চুলগুলো হবে কোঁকড়ানো। তার এক চোখ থাকবে কানা। দেখে মনে হবে যেন ফোলা আঙুরের মতো। দুই চোখের মাঝে (কপালে) লেখা থাকবে কা-ফে-র। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল

---

১৪০. *বুখারি*, ৭১৩১

মুমিনই পড়তে পারবে সে লেখা। তার উপাধি হবে মাসিহ। দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বে তিন বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে সে বের হবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে এবং সেখানে সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুগামী হবে। তখন সে নিজেকে খোদা দাবি করে বসবে।

লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টিবর্ষণ করে দেখাবে। মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে। জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে তার সাথে। মনে রাখতে হবে, তার জাহান্নাম হলো জান্নাত আর জান্নাত হলো জাহান্নাম। তার সাথে আরও থাকবে পানি ও আগুন। এ ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে, তার আগুন হবে শীতল পানি, আর পানি হবে আগুন। সে এমন অনেক অলৌকিক কর্মকাণ্ড করবে, যা দেখে দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামি হয়ে যাবে।

দাজ্জালের কোনো সন্তান হবে না। পবিত্র মক্কা-মদিনাতেও সে প্রবেশ করতে পারবে না। ৪০ দিন পর্যন্ত সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে। তন্মধ্যে প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনসমূহের মতোই। অবশেষে হজরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করলে তাঁর হাতেই নিহত হবে দাজ্জাল।

৩. হজরত ঈসা আ.-এর অবতরণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা সশরীরে, জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইহুদিরা তাকে হত্যা করতে পারেনি। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে তিনি আমাদের নবির উম্মত হয়ে আবার দুনিয়াতে আগমন করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ – وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ – مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ – وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾

অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। আর যারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে, তারা তার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত। কেবল ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনোই জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করেনি।[১৪১]

---

১৪১. সুরা নিসা, ১৫৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.
>
> শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারকরূপে অবতরণ করবেন মারইয়াম-পুত্র (ঈসা আ.)। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া (কর) রহিত করবেন এবং ধনসম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।[১৪২]

হজরত ঈসা আ. ফজরের নামাজের সময় দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারার নিকট আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এরপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আমাদের নবির শরিয়ত দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলোকে পুনর্জীবিত করবেন।

এক বর্ণনায় তার সাত বছর অবস্থানের কথা উল্লেখ থাকলেও আরেক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করবেন ৪০ বছর। উভয় বর্ণনাকে এভাবে সমন্বয় করা হয় যে, আসমানে তুলে নেওয়ার পূর্বে তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। অবতরণের পর অবস্থান করবেন তিনি সাত বছর। উভয়টাকে মিলিয়ে একসঙ্গে বলা হয়েছে ৪০ বছর। তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলমানগণ তার জানাজা নামাজ পড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে তাকে দাফন করবেন।

৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন

হজরত ঈসা আ.-এর অবতরণ এবং দাজ্জাল ধ্বংস হওয়ার কিছু সময় পর ইমাম মাহদি ইন্তেকাল করবেন। তারপর মানুষেরা হজরত ঈসা আ.-এর নেতৃত্বে চলবে এবং সর্বত্র শান্তি ও ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তখন হজরত ঈসা আ.-এর প্রতি এই মর্মে ওহি অবতীর্ণ করবেন যে, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটাচ্ছি, যাদের সঙ্গে কারোই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ কওমকে পাঠাবেন। ছাড়া পেয়ে তারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে অতি দ্রুততার সাথে। তাদের প্রথম দলটি 'বুহাইরায়ে তাবারিয়া'র (ভূমধ্যসাগর) উপকূলে এসে এর সমুদয় পানি

---

১৪২. *বুখারি*, ২২২২

পান করে নিঃশেষ করে দেবে। তারপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এ সমুদ্রে কি কখনো পানি ছিল?

ওদিকে ঈসা আ. ও তার সাথিদেরকে তারা অবরোধ করে রাখবে। তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ তখন আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের প্রতি আজাব পাঠাবেন। তাদের ঘাড়ে একপ্রকার পোকা হবে। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো তারা সবাই মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তারপর ঈসা আ. ও তাঁর সঙ্গীগণ পাহাড় হতে জমিনে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু তারা অর্ধহাত জায়গাও এমন পাবেন না, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের পচা লাশ ও লাশের নোংরা দুর্গন্ধ নেই। ঈসা আ. তার সঙ্গীদের নিয়ে তখন পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তিনি উটের ঘাড়ের মতো লম্বা এক ধরনের পাখি পাঠাবেন। এরা সেসব লাশকে বহন করে আল্লাহর ইচ্ছাধীন কোনো স্থানে নিয়ে ফেলে আসবে। এরপর তিনি এমন মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করবেন, যার ফলে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৫. বড় ধরনের তিনটি ভূমিধস

কেয়ামতের পূর্বে তিনটি বড় ধরনের ভূমিধস হবে। একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের ১০টি আলামতের মধ্যে একটি উল্লেখ করেন,

وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

তিনটি ভূমিধস। পূর্ব দিকে একটি ভূমিধস, পশ্চিম দিকে একটি ভূমিধস এবং আরব উপদ্বীপে একটি ভূমিধস।[১৪৩]

৬. বিশাল এক ধোঁয়া

কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বিশাল এক ধোঁয়া সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾

আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আকাশ এক স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে।[১৪৪]

---

১৪৩. *মুসলিম*, ২৯০১

কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এক ধোঁয়ার উত্থান ঘটবে, যা সমগ্র মানবজাতিকে ঘিরে নেবে। নেক ও ভালো মানুষদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হবে সামান্য, সর্দির মতো। আর কাফের ও মুনাফেকদের মস্তিষ্কে তা ঢুকে তাদেরকে সংজ্ঞাহারা করে দেবে।

৭. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে

এখন সূর্য উদিত হচ্ছে পূর্ব দিক থেকে। আখেরি জামানায় কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সূর্যোদয় ঘটবে পশ্চিমাকাশে। এটি হবে কেয়ামতের অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে। এ ঘটনার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

> পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, পৃথিবীর সকলে তখন ঈমান আনবে। অথচ সেটি এমনই এক সময়, পূর্বে যারা ঈমান আনেনি, তারা তখন ঈমান আনলে তা কোনো কাজে আসবে না।[১৪৫]

৮. কুরআনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে

কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষের অন্তর এবং মুসহাফ থেকে কুরআনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। কুরআনের কোনো শব্দই অবশিষ্ট থাকবে না মুসহাফে। এমনকি মানুষদের হাতেও থাকবে না কোনো কুরআন। হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে,

> لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَا يُتْرَكُ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ، وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ.

> এক রাতে কুরআন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মুসহাফ ও মানুষের হৃদয়ে কোনো আয়াত থাকবে না। কেননা তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।[১৪৬]

---

১৪৪. সুরা দুখান, ১০
১৪৫. *বুখারি*, ৪৬৩৫
১৪৬. *সুনানুদ দারিমি*, ৩৩৭০

৯. এক অদ্ভুত জন্তু

আখেরি জামানায় কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে জমিন থেকে দাব্বাতুল আরদ নামক এক অদ্ভুত জন্তুর আবিষ্কার হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। এটি হবে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম ও ভয়াবহ একটি আলামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

আর যখন (কেয়ামত সম্পর্কিত আমার) কথা তাদের সামনে এসে যাবে (অর্থাৎ কেয়ামত অতি নিকটবর্তী হয়ে যাবে), তখন আমি তাদের জন্য জমিন থেকে একটি জন্তু বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে। কেননা মানুষ আমার নিদর্শনাদিতে বিশ্বাস করত না।[১৪৭]

১০. কাবাঘর ভেঙে ফেলা হবে

কেয়ামতের পূর্বে কাবাঘর ভেঙে ফেলা হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

হাবাশার অধিবাসী পায়ের সরু নলাবিশিষ্ট লোকেরা কাবাগৃহ ধ্বংস করবে।[১৪৮]

১১. এক ভয়াবহ আগুনের বহিঃপ্রকাশ

কেয়ামতের পূর্বে ইয়েমেনের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে একত্র করবে এবং এটাই কেয়ামতের সর্বশেষ আলামত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

কেয়ামতের সর্বশেষ আলামত হলো ইয়েমেন থেকে এক আগুন প্রকাশিত হবে, যা মানুষদেরকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[১৪৯]

---

১৪৭. সুরা নামল, ৮২
১৪৮. *বুখারি*, ১৫৯১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ ... مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ.

> আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের আগে ইয়েমেন থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তার রুহ ওই বাতাস কবজ করে নেবে।[১৫০]

অন্য হাদিসে এসেছে, অতঃপর জমিনকে বলা হবে, ফল উৎপন্ন করো ও বরকত ফিরিয়ে দাও। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক তার খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ তাআলা দুধেও এত বরকত দেবেন যে, একটি দুধেল উষ্ট্রীর দুধ একটি বৃহৎ দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভির দুধ একটি গোত্রের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরির দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাদের এ অবস্থায় আচানক আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। এ বায়ু তাদের বগলের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবজ করবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে জিনায় লিপ্ত হবে। তাদের ওপর কেয়ামত সংঘটিত হবে।[১৫১]

এক বর্ণনামতে বাতাসটি বের হবে ইয়েমেন থেকে, অন্য বর্ণনামতে বাতাসটি বের হবে শাম থেকে।[১৫২] উভয় বর্ণনার মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হয় যে, বাতাস দুটি হবে, একটি শাম থেকে অন্যটি ইয়েমেন থেকে। অথবা একটি অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে তারপর একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

---

১৪৯. *মুসলিম*, ২৯০১

১৫০. *মুসলিম*, ১১৭

১৫১. ইবনে মাজাহ, ৪০৭৫

১৫২. *ইবনে হিব্বান*, ৭৩৫৩

পরকাল সম্পর্কিত আকিদা

মৃত্যু

১. যতক্ষণ দেহের মাঝে রুহ থাকে, ততক্ষণ জীবিত বলা হয়। যখন দেহ থেকে রুহ আলাদা হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় মৃত এবং সাথে সাথে সে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে স্থানান্তর হয়।

২. প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ - وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমাদের সকলকে (তোমাদের কৃতকর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কেয়ামতের দিন দেওয়া হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই হবে সফলকাম। আর (জান্নাতের বিপরীতে) এই পার্থিব জীবন নিছক প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়।[১৫৩]

৩. মৃত্যু কামনা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّه أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّه أَنْ يَسْتَعْتِبَ.

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভালো হলে (বয়স অনুপাতে) তার নেক আমল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে, সে তাওবা করার সুযোগ পাবে।[১৫৪]

---

১৫৩. সুরা আলে-ইমরান, ১৮৫

১৫৪. *বুখারি*, ৫৬৭৩

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَه، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

তোমাদের কেউ দুঃখকষ্টে পতিত হওয়ার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়।[১৫৫]

৪. মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

৫. মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করা।

৬. রুহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন।

৭. নেককার মারা যাওয়ার পর তার রুহ ইল্লিনে চলে যায়। আর বদকার মারা যাওয়ার পর তার রুহ চলে যায় সিজ্জিনে। 'ইল্লিন' বলা হয় জান্নাতের একটি উঁচু ও সম্মানিত স্থানকে। আর 'সিজ্জিন' বলা হয় জাহান্নামের একটি স্থানকে।

আখেরাত

১. যেসব মৌলিক বিষয়ের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক, তার মধ্যে একটি হলো আখেরাত। এই বিশ্বজগতের যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই এর শেষও রয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরায় সকলে জীবিত হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি পাবে।

পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারে সকল আসমানি কিতাব একমত। পরকালকে অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। এমনকি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর বিশ্বাসই হলো সকল বিশ্বাসের মূল। এর ওপর মানুষের অবিচলতা ও আত্মিক-চারিত্রিক পবিত্রতার ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

১৫৫. *বুখারি*, ৫৬৭১

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

পুণ্য কেবল এটা নয় যে, তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে। বরং পুণ্য (-বান) তো সে, যে ঈমান রাখে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, (সমস্ত) কিতাব ও নবিগণের প্রতি।[১৫৬]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾

আর কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করবেন।[১৫৭]

২. মানুষের অস্তিত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচটি অবস্থা—

ক. অনস্তিত্বকাল। খ. গর্ভাবস্থা। গ. দুনিয়া। ঘ. বরজখ। ঙ. আখেরাত।

আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো, মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর, হাশর-নাশর, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা। তবে মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোয় বিশ্বাস রাখা জরুরি।

কবর

১. প্রকৃত অর্থে কবর বলা হয় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার গর্তকে। তবে রূপক অর্থে কবর বলা হয়, মৃত্যুর পর থেকে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্যবর্তী কালকে। এ সময়টাকে বলা হয় কবরজগৎ।

২. বরজখ শব্দের অর্থ পর্দা বা অন্তরায়। মৃত্যুপরবর্তী জগৎ সম্পর্কে মানুষ সরাসরি কিছু জানতে পারে না। তাই একে আলমে বরজখ বলা হয়। মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি যে জগতে থাকে, তাকে আলমে বরজখও বলা হয়, আবার কবরজগৎও বলা হয়। মানুষ মৃত্যুর পরই আলমে বরজখে পৌঁছে যায়, চাই তাকে কবর দেওয়া হোক বা না হোক।

---

১৫৬. সুরা বাকারা, ১৭৭

১৫৭. সুরা হজ, ৭

৩. কবর হলো আখেরাতের প্রথম মনজিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.

নিশ্চয় কবর হলো আখেরাতের মনজিলসমূহের প্রথম মনজিল। কেউ যদি এখান থেকে রেহাই পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনজিলগুলো আরও সহজতর হবে। আর যদি সে এখান থেকে রেহাই না পায়, তবে পরবর্তী মনজিলগুলো তার জন্য আরও ভয়াবহ হবে।[১৫৮]

৪. কবরের আজাব সত্য এবং কেয়ামতের পূর্বেই কাফেররা কবরের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾

আর ফেরাউনের লোকদের বেষ্টন করে নিল মন্দ আজাব, অর্থাৎ আগুন। যার সামনে তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় হাজির করা হয়।[১৫৯]

হজরত আয়েশা রা. বলেন,

إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا".

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ইহুদি নারীর (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কাঁদছিল। তা দেখে তিনি বললেন, তারা তার জন্য কাঁদছে, অথচ কবরে তাকে আজাব দেওয়া হচ্ছে।[১৬০]

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ يَهُودِيَّةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ

---

১৫৮. *ইবনে মাজাহ*, ৪২৬৭
১৫৯. সুরা মুমিন, ৪৫-৪৬
১৬০. *বুখারি*, ১২৮৯

صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ "نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ". قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি স্ত্রীলোক আয়েশা রা.-এর কাছে এসে কবরের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে (দোয়া করে) বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করুন! পরে আয়েশা রা. কবরের আজাব সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবরের আজাব (সত্য)। আয়েশা রা. বলেন, এরপর থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।[১৬১]

ইমাম তাফতাজানি রহ. বলেন,

اتفق أهل الحق على أن الله يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار.

আহলে হক এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তাআলা পুনরায় করবে মৃত ব্যক্তিকে এ পরিমাণ জীবন দেবেন, যার মাধ্যমে সে আরাম বা আজাব উপলব্ধি করতে পারবে। কুরআন, হাদিস ও আসারের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত।[১৬২]

৫. কবরে চাপ দেওয়ার ব্যাপারটি সত্য। কাফেররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে। কতক পাপী মুমিনকে তার সম্মুখীন হতে হবে।

৬. মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, সে কবরজগতের অধিবাসী হয়ে যায়। নেককার হলে সে শান্তি ভোগ করতে থাকে। আর বদকার হলে তার ওপর আজাব চলতে থাকে।

৭. মাছ বা হিংস্র প্রাণী যদি কাউকে খেয়ে ফেলে তাহলে সে প্রাণী ও মাছের পেটই তার কবর। যদি পানিতে ডুবে মারা যায় অথবা দুর্ঘটনায় মারা যায়

---

১৬১. *বুখারি*, ১৩৭২
১৬২. *শারহুল মাকাসিদ*, ৩/৩৬৬

এবং দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, কোনো অংশ মাটিতে, কোনো অংশ পানিতে, কোনো অংশ অন্য কোথাও, তাহলে দেহের যেকোনো একটি অংশে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং মুনকার-নাকিরের সওয়াল-জওয়াব হবে এবং রুহের সাথে দেহের সে অংশ নেয়ামত বা আজাব ভোগ করবে।

৮. কবরের আজাব মূলত হয় রুহের ওপর। তবে রুহের সাথে সাথে দেহও সেই আজাব উপলব্ধি করে।

৯. কবরের মধ্যে আকিদা সম্পর্কে জিন ও ইনসানকে মুনকার-নাকিরের সওয়াল-জওয়াব সত্য। বলাবাহুল্য, মুনকার ও নাকির হলেন দুজন ফেরেশতা।

১০. মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দেহের ভেতর রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মুনকার-নাকির তখন তিনটি প্রশ্ন করবেন—

ক. তোমার রব কে?

খ. তোমার নবি কে?

গ. তোমার দ্বীন কী?

নেককার ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে। তখন তার কবর ও জান্নাতের মধ্যকার দুয়ার খুলে দেওয়া হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে সুখেশান্তিতে বসবাস করতে থাকবে। আর যদি সে নেককার না হয়, (অর্থাৎ কাফের বা মুনাফেক হয়) তাহলে সে বলবে, হায়! হায়! আমি তো জানি না! তখন তার কবর ও জাহান্নামের মাঝে দুয়ার খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বিভিন্নরকম শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

ইমাম আইনি রহ. বলেন,

> إن الأرواح تعاد إلى الأجسام عند المسئلة وهو قول الأكثر من أهل السنة.
>
> কবরে প্রশ্নের সময় রুহকে দেহের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটাই অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের মত।[১৬৩]

১১.কবরে কোন ভাষায় প্রশ্ন করা হবে?

এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো দলিল পাওয়া যায় না। তবে আলেমগণ কিয়াস করে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমন কেউ বলেছেন, প্রশ্ন হবে সব থেকে প্রাচীন

---

১৬৩. *উমদাতুল কারি*, ১৭/১২৫

সিরীয় ভাষায়। আবার কেউ মত দিয়েছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু কবরের প্রশ্ন আরবি শব্দে উল্লেখ করেছেন, সে হিসাবে প্রশ্ন আরবিতেই হবে। কারও আবার মত হলো, যে যে ভাষাই বোঝে, তাকে সেই ভাষায় প্রশ্ন করা হবে। আবার কেউ বলেছেন, স্পষ্ট কোনো দলিল যেহেতু নেই, তাই এ বিষয়ে চুপ থাকাটাই উত্তম।

১২. অধিকাংশ আলেমের মতে পাঁচ শ্রেণির ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সবারই এই সওয়াল-জওয়াব হবে। তারা হলেন—

ক. নবি-রাসুল।

খ. সিদ্দিকিন। তবে কতক আলেমের মতে তাদেরও সওয়াল-জওয়াব হবে।

গ. আল্লাহর রাস্তায় শহিদগণ।

ঘ. আল্লাহর রাস্তায় পাহারা অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন।

ঙ. ছোট বাচ্চা ও পাগল। তবে তাদের বিষয়ে আলেমদের মাঝে ইখতেলাফ রয়েছে। কতক আলেমের মত হলো তাদেরকে সওয়াল-জওয়াব করা হবে। আবার কতকের মত তাদেরকে করা হবে না, কেননা তারা মুকাল্লাফ নয়।

১৩. কতক আলেমের মতে পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবির উম্মতেরও এমন সওয়াল ও জওয়াব হয়েছে।

১৪. নবি-রাসুলদের দেহকে আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

১৫. কবরের আজাব দুই প্রকার—

ক. 'স্থায়ী আজাব', যা একমাত্র কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য।

খ. 'সাময়িক আজাব', যা কতিপয় পাপী মুমিনের জন্য প্রযোজ্য।

১৬. অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার পর কখনো মুমিনের আজাব বন্ধ করে দেওয়া হবে। আবার কখনো অন্যের দোয়া, সদকা, ইসতেগফারের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

১৭. জীবিত মুসলমানের দোয়া, দান-খয়রাত ও নামাজ-তেলাওয়াত দ্বারা মৃত মুসলমানের উপকার হয়। তবে কাফেরদের বেলায় এগুলো কোনো

উপকার দেয় না। কাজেই কারও কোনোপ্রকার দান, দোয়া ও খয়রাত দ্বারা তারা উপকৃত হয় না এবং এর দ্বারা তাদের শাস্তিও লাঘব হয় না।

পুনরুত্থান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا - قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ - وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

কাফেররা দাবি করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, (কেন হবে না?) আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদের জানানো হবে, যা তোমরা করেছ। আর তা আল্লাহর জন্য সহজ।[১৬৪]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

তারপর তোমরা কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।[১৬৫]

১. পুনরুত্থান বলা হয় করব থেকে দেহগুলোকে বের করে তার মাঝে রুহ ফিরিয়ে দেওয়াকে।

২. রুহ ও শরীরের পুনরুত্থান হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا.

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রাণ নিজ দেহে প্রবেশ করবে।[১৬৬]

৩. সত্তাগতভাবে রুহ তথা আত্মা অনন্তকাল জীবিত থাকে এবং দেহ জীবিত থাকে আত্মার সাহায্যে। যতদিন দেহের মাঝে প্রাণ ও আত্মা থাকে, ততদিন তা জীবিত থাকে। যখনই তা বেরিয়ে যায়, তখন থেকেই তাকে মৃত বলা হয়।

---

১৬৪. সুরা তাগাবুন, ৭

১৬৫. সুরা মুমিনুন, ১৬

১৬৬. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস : ২৭৩৮৭

৪. শরীরসহ পুনরুত্থানের ধরন বিষয়ে চারটি মত—

ক. শরীরের সকল বিক্ষিপ্ত মূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একত্র করার মাধ্যমে পুনরুত্থান হবে। কারণ ধ্বংস মানেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া।

খ. সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা আবার সব সৃষ্টি করবেন এবং সেই দ্বিতীয় সৃষ্টির মাধ্যমেই হবে পুনরুত্থান।

গ. মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে-গলে শেষ হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন ওই হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

ঘ. এ বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম। তবে পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে হবে। কেউ অস্বীকার করলে বা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলে কাফের হয়ে যাবে।

৫. ফেরেশতা, পশুপাখি, জিন-ইনসান, চাই ছোট হোক বা বড়, কিংবা পাগল, সবাই পুনরুত্থিত হবে, এমনকি অকালপ্রসূত ভ্রূণও পুনরুত্থিত হবে।

হাশর

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

> আর আমি তাদের (সকলকে) একত্র করব এবং তাদের একজনকেও ছাড়ব না।[১৬৭]

১. আভিধানিক অর্থে 'হাশর' হলো, একত্র করা, জড়ো করা, পুনরুত্থিত করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সকল সৃষ্টিকে এক স্থানে একত্র করাকে 'হাশর' বলা হয়।

২. শিঙায় প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সকলকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল ফেরেশতা মৃত্যুবরণ করবেন, এমনকি হজরত ইসরাফিল আ.-ও। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা হজরত ইসরাফিল আ.-কে পুনর্জীবিত করবেন এবং দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুৎকারের আদেশ করবেন। দ্বিতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পিপীলিকা ও বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো সবাই উঠে দাঁড়াবে।

৩. প্রথমে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর খুলবে।

---

১৬৭. সুরা কাহাফ, ৪৭

৪. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় জমিনের ওপর একত্র করা হবে। সেখানে থাকবে না কারও কোনো পরিচিতিমূলক চিহ্ন বা পতাকা।[১৬৮]

৫. কেয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। সে সময়টি এতই ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারও প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশও পাবে না।

৬. হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে উত্থিত হবে। ক. একদল বাহনে করে, খ. একদল পদব্রজে, গ. একদল উপুড় হয়ে মাথার ওপর ভর করে।

৭. প্রথম কাপড় পরানো হবে হজরত ইবরাহিম আ.-কে। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নবি, রাসুল ও সিদ্দিকিন। অতঃপর বাকি মানুষদেরকে তাদের প্রত্যেকের স্তর অনুযায়ী।

৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেয়ামত দিবসে সূর্যকে মানুষের এত নিকটে আনা হবে যে, তা মাত্র এক-দুমাইল ব্যবধানে থাকবে। তিনি বলেন, সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। কারও গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মতো বেষ্টন করবে। এই কথা বলার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করে লাগামের মতো বেষ্টন করাকে বোঝালেন।[১৬৯]

৯. কেয়ামতের দিন আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন আদমসন্তানদের নেতা ও সুপারিশকারী।

১০. হাশরের দিন সবাই একা একা থাকবে এবং সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। কারও অনুপস্থিত থাকার কোনো সুযোগ নেই।

১১.হাশরের দিনে কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন যে-সকল ব্যক্তি আল্লাহর আরশে ছায়াপ্রাপ্ত হবে : ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ২. ওই যুবক, যে নিজের

---

১৬৮. *বুখারি*, ৬৫২১
১৬৯. *তিরমিজি*, ২৪২১

যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। ৩. ওই ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ৪. ওই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। ৫. যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে। ৬. ওই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. ওই ব্যক্তি যে এত সঙ্গোপনে দান করে যে, তার বাঁ হাতও জানে না, ডান হাত কী দান করে। ৮. যে লোক অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়।

১২. হাশরের দিন ঈমানদারদের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও পাপীদের চেহারা হবে কালো, কুৎসিত।

১৩. যে ব্যক্তি যে অবস্থায় মারা যাবে, সে ওই অবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠবে।

১৪. অধিকাংশ ইমামের মতে একমাত্র মুমিনগণ জান্নাত থেকে মহান রবের দিদার লাভ করবে, হাশরের ময়দানে কোনো কাফের বা মুনাফেক তাঁর দিদার লাভ করবে না।

১৫. হাশরের ময়দানে সকল পশুপাখিকেও একত্র করা হবে এবং তাদের মাঝে কিসাসের ব্যবস্থা করা হবে। অতঃপর সকল পশুপাখিকে বলা হবে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। সবাই তখন মাটি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾

যখন বন্য পশুদের একত্র করা হবে।[১৭০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

কেয়ামতের দিন অবশ্যই প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।[১৭১]

---

১৭০. সুরা তাকবির, ৫

হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন,

يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم، والدواب والطير وكل شيئ فيبلغ عن عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا.

কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হবে। (অর্থাৎ) পশুপাখি, জন্তুজানোয়ারসহ সবকিছুকে (একত্র করা হবে)। আল্লাহ তাআলার ইনসাফ তখন এই স্তরে উপনীত হবে যে, তিনি শিংবিশিষ্ট পশু থেকে শিংবিহীন পশুর (প্রতিশোধ) গ্রহণ করবেন। তারপর বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও।[১৭২]

হিসাবনিকাশ সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অতএব আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব, ওরা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে।[১৭৩]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾

আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।[১৭৪]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

(হে) আমাদের রব! যেদিন হিসাব সংঘটিত হবে, সেদিন আমাকে ও আমার মাতাপিতাসহ সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।[১৭৫]

---

১৭১. *মুসলিম*, ২৫৮২
১৭২. *মুসতাদরাকুল হাকিম*, ২/৩৪৬, হাদিস : ৩২৩১
১৭৩. সুরা হিজর, ৯২-৯৩
১৭৪. সুরা আম্বিয়া, ৪৭
১৭৫. সুরা ইবরাহিম, ৪১

১. হিসাবনিকাশ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করা এবং তাকে তার কর্ম অনুসারে প্রতিদান দেওয়া। হিসাবনিকাশের কয়েকটি স্তর, আমলনামা বণ্টন, প্রশ্ন করা, মিজান, সিরাত।

২. কেয়ামতের দিন হিসাবনিকাশের জন্য সকলকে আল্লাহ তাআলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলা একই সময়ে সকলের হিসাব নেবেন। প্রত্যেকেই দেখবে যে, তারই হিসাব নেওয়া হচ্ছে। সকলের হিসাব একসাথে নেওয়া এবং একসাথে সকলের কথা শুনতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[১৭৬]

৪. হিসাব নেওয়ার ধরন হবে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—

ক. সহজ হিসাব বা কঠিন হিসাব।

খ. প্রদর্শন এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হিসাব।

গ. গোপনে বা প্রকাশ্যে হিসাব।

ঘ. তিরস্কার ও ভর্ৎসনা এবং অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে হিসাব।

৫. কোনোপ্রকার শাস্তি ভোগ করা ছাড়াই সম্পূর্ণ বিনা হিসাবে ৭০ হাজার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাদের প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরও ৭০ হাজার। এর বাহিরেও থাকবে আল্লাহ তাআলার হাতের মুঠির তিন মুঠ পরিমাণ। মানুষদের তিনটি দল হবে, এক দলের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না। আরেক দলের সহজ হিসাব নেওয়া হবে। এই উভয় দল মুমিনদের মধ্য থেকে হবে। সহজ হিসাবের ধরন হচ্ছে ব্যক্তির নিকট আমল পেশ করা হবে এবং সে বুঝতে পারবে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। ভালো কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে আর মন্দ কাজকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। আরেক দলের কঠিন হিসাব নেওয়া হবে। এখানে মুসলিম-কাফের উভয় দলের লোক থাকবে।

---

১৭৬. সুরা ইবরাহিম, ৫১

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে সকল মহান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কোনো হিসাব, শাস্তি ও তিরস্কার ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আমিন।

৬. হিসাব ছাড়া কথাটির দুটি অর্থ—

ক. একেবারেই হিসাব না নেওয়া।

খ. জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হিসাব না নেওয়া।

৭. যাদের হিসাব নেওয়া হবে না, তাদের থেকে মিজান ও দাঁড়িপাল্লার বিষয়টিও উঠিয়ে নেওয়া হবে।

৮. অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সেগুলো কৃতকর্ম সম্পর্কে সত্য সত্য সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

> সেদিন তাদের জিহ্বা ও তাদের হাত-পা তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তারা যা-কিছু করত তা সম্পর্কে।[১৭৭]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ - وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ - وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

> আর জাহান্নামিরা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? উত্তরে সেগুলো বলবে, আমাদের বাক্‌শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি বাক্‌শক্তি দিয়েছেন সবকিছুকে। আর তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১৭৮]

৯. পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে কেয়ামতের দিন কোনো আদমসন্তানের পা নাড়ানোর ক্ষমতা থাকবে না। জীবন সম্পর্কে, কীভাবে তা অতিবাহিত করেছে। তার যৌবনকাল সম্পর্কে। ধনসম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে ও কী কী খাতে তা খরচ করেছে। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।

---

১৭৭. সুরা নুর, ২৪

১৭৮. সুরা হা-মিম সাজদা, ২১

১০. ব্যক্তিকে তার ছোট-বড় সকলকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি সে সত্য ও সঠিক উত্তর দেয়, তাহলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কেউ মিথ্যা বলে, লুকায় বা অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুনিয়াতে তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

১১.কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না।

আমলনামা বণ্টন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ - وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾

আর যা-কিছু তারা করেছে, তার সবই লিখিত আছে (তাদের) আমলনামায়। প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই লিপিবদ্ধ আছে।[১৭৯]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾

অতঃপর যাকে তার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, সে বলবে, (হে লোকসকল) এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো।[১৮০]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ﴾

আর যাকে তার বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! কতই-না ভালো হতো, যদি আমাকে আমার আমলনামা না দেওয়া হতো![১৮১]

১. আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন যারা তার প্রতিটি আমল লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন,

---

১৭৯. সুরা কামার, ৫২-৫৩
১৮০. সুরা হাক্কা, ১৯
১৮১. সুরা হাক্কা, ২৫

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾

অথচ তোমাদের জন্য (নিযুক্ত) আছে তত্ত্বাবধায়কগণ, যারা মর্যাদাশীল, (তোমাদের আমল) লিপিবদ্ধকারী।[১৮২]

২. প্রত্যেক মানুষের একটি আমলনামা রয়েছে, যাতে তার ভালো-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ। কেয়ামতের দিন তার নিকট তার সেই আমলনামা পেশ করা হবে।

৩. মুমিনদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে আর কাফেরদের আমলনামা দেওয়া হবে পিঠের পেছন দিয়ে বাম হাতে। তাওহিদের স্বীকৃতি দানকারী গুনাহগার বান্দাদের আমলনামা কোন হাতে দেওয়া হবে, এটা নিয়ে আলেমদের মধ্যে ইখতেলাফ আছে। কারও মতে ডান হাতে দেওয়া হবে। আবার কারও মতে বাম হাতে দেওয়া হবে।

৪. আমলনামা দেওয়ার পর সবাইকে আমলনামা পড়তে বলা হবে। প্রত্যেকেই অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্য ছাড়াই পড়তে পারবে। চাই সে দুনিয়ায় পড়তে পারুক বা না পারুক।

প্রশ্ন করা

বান্দারা যখন নিজ নিজ আমলনামা হাতে পাবে এবং নিজ কর্ম সম্পর্কে অবগত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রশ্ন করবেন। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অতএব আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব, তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে।[১৮৩]

প্রশ্ন কয়েক ধরনের হবে। যেমন—

১. তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক প্রশ্ন। যেমন সাধারণ মানুষদেরকে নিজ নিজ অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

১৮২. সুরা ইনফিতার, ১০-১১
১৮৩. সুরা হিজর, ৯২-৯৩

﴿وَقِفُوهُمْ - إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾

এবং তাদের থামাও, তাদের প্রশ্ন করা হবে।[১৮৪]

২. হুমকি প্রদর্শনমূলক প্রশ্ন। যেমন কাফেরদের প্রশ্ন করা হবে, কেন তারা রাসুলদেরকে অস্বীকার করল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾

অতএব আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করব, যাদের নিকট (রাসুল) পাঠানো হয়েছিল।[১৮৫]

৩. সমর্থনমূলক প্রশ্ন। যেমন রাসুলদেরকে প্রশ্ন করা হবে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾

আর আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রাসুলদের।[১৮৬]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কুরআনের যে-সকল আয়াতে বলা হয়েছে কাউকে প্রশ্ন করা হবে না, যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾

আর অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীদের প্রশ্ন করা হবে না।[১৮৭]

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾

সেদিন কোনো মানুষ ও জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[১৮৮]

---

১৮৪. সুরা সাফফাত, ২৪
১৮৫. সুরা আরাফ, ৬
১৮৬. সুরা আরাফ, ৬
১৮৭. সুরা কাসাস, ৭৮

উল্লিখিত আয়াত দুটিতে প্রশ্ন না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো মানুষ ও জিনকে তার গুনাহসমূহ জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হবে না, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রথম থেকেই সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

মিজান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

আর আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়ানুগ দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব।[১৮৯]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ - فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

আর সেদিন (আমলসমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য। আর যাদের পাল্লা হবে হালকা, তারাই সেসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।[১৯০]

১. কেয়ামতের ময়দানে হিসাবনিকাশের পালা শেষ হওয়ার পর বান্দার ভালো ও মন্দ আমল পরিমাপের জন্য একটি দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে।

২. মিজানকে অস্বীকার করা যাবে না। অনুরূপ মুতাজিলাদের মতো রূপক অর্থ নিয়ে এটা বলা যাবে না, মিজান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিসাবনিকাশে আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করবেন, বরং হাকিকত বা বাস্তবতার ওপর বিশ্বাস আনতে হবে এবং তা কেমন হবে, তা আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

৩. মিজান একাধিক হবে না, বরং তা হবে একটি এবং তার পাল্লা থাকবে দুটি।

৪. ওজন করা হবে কয়েক স্তরে—

---

১৮৮. সুরা রহমান, ৩৯
১৮৯. সুরা আম্বিয়া, ৪৭
১৯০. সুরা আরাফ, ৮-৯

ক. প্রথম স্তরে কে মুমিন আর কে কাফের, এটা পার্থক্যের জন্য ওজন করা হবে। যার কাছে শুধু কালিমা থাকবে বা যে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার নেকির পাল্লা ভারী হবে এবং সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে।

খ. দ্বিতীয় স্তরে শুধু মুমিনদের নেক ও বদ আমল ওজন করা হবে। যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে হবে কামিয়াব ও জান্নাতি। আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, আল্লাহর কাছে সে গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর সে আবার জান্নাতে ফিরে আসবে।

৫. কাফেরদের জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে কি না এ বিষয়েও আলেমদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন করা হবে, আর কেউ বলেন, করা হবে না। কারও আবার মত হলো, ভালো-মন্দ নির্ণয়ের জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না, বরং তাদের মধ্যে কার কুফরের পরিমাণ কত বেশি, এটা নির্ণয়ের জন্য স্থাপন করা হবে।

৬. আমল ওজনের পদ্ধতির বিষয়ে চারটি মত পাওয়া যায়—

ক. অধিকাংশ আলেমদের মতে লিপিবদ্ধ খাতাকে ওজন দেওয়া হবে। নেক আমলের খাতা রাখা হবে এক পাল্লায় আর বদ আমলের খাতা রাখা হবে আরেক পাল্লায়।

খ. আমলকে একটা আকৃতি দিয়ে তা দেহে রূপান্তরিত করা হবে। তারপর সেই দেহকে ওজন দেওয়া হবে। এতে নেককারদের আমল হবে সুন্দর আকার, আর বদকারদের আমল হবে কুৎসিত আকারসম্পন্ন।

গ. স্বয়ং ব্যক্তিকেই ওজন দেওয়া হবে।

ঘ. কারও ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ খাতাকে ওজন দেওয়া হবে, আবার কারও ক্ষেত্রে আমলকে দেহে রূপান্তর করে ওজন দেওয়া হবে। আবার কারও ক্ষেত্রে স্বয়ং ব্যক্তিকেই ওজন দেওয়া হবে।

৭. যে-সকল আমল মিজানের পাল্লাকে ভারী করবে সেগুলো হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সচ্চরিত্র ও সদাচার।

৮. যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সফল ও জান্নাতি এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে দুর্ভাগা ও জাহান্নামি। আর যার নেকি ও পাপ সমান সমান হবে, সে থাকবে আরাফে।

সিরাত

১. সিরাত তথা পুলসিরাত সত্য এবং তা কোনো কাল্পনিক পুল নয়, বরং তা একটি বাস্তবিক পুল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

> তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। এটা (এমন বিষয়, যা) আপনার রবের জিম্মায় অবধারিত। যার ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে।[১৯১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.
>
> এরপর জাহান্নামের ওপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল পার হবে, আমি ও আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসুলগণ ব্যতীত আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসুলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন)।[১৯২]

২. সিরাত হলো জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা দীর্ঘ সেতু। যা চুলের চেয়েও সরু হবে এবং তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো হবে। যার যার আমল অনুযায়ী মানুষ তা পার হবে। আমলভেদে সিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রে চলার গতিতেও তারতম্য হবে। আর তা হবে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থাসমূহের অন্যতম একটি অবস্থা।

৩. শুধু মুমিনদেরকেই সিরাত পার হতে হবে। দুনিয়ায় যেসব মূর্তি ও বাতিল উপাস্যের আনুগত্য ও উপাসনা করত কাফের-মুশরিকরা, সেসব উপাস্য ও নেতার সঙ্গে তারা সরাসরি জাহান্নামে চলে যাবে।

৪. দুনিয়ায় যে যেভাবে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলেছে, সে সেভাবে সিরাত পার হয়ে যাবে। মুমিনদের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুদ্‌গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ তাগড়া ঘোড়ার গতিতে,

---

১৯১. সুরা মারইয়াম, ৭১

১৯২. *বুখারি*, ৭৪৩৭

কেউবা উটের গতিতে। এ ক্ষেত্রে কেউ নাজাত পেয়ে যাবে অক্ষত অবস্থায়। আর কেউ হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। কতককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায়। অতঃপর শেষমেশ মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

৫. নবিদের মধ্যে সিরাত প্রথম পার হবেন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উম্মতদের মধ্যে প্রথম পার হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত।

৬. কতক ইমামের মতে সিরাত ও জান্নাতের মধ্যবর্তী আরেকটি পুল থাকবে, সেখানে মুমিনদেরকে পরিষ্কার ও নিষ্কলুষ করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। আবার কতকের মতে ভিন্ন কোনো পুল থাকবে না, বরং সিরাতের শেষ অংশে মুমিনদেরকে আটক করা হবে। তারপর তাদেরকে পরিষ্কার ও নিষ্কলুষ করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

৭. পুণ্যবানরা জাহান্নাম পার হয়ে জান্নাতে যাবে। এজন্য যে, জাহান্নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখার পর যখন তারা জান্নাতে যাবে, তখন জান্নাতের মর্যাদা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলিম ভাইবোনের জন্য সিরাত পার হওয়া সহজ করে দিন। আমিন।

আরাফ সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾

> আর (জান্নাত ও জাহান্নামবাসী) উভয় দলের মাঝে থাকবে একটি প্রাচীর। আর আরাফে (অর্থাৎ সে প্রাচীরের উচ্চতায়) কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেক (দল)-কে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে।[১৯৩]

১. আরাফ বলা হয় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত উঁচু প্রাচীরকে। সেই প্রাচীরের ওপরে কিছু ব্যক্তি থাকবে।

---

১৯৩. সুরা আরাফ, ৪৬

২. যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান সমান হবে, তারা হচ্ছে আরাফবাসী।

৩. আরাফ কোনো স্থায়ী জায়গা নয়, বরং এখানে যারা থাকবে তারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে যাবে।

৪. আরাফ হবে শান্তি ও শাস্তির মাঝামাঝি একটা জায়গা। এখানে না থাকবে জান্নাতের মতো শান্তি, আর না থাকবে জাহান্নামের মতো আজাব। জান্নাতের পাশ থেকে আসবে আরাম আর জাহান্নামের দিক থেকে আসবে আজাব।

৫. আরাফবাসীরা জান্নাতিদের দেখে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেশ করবেন। আর জাহান্নামের আজাব দেখে সেখান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে তাদের পাপ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

হাউজ ও কাউসার সত্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا.
>
> আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, ঘ্রাণ হবে মিশকের চেয়ে সুগন্ধিপূর্ণ আর তার পানপাত্রের পরিমাণ হবে আকাশের তারকার মতো অধিক। যে তা থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।[১৯৪]

১. কেয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকেই থাকবে পিপাসার্ত। তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবিকে একেকটি হাউজ দান করবেন। এ হাউজ থেকে তারা তাদের উম্মতকে পানি পান করাবেন। ফলে আর কখনো তারা পিপাসার্ত হবে না। এগুলোর মধ্যে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজটি হবে সব থেকে বড়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً.

---

১৯৪. *বুখারি*, ৬৫৭৯

প্রত্যেক নবির জন্য একটি করে হাউজ হবে। আর এ নিয়ে তারা পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাউজে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাউজেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক আসবে।[১৯৫]

২. হাউজের পানি পানের পর্ব কখন সংঘটিত হবে এটা নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে, তবে সহিহ মত হলো মিজান ও পুলসিরাতের পূর্বেই হবে।

৩. প্রথমে হাউজের পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের মাথার চুল উশকোখুশকো, পোশাক ধূলিমলিন। যারা ধনীর দুলালিদের বিয়ে করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হতো না।

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের একটি চিহ্ন থাকবে, যা অন্য কোনো নবির উম্মতের থাকবে না। তা ছাড়া অজুর কারণে অজুর অঙ্গগুলোও থাকবে শুভ্রতায় উদ্ভাসিত।

৫. হাউজ কেয়ামতের দিন সৃষ্টি হবে এমন নয়, বরং তা সৃষ্টি হয়েই আছে। বর্তমানেও তা বিদ্যমান রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ.

আল্লাহর কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউজ দেখছি।[১৯৬]

৬. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে যে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, কেয়ামতের দিন সেই মিম্বারকে রাখা হবে হাউজের ওপর।

৭. মুনাফেক, মুরতাদদেরকে সম্পূর্ণরূপে হাউজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং যে-সকল অসৎ ব্যক্তি আমিরদেরকে জুলুম করতে সাহায্য করে তাদেরকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া অন্য গুনাহগার মুমিনদের অবস্থা হবে অপরাধ ও গুনাহের বিবেচনায়। কাউকে একেবারেই তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আবার কাউকে শুরুতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। পরে আবার আসার অনুমতি দেওয়া হবে।

৮. কাউসার ও হাউজ এক নয়। হাউজ থাকবে হাশরের ময়দানে আর কাউসার হলো জান্নাতের ভেতরে থাকা একটি ঝরনা। যার দুটি নালা দিয়ে

---

১৯৫. *তিরমিজি*, ২৪৪৩
১৯৬. *বুখারি*, ১৩৪৪

আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজে পানি প্রবাহিত হতে থাকবে। তার একটি নালা হবে সোনার ও অপরটি রুপার। তবে কতক বর্ণনায় কাউসারকে ব্যবহার করা হয়েছে হাউজের অর্থে।

শাফাআত সত্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

প্রত্যেক নবিকে একটি দোয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তিনি সে দোয়া করে নিয়েছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াকে কেয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য রেখে দিয়েছি।[১৯৭]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

প্রত্যেক নবির জন্য একটি বিশেষ দোয়া আছে যা কবুল হবে। তন্মধ্যে সকলেই তাদের দোয়া পৃথিবীতেই করে নিয়েছে। আর আমার দোয়াটি কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য গোপন রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ কোনোপ্রকার শিরক করেনি, সে ইনশাআল্লাহ আমার এ দোয়া পাবে।[১৯৮]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

---

১৯৭. *বুখারি*, ৬৩০৫
১৯৮. *মুসলিম*, ১৯৯

আমার উম্মতের কবিরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফাআত থাকবে।[১৯৯]

১. শাফাআত অর্থ সুপারিশ ও মধ্যস্থতা। তবে এখানে শাফাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আখেরাতে পাপমুক্তি ও অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা।

২. শাফাআতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

৩. আল্লাহ তাআলা যাকে অনুমতি দেবেন, তিনিই শুধু পারবেন সুপারিশ করতে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও অধিকার নেই সুপারিশ করার।

৪. সুপারিশকারী এবং যার বিষয়ে সুপারিশ করা হবে, উভয়ের প্রতি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

৫. নবি-রাসুল, আলেম, শহিদ, অলি, হাফেজ, সৎ ব্যক্তি, ফেরেশতা এবং যে-সকল মুসলিম বাচ্চা ছোটবেলায় মারা গিয়েছে, তাদের সকলকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। সেইসাথে পবিত্র কুরআন ও রোজাকেও অনুমতি দেওয়া হবে সুপারিশ করার।

৬. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সকল বিষয়ে সুপারিশ করবেন—

ক. 'বড় সুপারিশ', অর্থাৎ বিচারকার্য শুরু করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করা। কেয়ামতের দিন মানুষেরা বিভিন্ন নবি-রাসুলের নিকট গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাবে। তিনি তখন মানুষের বিচারকার্য শেষ করে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার নিকট গোটা মানবজাতির জন্যই শাফাআত করবেন।

খ. হিসাব সহজ করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ।

গ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেবের আজাবকে সহজ করার জন্য সুপারিশ করবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুপারিশটা তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথেই খাস। এ ছাড়া আর কোনো কাফেরের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না।

ঘ. কতক মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করবেন।

---

১৯৯. *আবু দাউদ*, ৪৭৩৯

ঙ. বদ আমল বেশি হওয়ার কারণে যে-সকল মুমিন জাহান্নামি সাব্যস্ত হবে, তাদের কতককে জাহান্নামে না পাঠানো এবং ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করবেন।

চ. কতক মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুপারিশ করবেন।

ছ. আরাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে যারা অবস্থান করবে, তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন।

জ. জান্নাতে কতক মুমিনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেন।

৭. সুপারিশ একমাত্র ঈমানদারদের জন্য করা হবে, কেননা তারাই মাফ ও ক্ষমার উপযুক্ত। কোনো কাফের, মুশরিক বা ঈমানের সাথে যে মৃত্যুবরণ করেনি, তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে না।

জান্নাত

১. জান্নাত সত্য এবং তার ওপর ঈমান আনা ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا - وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا - وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

> আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের দাখিল করব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবহমান বিভিন্ন নহর, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন খোদ আল্লাহ। আল্লাহর চেয়ে কথায় আর কে অধিক সত্যবাদী?[২০০]

২. জান্নাতে মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমনসব নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কারও কল্পনাতেও কখনো আসেনি।

৩. জান্নাত কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং জান্নাত ও তার নেয়ামত সৃষ্ট ও অস্তিত্বশীলরূপে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে। থাকবে অনন্তকাল অবধি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

২০০. সুরা নিসা, ১২২

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ও জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও জমিনের (প্রশস্ততার ন্যায়)। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।[২০১]

৪. জান্নাতের আয়তলোচনা হুরগণও কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না।

৫. জান্নাতের যে-সকল নেয়ামতের কথা কুরআন ও মুতাওয়াতিরক্রমে প্রমাণিত, তার ওপর পূর্ণ ঈমান আনতে হবে। মনে রাখতে হবে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো একটি নেয়ামতকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

৬. দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে জান্নাতে গিয়ে প্রতিজন জান্নাতি তা লাভ করে ধন্য হবেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎই হবে জান্নাতের সব থেকে বড় ও উত্তম নেয়ামত।

৭. জান্নাতিরা কেয়ামত ও হিসাবনিকাশের পরই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেয়ামতের পূর্বে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, হজরত আদম ও হাওয়া আ. দুনিয়াতে আসার পূর্বে জান্নাতে ছিলেন।

৮. কেউ যদি কোনোভাবে একবার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে সে আর কখনোই জান্নাত থেকে বের হবে না।

৯. জান্নাতে একমাত্র ঈমানদাররাই প্রবেশ করতে পারবে। কোনো কাফের-মুশরিক কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। উপরন্তু জান্নাত তাদের জন্য হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

আল্লাহর সঙ্গে যে শরিক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[২০২]

---

২০১. সুরা আলে-ইমরান, ১৩৩

২০২. সুরা মায়েদা, ৭২

১০. কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর একটা সময় জান্নাতের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, বরং তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ জান্নাতের সুখ ও নেয়ামত চিরস্থায়ী ও অনন্ত। কখনো তা শেষ ও বিলুপ্ত হবে না। সেইসাথে জান্নাতিরা জান্নাতে থাকবে অনন্তকাল।

১১.জান্নাতিরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তারা সেখানে যা চাইবে, তা-ই পাবে। হুর, গেলমান ও খাদেম থাকবে সেখানে তাদের জন্য।

১২. আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহক্রমেই জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। মনে রাখতে হবে, কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক বা অপরিহার্য নয়।

১৩. আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সকল ব্যক্তিকে জান্নাতি বলেছেন, তারা নিশ্চিত জান্নাতি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৪. মুশরিকদের শিশুসন্তানদের বিষয়ে আটটি মত—

ক. তারা জান্নাতি।

খ. তারা জাহান্নামি।

গ. তারা জান্নাতিদের খাদেম হিসাবে থাকবে।

ঘ. আহলে ফাততার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মতো তাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে, সঠিক জবাব দিলে জান্নাতি আর ভুল জবাব দিলে জাহান্নামি।

ঙ. তারা মাটি হয়ে যাবে।

চ. তারা আল্লাহর ইচ্ছায় থাকবে।

ছ. তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি বরজখে থাকবে।

জ. তাদের বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম।

অধিকাংশ আলেমের মতে তারা জান্নাতি। তবে কেউ কেউ তাদের বিষয়ে চুপ থাকাকে উত্তম বলেছেন। তবে দুনিয়াতে তারা তাদের বাবার হুকুমে থাকবে। ফলে মৃত্যুর পর তাদের জানাজা ও গোসল দেওয়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। তবে আখেরাতের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যস্ত করা হবে। কেননা মুশরিকদের শিশুসন্তানদের

সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

আল্লাহ তাদের সৃষ্টিলগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।[২০৩]

ইমাম নববি রহ. বলেন,

أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم ، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة ، والثاني في النار والثالث لا يجزم فيهم بشيئ .

দুনিয়াতে কাফেরের শিশুসন্তানরা তাদের বাবার হুকুমে থাকবে। তবে বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আখেরাতে তাদের বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে, এক. সহিহ মত হচ্ছে তারা জান্নাতি। দুই. তারা জাহান্নামি। তিন. দৃঢ়তার সাথে তাদের বিষয়ে কোনো ফায়সালা না দেওয়া।[২০৪]

জাহান্নাম

১. জান্নাতের মতো জাহান্নামও সত্য এবং তার ওপর ঈমান আনা ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করাবেন জাহান্নামে, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[২০৫]

---

২০৩. *বুখারি*, ১৩৮৩
২০৪. *শারহু মুসলিম*, ১২/৭৫
২০৫. সুরা নিসা, ১৪

২. পাপীদেরকে আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, শৃঙ্খল প্রভৃতি নানান শাস্তির উপকরণ দ্বারা আজাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোজখ।

৩. জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্ট এবং অস্তিত্বশীলরূপে বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। জাহান্নাম কোনো কাল্পনিক জায়গা বা বিষয় নয়। জাহান্নামকে যদি কেউ কাল্পনিক মনে করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

আর তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। কাফেরদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।[২০৬]

৪. জাহান্নামিরা কেয়ামতের পরই জাহান্নামে যাবে। এর পূর্বে তারা আলমে বরজখে আজাব ভোগ করতে থাকাবে।

৫. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। তবে গুনাহগার মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সে শাস্তি ভোগের পর একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬. কবিরা গুনাহকারীগণ তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে না। পরিমাণমতো শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে পাপ মোচন কিংবা পাপ মোচন হওয়ার পূর্বেই একসময় নবির সুপারিশক্রমে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৭. ইহুদিদের এই ধারণা স্পষ্ট ভুল যে, তারা অল্প সময় জাহান্নামে থাকবে।

৮. ঈমানদাররা জাহান্নামে গেলেও একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ যদি একবার জান্নাতে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে আর কখনো জান্নাত থেকে বের করা হবে না এবং জাহান্নামেও আর কখনো পাঠানো হবে না।

৯. জাহান্নামের যে-সকল আজাব ও শাস্তির কথা কুরআন ও মুতাওয়াতিরক্রমে প্রমাণিত, তার ওপর পূর্ণ ঈমান আনতে হবে। অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো একটি আজাব ও শাস্তিকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

---

২০৬. সুরা বাকারা, ২৪

১০. কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশের পর একটা সময় জাহান্নামের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, বরং তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ জাহান্নামের আজাব ও শাস্তি চিরস্থায়ী ও অনন্ত। কখনো তা শেষ ও বিলুপ্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾

কিতাবি ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে যাবে, সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। তারাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব।[২০৭]

১১.আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সকল ব্যক্তিকে জাহান্নামি বলেছেন, তারা নিশ্চিত জাহান্নামি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১২. দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ।

১৩. জাহান্নামের সর্বোপেক্ষা লঘু আজাব হলো, দুপায়ের তলায় দুটি প্রজ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে, যার উত্তাপে মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

❋❋❋

---

২০৭. সুরা বাইয়িনা, ৬

তাকদির সম্পর্কে আকিদা

১. তাকদির সত্য। তাকদিরের ওপর বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। এর ওপর বিশ্বাস ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য স্থির করে রেখেছেন একটা পরিমাণ।[২০৮]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি মাপজোকের সাথে।[২০৯]

হজরত জিবরিল আ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পর তিনি বলেন,

قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ."

তিনি বললেন, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ এবং শেষ দিবসের ওপর। **আর বিশ্বাস রাখবেন তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর।**[২১০]

২. তাকদির (تقدير) ও কাজা (قضاء)

আভিধানিকভাবে তাকদির হলো, কোনো জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

---

২০৮. সুরা তালাক, ৩
২০৯. সুরা কামার, ৪৯
২১০. *মুসলিম*, ৮

পারিভাষিকভাবে 'তাকদির' বলা হয় আল্লাহ তাআলার ইলমকে। অর্থাৎ তিনি সকল মাখলুক তথা সৃষ্টির ভালো-মন্দ, উপকার-ক্ষতি, গুণ, ধরন, প্রকৃতি, সময়, স্থান, মোটকথা যাবতীয় সকলকিছু সম্পর্কে পূর্ব থেকে পূর্ণ জ্ঞাত। তাঁর পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু লাওহে মাহফুজে বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

কাজা (قضاء)-এর আভিধানিক অর্থ দুটি—

ক. সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾

তারপর তিনি তাকে দুই দিনে সাত আসমানে পরিণত করলেন।[২১১]

খ. আদেশ ও ফয়সালা করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারও ইবাদত করবে না।[২১২]

কাজার পারিভাষিক অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার ইলমে পূর্ব থেকেই সকলকিছুর যে নকশা ও পরিমাপ ছিল, সে অনুযায়ী সকলকিছুকে সৃষ্টি করা। অবশ্য কতক ইমাম তাকদির ও কাজা শব্দ দুটির মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য না করে একটিকে অপরটির সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহার করেন।

৩. তাকদির হলো অদৃশ্য বিষয় এবং আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাকদির বিষয়ে তিনি কাউকে অবগত করেননি, না কোনো ফেরেশতাকে আর না কোনো নবি-রাসুলকে। কাজেই বান্দার জন্যও উচিত হচ্ছে কোনোপ্রকার প্রশ্ন ছাড়াই তা মেনে নেওয়া।

৪. আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ইচ্ছামাফিক কোনোকিছু করা বা না করার একটা ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, এ ক্ষমতাকেই কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'কাসব' তথা উপার্জন। আল্লাহ প্রদত্ত ইখতেয়ার বা ইচ্ছা ও নির্বাচনশক্তি দ্বারা সে যা-কিছু করবে, এর ভিত্তিতে সে নন্দিত বা নিন্দিত এবং পুরস্কার বা তিরস্কারযোগ্য হবে। সুতরাং মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা

---

২১১. সুরা হা-মিম সাজদা, ১২
২১২. সুরা বনি ইসরাইল, ২৩

হলেও এর উপার্জনকারী স্বয়ং মানুষ। পুরস্কার বা তিরস্কার কখনো সৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে হয় না, বরং বান্দা নিজ ইখতেয়ারে যা-কিছু উপার্জন করে, তার ভিত্তিতে হয়।

৫. সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইলম, কাজা, ইচ্ছা ও তাকদির অনুযায়ী হয়।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার ইলম তথা জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়াতে যা-কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই পূর্ণ অবগত।

আল্লাহ তাআলার কাজা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দার সকল কর্মের স্রষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। চাই কাজটি ভালো হোক বা মন্দ। বান্দা যখন নিজ ইখতেয়ারে ভালো বা মন্দ কিছু করার ইচ্ছা করে, তিনি তখন সে কাজটি হওয়ার ফয়সালা দিয়ে দেন।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা যখন নিজ ইখতেয়ারে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহও ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ জিনিসটা কখন অস্তিত্বে আসবে এবং কখন চলে যাবে, কোথায় কখন কী হবে এবং কীভাবে হবে, কতক্ষণ যাবৎ থাকবে এবং তার আকার ও পরিমাপ কতটুকু হবে, এ সবকিছু তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়।

তাকদির অনুযায়ী হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা কখন কী করবে, তা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই পূর্ণ অবগত এবং তাঁর অবগতি অনুযায়ী সবকিছু লিপিবদ্ধ। আর সবকিছু সে অনুযায়ী হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

৬. আসমান জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলার ইলম অনুযায়ী সকলকিছুর তাকদির লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।

৭. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন ও যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। তাঁর হেদায়েত দান করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দার অন্তরে হেদায়েত গ্রহণের অবস্থা তৈরি করে দেওয়া।

এটা আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় তাঁর জ্ঞান মুয়াফিক। যেমন তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বেই জানেন হজরত আবু বকর রা. নিজ ইচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করবেন। তখন তিনি ইচ্ছা করলেন আবু বকর মুমিন হোক, ফলে তিনি তাঁর মাঝে ঈমান গ্রহণের অবস্থা তৈরি করে দিলেন। অনুরূপ তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বেই জানেন আবু জাহেল নিজ

ইচ্ছায় কুফর গ্রহণ করবে। তখন তিনি ইচ্ছা করলেন, সে কাফের হোক, ফলে তিনি তার মাঝে কুফর গ্রহণের অবস্থা তৈরি করে দিলেন।

তিনি ঈমান-কুফর, ভালো-মন্দ সকলকিছুর স্রষ্টা ঠিক, কিন্তু তিনি কোনো অবস্থা বান্দার ওপর চাপিয়ে দেন না। বরং বান্দা যখন নিজ ইচ্ছায় কিছু করার ইচ্ছা করে, তখন তিনিও সেটার ইচ্ছা করেন এবং তা অস্তিত্বে আসার ফয়সালা করে দেন।

৮. তাকদিরের কারণে মানুষ বাধ্য হয় না, কারণ ইচ্ছা ও নির্বাচনশক্তি মানুষের কাছেই থাকে। প্রতিটি মানুষ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করতে পারে, আবার ছাড়তেও পারে।

৯. আল্লাহ তাআলা, ঈমান, কুফর, আনুগত্য, নাফরমানি, ভালো-মন্দ সকলকিছুর স্রষ্টা। কারণ মন্দ না থাকলে ভালোটা চেনা যায় না। যেমন কুফর না থাকলে মানুষ জানতই না যে, ঈমান কী। অনুরূপ অসৎকাজ না থাকলেও মানুষ জানত না যে, কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ। তখন জাহান্নাম বানানোটাই অনর্থক সাব্যস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ﴾

আপনি বলে দিন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।[২১৩]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ – وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ﴾

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।[২১৪]

১০. ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও আদবের কারণে মন্দকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় না। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰى بِجَانِبِهِ – وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾

---

২১৩. সুরা নিসা, ৮৭
২১৪. সুরা জুমার, ৬২

> আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে উপেক্ষা করে ও পাশ কাটিয়ে চলে যায়, আর যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে।[২১৫]

উল্লিখিত আয়াতে তিনি নেয়ামত দান করাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করলেও অনিষ্টকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করেননি।

১১.যখন কোনো কাজ মানুষের মন, মেজাজ ও চাহিদা অনুযায়ী হয়, তখন বলা হয় এটা উত্তম। অনুরূপ যখন কোনো কাজ মানুষের মন, মেজাজ ও চাহিদার বিপরীত হয়, তখন বলা হয় এটা অনুত্তম। অথচ আল্লাহ তাআলার সকল কর্ম নিজ বিবেচনায় উত্তমই উত্তম, কারণ তাঁর কোনো কর্মই হিকমতমুক্ত নয়।

১২. যদি কখনো নিজ চাহিদা ও পছন্দের বিপরীত কিছু ঘটে বা কোনো অবস্থা চলে আসে, তখন অস্থির ও পেরেশান না হওয়া; বরং বলা, আল্লাহ তাআলা আমার মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমার জন্য এ ফয়সালা করেছেন। সুতরাং তাঁর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা আমার জন্য ওয়াজিব আর এটাই তাকদিরের দাবি।

১৩. বান্দা তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলো জানবে। তারপর ভালো কাজ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে এবং মাধ্যম গ্রহণের মাধ্যমে নিজ চেষ্টাকে অব্যাহত রাখবে।

১৪. কোনো অপরাধের দায় থেকে বাঁচার জন্য তাকদিরকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো জায়েজ হবে না।

১৫. আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এক নয়। সকলকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয়, কিন্তু এমন নয় যে, সকলকিছুতেই তাঁর সন্তুষ্টি থাকে। যেমন কাফেরের কুফর গ্রহণ করা, অপরাধীর অপরাধ করা; এগুলো সবই তাঁর ইচ্ছায় হয় বটে, কিন্তু এতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না।

১৬. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বিবেচিত হয় জীবনের শেষ মুহূর্তের বিবেচনায়, তাৎক্ষণিক অবস্থার বিবেচনায় নয়। তিনি যার প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, কখনো অসন্তুষ্ট হন না। তিনি যার প্রতি অসন্তুষ্ট,

---

২১৫. সুরা বনি ইসরাইল, ৮৩

সর্বদা তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন, কখনো সন্তুষ্ট হন না। তিনি শুরু থেকেই ফেরাউনের জাদুকরদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও শুরুতে তারা কুফরের হালতে ছিল। কেননা তিনি জানেন তারা পরে ঈমান আনবে। অনুরূপ হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা.-এর ওপর তিনি শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও পূর্বে তারা কুফরের হালতে ছিল। ইবলিশের ওপর তিনি শুরু থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও সে পূর্বে তাঁর ইবাদত করত, কেননা তিনি জানেন সর্বশেষ ইবলিশ তাঁর অবাধ্য হবে।

১৭. আল্লাহ তাআলা দুর্বল মনোবলকে অপছন্দ করেন। সুতরাং প্রতিটি কাজকে জরুরি মনে করা এবং নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করা। পরবর্তী সময়ে কাজটি হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা। আর না হলে, তাকদিরের কাছে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি গ্রহণ করা এবং বিষণ্ন না হওয়া।

১৮. তাকদির কি পরিবর্তন হয়? তাকদিরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—

ক. আত-তাকদিরুল মুবরাম (التقدير المبرم)

'আত-তাকদিরুল মুবরাম' বলা হয় চূড়ান্ত তাকদিরকে। অর্থাৎ যাতে আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না।

কতক ইমামের মতে তাকদির হলো মুবরাম। অর্থাৎ তাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। কারণ তাকদিরের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার ইলম তথা জ্ঞানের সাথে, আর তাঁর জ্ঞান অনুযায়ীই তাকদির লিপিবদ্ধ। কাজেই তাকদির পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের মাঝে পরিবর্তন হওয়া।

খ. আত-তাকদিরুল মুআল্লাক (التقدير المعلق)

'আত-তাকদিরুল মুআল্লাক' বলা হয়, কোনো একটা শর্তের সাথে কোনো ফলাফল যুক্ত থাকা। শর্তটি পাওয়া গেলে ফলাফলও পাওয়া যাবে।

কতক ইমামের মতে তাকদির হলো মুআল্লাক, তথা যার মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়। তাদের এ মতের ভিত্তি হলো, বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, সদকা বিপদ দূর করে। দোয়া ভাগ্য পরিবর্তন করে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে হায়াত বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। এ সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে তারা বলেন, তাকদির পরিবর্তন হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই পরিবর্তনের

সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে নয়, বরং বান্দার সাথে। কারণ সর্বশেষ বান্দা কী করবে তা তিনি পূর্ব থেকেই পূর্ণ অবগত।

যেমন এক ব্যক্তি ২৫ বছর কাফের ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। এখানে আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইলমে পরিবর্তন হয়নি। কেননা তিনি পূর্ব থেকেই জানেন, অমুক ব্যক্তি ২৫ বছর কাফের থাকবে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করবে।

১৯. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত কাদারিয়াদের মতো এটাও বলে না যে, 'বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কোনো জ্ঞান নেই, বরং বান্দা যখন কোনো কাজ করে, তখন তিনি তা জানেন এবং বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা।' অনুরূপ জাবরিয়াদের মতো এটাও বলেন না যে, 'সকল কর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, বান্দা তাঁর সে সৃষ্টি ও ফয়সালা অনুযায়ী কর্মে বাধ্য।' বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বক্তব্য হচ্ছে, নিশ্চয় মানুষ উপার্জনকারী এবং সে নিজ ইচ্ছামাফিক যেকোনো কাজ করা বা না করার ক্ষমতা রাখে। তবে মানুষ তাঁর কর্মের স্রষ্টা নয় এবং সে তা করতে বাধ্যও নয়।

২০. খাদ্য চাই হালাল হোক বা হারাম, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট তা রিজিক। কাজেই বান্দার রিজিকে যা আছে, সে তা পূর্ণ করেই দুনিয়া থেকে যাবে। পক্ষান্তরে হারাম খাদ্যকে মুতাজিলারা রিজিক বলে না।

২১. তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করে ঈমান-আমল ছেড়ে দেওয়া ঠিক না। যেমন কেউ বলল, আমার তাকদিরে যা আছে তা-ই হবে, তাহলে আমল করে কী লাভ? এ জাতীয় ধারণা বা কথা মোটেও ঠিক নয়। কেননা মানুষ জানে না তার তাকদিরে কী আছে। সুতরাং তার ওপর আবশ্যক হলো, ভালো ও শরিয়তের নির্দেশিত কাজ করা এবং খারাপ ও শরিয়তবহির্ভূত কাজ বর্জন করা।

২২. হত্যাকৃত ব্যক্তি তাঁর নির্ধারিত সময়েই মারা যায়। এমন নয় যে, তার আয়ু আরও ছিল কিন্তু হত্যার কারণে সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মারা গেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন, কে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে আর কে সুস্থ অবস্থায়ই হঠাৎ মারা যাবে। তিনি এও জানেন, কাকে হত্যা করে মারা হবে আর কে দুর্ঘটনায় মারা যাবে। তাঁর ইলম অনুযায়ী সকলের সময় নির্ধারিত এবং সে অনুযায়ী সবকিছু ঘটে।

২৩. তাকদির নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাকদির নিয়ে বিতর্ক করবে, সে কেয়ামতের দিন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তাকদির হলো এমন একটি জটিল ও রহস্যময় বিষয়, যার প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করা মানবমেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করাও নিষেধ।

তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসের কিছু উপকারিতা

১. ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। কেননা তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ঈমান শুদ্ধ না।

২. আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন হয়।

৩. যত বড় বিপদ ও মুসিবতই আসুক না কেন, খুব সহজেই সবর ও মেনে নেওয়া সম্ভব হয়।

৪. হালাল পন্থা ও হালাল উপার্জন গ্রহণ করা সহজ হয়। হারাম পন্থা ও হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা সম্ভব ও সহজ হয়। কারণ পূর্ণ বিশ্বাস হলো, তাকদিরে যা আছে, তা আসবেই। আর তাকদিরে যা নেই, তা কখনো আসবে না। কাজেই হারাম পন্থা ও হারাম উপার্জন গ্রহণ করে কোনো লাভ নেই।

৫. নিজেকে নিয়ে অহংকার করবে না। কারণ আজ যে সম্পদ ও নেয়ামত আছে, তা কাল থাকবে কি না, এটা কেউ জানে না। কীসের ওপর তবে অহংকার!

৬. দুনিয়াতে চলার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, তা জমা করা হবে ঠিক, কিন্তু তার ওপর কখনো ভরসা করবে না, বরং ভরসা করবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর।

❋❋❋

কলম, লাওহে মাহফুজ, আরশ, কুরসি, রুহ সত্য

কলম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿نٓ ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ﴾

নুন। কসম কলমের এবং যা-কিছু তারা লেখে তার।[২১৬]

কলমের অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনা জরুরি। কলম দেহবিশিষ্ট এবং তার একটি আকার ও ধরন রয়েছে। কলমকে সৃষ্টির পর আদেশ দেওয়া হয় কেয়ামত পর্যন্ত আসা সকলকিছুর তাকদির লিপিবদ্ধ করার।

কলমকে আল্লাহ তাআলা নিজ প্রয়োজনে বা নিজ জ্ঞানকে স্মরণ ও মুখস্থ রাখার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন এটা বোঝানোর জন্য যে, তাঁর জ্ঞান সকলকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

অধিকাংশ ইমামের মতে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আরশ। ইমাম ইবনে জারির, ইমাম জাওজিসহ কতকের মত হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম। উভয়ের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হয় যে, মুতলাকভাবে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আরশ আর বিশ্বজগতের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম।

লাওহে মাহফুজ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ﴾

লাওহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ)।[২১৭]

লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকের অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনা জরুরি। লাওহে মাহফুজ দেহবিশিষ্ট এবং তার একটি আকার ও ধরন রয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কলম কেয়ামত পর্যন্ত আসা সকলকিছুর তাকদির লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছে।

---

২১৬. সুরা কলম, ১

২১৭. সুরা বুরুজ, ২২

আল্লাহ তাআলা ভুলে যাওয়ার ভয়ে আয়ত্ত রাখার জন্য লাওহে মাহফুজকে সৃষ্টি করেননি। লাওহে মাহফুজ কেমন, কোথায় এবং কী দ্বারা তা তৈরি, এসব বিষয়ে অকাট্য কোনো দলিল পাওয়া যায় না। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, লাওহে মাহফুজ সত্য এবং তাতে সবকিছুর তাকদির লিপিবদ্ধ। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.

আমরা ঈমান রাখি লাওহে মাহফুজ এবং কলমের প্রতি। আর (ঈমান রাখি) ওই সকল জিনিসের প্রতি, যা (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২১৮]

একে লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলক বলা হয় কয়েকটি কারণে—

ক. তা সৃষ্টির হস্ত থেকে সংরক্ষিত।

খ. তাতে সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইলম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ। সুতরাং তাঁর ইলমের মাঝে যেমন কোনো পরিবর্তন হয় না, তেমনই লাওহে মাহফুজও সকল পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত।

আরশ

আরশের অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনা জরুরি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾

(তিনি) আরশের অধিপতি, মহামর্যাদাশীল।[২১৯]

আরশ আল্লাহ তাআলার একটি মাখলুক বা সৃষ্টি। আরশ দেহবিশিষ্ট এবং তার একটি আকার ও ধরন রয়েছে। আসমান জমিন সৃষ্টির বহু পূর্বে আরশকে সৃষ্টি করা হয়। ইমাম জাইনুদ্দিন রাজি রহ. বলেন,

والعرش ليس له مكان وقرار، فمن قال: إن العرش له مكان وقرار فهو كذب وافترى، فلو كان له إليه فقبله أين كان، تعالى الله عز وجل علوا

---

২১৮. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৮

২১৯. সুরা বুরুজ, ১৫

كبيرا ، والله تعالى ليس على مكان ولا في مكان ولا في الجهات ولا في الزمان ، بل كان ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان.

আরশ আল্লাহ তাআলার স্থান ও অবস্থানের জায়গা নয়। সুতরাং কেউ যদি বলে, নিশ্চয় আরশ তাঁর স্থান ও অবস্থানের জায়গা, তাহলে সে মিথ্যা বলল এবং মিথ্যা অপবাদ দিলো। কেননা তিনি যদি (আরশের) মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে (প্রশ্ন আসবে, আরশ সৃষ্টির পূর্বে) তিনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ তাআলা এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো স্থানের ওপরে বা মাঝে নেই এবং নেই তিনি বিভিন্ন দিকে। তিনি কোনো সময়ে আবদ্ধ নন, বরং তিনি তখনও ছিলেন, যখন ছিল না কোনো স্থান ও সময় আর তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[২২০]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ليس العرش بموضع استقرار الله ، تبارك الله وتعالى عن مشابهة خلقه.

আরশ আল্লাহ তাআলার অবস্থান বা ওঠার স্থান নয়। সৃষ্টির সাদৃশ্য হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র।[২২১]

কুরসি

কুরসির অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনা জরুরি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

তাঁর কুরসি (সমগ্র) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।[২২২]

কুরসি দেহবিশিষ্ট এবং তার একটি আকার ও ধরন রয়েছে। আরশ ও কুরসি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তবে তিনি নিজ প্রয়োজনে তা সৃষ্টি করেননি, কেননা তিনি বিশ্বজগতের সকলকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

والعرش والكرسي حق.

আরশ ও কুরসি সত্য।[২২৩]

---

২২০. *শারহু বাদয়িল আমালি*, ২০১
২২১. *ফাতহুল বারি*, ৭/১৪৮
২২২. সুরা বাকারা, ২৫৫
২২৩. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৯

রুহ

রুহ বা আত্মার অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক এবং তা আল্লাহ তাআলার একটি সৃষ্টি। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপের বিষয়টি তাঁর নিকট সোপর্দ করতে হবে। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ - قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

(হে নবি!) তারা আপনাকে রুহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিন, রুহ আমার রবের আদেশঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্যমাত্র।[২২৪]

❋❋❋

---

২২৪. সুরা বনি ইসরাইল, ৮৫

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত আকিদা ইসলামের মৌলিক ছয় আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন ও হাদিসে তাদের শান ও মান সম্পর্কে আয়াত ও হাদিস বিদ্যমান। কেউ তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন আবার কেউ ছাড়াছাড়ি। এজন্য আকিদার কিতাবে তাদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, যেন তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন না হয় এবং সকলে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে একটি সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা ও আকিদা পোষণ করতে পারে।

১. সাহাবি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি ঈমান অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

২. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا - ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে ও নিষ্ঠার সাথে যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেটাই মহাসাফল্য।[২২৫]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ - وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ - وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا - ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

---

২২৫. সুরা তাওবা, ১০০

কিন্তু রাসুল ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তারা সবাই নিজেদের জানমাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ ও তারাই কৃতকার্য। আল্লাহ তাদের জন্য এমনসব উদ্যান তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেটাই মহাসাফল্য।[২২৬]

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

তোমরা আমার সাহাবিগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।[২২৭]

৩. মুহাজির বলা হয় এমন সাহাবিকে, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করেছেন। আর আনসার বলা হয় পবিত্র মদিনাতে বসবাসকারী সাহাবিদের, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাজির সাহাবিদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজেদের জানমাল দ্বারা সাহায্য করেছেন।

৪. সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসা দ্বীন ও ঈমানের অংশ। তাদের গালমন্দ করা বা তাদের প্রতি মন্দ ধারণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা নেফাক, গোমরাহি ও কুফর। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণকে ভালোবাসি। তাদের কারও প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা বাড়াবাড়ি যেমন করি না, তেমনই তাদের কারও সঙ্গে

২২৬. সুরা তাওবা, ৮৮-৮৯
২২৭. *বুখারি*, ৩৬৭৩

সম্পর্কহীনতার দাবিও করি না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে স্মরণ করে, আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি। তাদের ভালোবাসা হচ্ছে দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর, নেফাক ও সীমালঙ্ঘন।[২২৮]

ইবনে আবিদিন শামি ইমাম মোল্লা আলি কারি রহ. থেকে নকল করেন,

أما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع ، إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة ، أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع.

আর কেউ যদি কোনো সাহাবিকে গালি দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে ফাসেক ও বিদআতি। তবে কেউ যদি গালি দেওয়াকে বৈধ ও সওয়াবের কাজ মনে করে, যেমনটা কতক শিয়াদের বিশ্বাস অথবা সাহাবিরা কুফর করেছেন এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের।[২২৯]

৫. সৃষ্টিজগতের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর অন্য নবি-রাসুলগণ। আদমসন্তানের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, হজরত আবু বকর, তারপর হজরত উমর, তারপর হজরত উসমান, তারপর হজরত আলি রা.।

সুয়ুতি রহ. আবু মানসুর বাগদাদি থেকে উল্লেখ করেন,

أجمع أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.

আহলে সুন্নাত একমত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলি রা.।[২৩০]

---

২২৮. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ২৯
২২৯. *মাজমুআতু রাসায়িলি ইবনে আবিদিন*, ১/৩৬৭
২৩০. *তারিখুল খুলাফা*, ১২১

৬. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন হজরত আবু বকর রা.। তারপর যথাক্রমে হজরত উমর, উসমান ও আলি রা.। এরপর আশারায়ে মুবাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির অবশিষ্ট ছয়জন। তারা হলেন যথাক্রমে, ১. হজরত তালহা, ২. জুবায়ের, ৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ৪. সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ৫. সাইদ ইবনে যায়েদ ৬. আবু উবাইদা ইবনে জাররা রা.। তারপর যথাক্রমে বদর ও উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণ। তারপর বাইয়াতুর রিদওয়ানে শরিক হওয়া সাহাবিগণ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।

৭. সকল সাহাবি ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকি ও পরহেজগার ছিলেন। তারা সর্বদা সবকিছুর ওপর ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে গেছেন।

৮. সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সমস্ত অলি-আউলিয়ার ঊর্ধ্বে। কেয়ামতের আগ পর্যন্ত উম্মতের সবচেয়ে বড় কোনো অলি একজন নিম্নস্তরের সাহাবির মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। যেমন কোনো অলি বা সাহাবি একজন নবির স্তরে পৌঁছতে পারবে না।

৯. নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ তাআলা যেমন বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছেন, তেমনই সাহাবিয়াতের মর্যাদার জন্যও তিনি উম্মতের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছেন।

১০. সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সকলে জান্নাতি। আশারায়ে মুবাশশারা বা ১০ জন সাহাবিকে জান্নাতি বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক মজলিসে ১০ জনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে হাজাম থেকে নকল করেন,

وقال أبو محمد بن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا؛ قال الله تعالى : لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ - أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا - وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ . وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ . فثبت أن الجميع من

أهل الجنة ، وأنه لا يدخل أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة.

ইবনে হাজাম বলেন, অবশ্যই সকল সাহাবি জান্নাতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, তারা (ও পরবর্তীরা) সমান নয়। এরূপ লোকেরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরবর্তী সময়ে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে। আর প্রত্যেককে (অর্থাৎ প্রত্যেক সাহাবিকে) আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[২৩১]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, যাদের জন্য পূর্ব থেকে আমার পক্ষ হতে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে।[২৩২]

এ থেকে সাব্যস্ত হয় সকল সাহাবি জান্নাতি। একজন সাহাবিও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, কেননা উল্লিখিত আয়াতে সাহাবিদের সম্বোধন করা হয়েছে।[২৩৩]

১১.সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার ইখতেলাফ হক-বাতিলের ইখতেলাফ নয়, বরং ভুল ও সঠিকের ইখতেলাফ।

১২. যেসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিমত ও বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, বিশ্বাস করতে হবে যে, সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবি হকের ওপর ছিলেন। কারণ তারা কেউ হিংসা-বিদ্বেষ বা ব্যক্তিস্বার্থে কোনো বিরোধে জড়াননি, বরং যা-কিছু করেছেন, ইখলাসের সাথে দ্বীনের জন্যই করেছেন। কাজেই তাদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মানবীয় দোষ-গুণের জায়গা থেকে কোনো পক্ষের হয়তো ভুল হতে পারে, তবে সেটা হলো ইজতেহাদি ভুল।

১৩. উম্মতের কারও জন্য কোনো সাহাবির ইজতেহাদি কোনো ভুল নিয়ে সমালোচনা করার কোনো অধিকার নেই।

---

২৩১. সুরা হাদিদ, ১০
২৩২. সুরা আম্বিয়া, ১০১
২৩৩. *আল-ইসাবা*, ১/১৬৩

১৪. সাহাবায়ে কেরাম 'মাসুম আনিল খাতা' (معصوم عن الخطأ) তথা ভুল থেকে নিষ্পাপ নন, বরং তারা 'মাহফুজ আনিল খাতা' (محفوظ عن الخطأ) তথা ভুল থেকে নিরাপদ ছিলেন।

ব্যাখ্যা : নবি-রাসুলগণ 'মাসুম আনিল খাতা' ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই কোনো নবি থেকে কোনোরূপ গুনাহ হতে দেননি। আর 'মাহফুজ আনিল খাতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাহাবিদের ভুল ও গুনাহ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ভুল ও গুনাহ সাহাবির আমলনামায় রাখেননি, বরং তিনি সকল সাহাবির প্রতি সন্তুষ্ট।

১৫. কোনো ব্যক্তি যদি হজরত আবু বকর রা.-এর সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে, বা আলি রা.-কেই শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ এবং খেলাফতের উপযুক্ত বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তিনিই মূলত ওহির উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু জিবরিল আ. ভুল করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহি নিয়ে গেছেন। অথবা কেউ যদি হজরত আয়েশা রা.-এর ওপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে সত্য বলে মনে করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

১৬. সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতকে ভালোবাসা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার আলামত। অনুরূপ কোনো সাহাবি ও আহলে বাইতের ওপর বিদ্বেষ রাখা কিংবা উভয়ের কাউকে ভালোবাসা ও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ রাখা প্রকারান্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিদ্বেষ রাখারই আলামত। বলাবাহুল্য, তা স্পষ্ট গোমরাহি।

১৭. আহলে বাইত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রী, তাঁর নিকটাত্মীয় ও সন্তানসন্ততি। তাঁর তিন ছেলে তথা ক. হজরত কাসিম, খ. আবদুল্লাহ, গ. ইবরাহিম রা. এবং চার কন্যা, তথা ক. হজরত যাইনাব, খ. রুকাইয়া, গ. উম্মে কুলসুম, ঘ. ফাতেমা রা.। সেইসাথে হজরত আলি, হজরত হাসান ও হুসাইন, হজরত হামজা, হজরত আব্বাস রা.-ও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

১৮. পুরো উম্মতের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সত্য ও বিশ্বস্ততার মাপকাঠি।

ব্যাখ্যা : যে আকিদা ও আমল সাহাবিদের আকিদা-আমল অনুযায়ী হবে, তা সত্য ও সুন্নত। আর যে আকিদা ও আমল সাহাবিদের আকিদা-আমলের বিপরীত হবে, তা বাতিল ও গোমরাহি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا﴾

আর তারা যদি সেরূপ ঈমান আনে যেরূপ ঈমান এনেছ তোমরা, তবে তারাও হেদায়েত পেয়ে যাবে।[২৩৪]

১৯. হজরত আলি ও হজরত মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার ইখতেলাফে হজরত আলি রা. ছিলেন সঠিকের ওপর এবং তাঁর বিরোধীরা ছিলেন ভুলের ওপর। তবে এটা হচ্ছে ইজতেহাদি ভুল। ইজতেহাদি ভুলের ওপর কোনোরূপ অপবাদ, নিন্দা ও তিরস্কার করা জায়েজ নেই। কেননা ভুল হওয়া সত্ত্বেও ইজতেহাদের জন্য তারা একটি আজর তথা সওয়াব পেয়ে যাবেন।

২০. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অবস্থান হলো, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ইখতেলাফ ও বিবাদের বিষয়ে উম্মত সম্পূর্ণ চুপ থাকবে। বিশেষ কোনো দ্বীনি জরুরত ছাড়া এসব ইখতেলাফ ও বিবাদ নিয়ে আলোচনা করা জায়েজ নেই। ইমাম ইবনে আবদিল বার রহ. বর্ণনা করেন,

سمعت أحمد في ذلك المجلس يقول : لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكل أمرهم إلى الله.

(আনবারি বলেন,) আমি ওই মজলিসে ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক যে ইখতেলাফ ও বিবাদ হয়েছে, আমরা তা নিয়ে বাহাস ও আলোচনা করব না। বরং আমরা তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করব।[২৩৫]

২১. হজরত হুসাইন রা. এবং ইয়াজিদের পারস্পরিক ইখতেলাফ ও বিরোধের বিষয়ে হজরত হুসাইন রা. সত্যের ওপর ছিলেন এবং ইয়াজিদের শাসনব্যবস্থা খেলাফতে রাশেদা ছিল না, এমনকি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও ছিল না।

---

২৩৪. সুরা বাকারা, ১৩৭

২৩৫. *জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাজলিহি*, ৩৬৭

২২. ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার বিষয়ে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত—

ক. একদল তাকে ভালোবাসে ও সঠিক মনে করে।

খ. আরেকদল তাকে ভালোবাসে না, বরং গালমন্দ, তিরস্কার ও অভিসম্পাত করে।

গ. অপর একটি দল তাকে ভালোও বাসে না, আবার গালমন্দ, তিরস্কার ও অভিসম্পাতও করে না, বরং তাকে খেলাফতে রাশেদা ছাড়া অন্যান্য মুসলিম শাসকের মতোই একজন শাসক মনে করে। যার শাসনব্যবস্থা ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ছিল না।

এই তিনটি দলের মধ্যে সর্বশেষ দলটির অবস্থান সঠিক ও নিরাপদ। উল্লেখ্য, ইয়াজিদের যাবতীয় ফাসেকি কর্মকাণ্ড থেকে হজরত মুআবিয়া রা. সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

اللعن على يزيد يجوز، ولكن ينبغي أن لا يفعل.

ইয়াজিদকে অভিসম্পাত করা জায়েজ, কিন্তু উচিত হলো না করা।[২৩৬]

২৩. খেলাফতে রাশেদা একটি পরিভাষা। যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই প্রসিদ্ধ চার খলিফা, যাদের খেলাফত অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তারা হলেন যথাক্রমে, ক. হজরত আবু বকর রা., খ. হজরত উমর রা., গ. হজরত উসমান রা. ও ঘ. হজরত আলি রা.।

২৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে যে-সকল নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তারা হলেন উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মা।

২৫. উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন হজরত খাদিজা রা. এবং হজরত আয়েশা রা.। তারপর হজরত হাফসা রা. ও অন্যরা।

২৬. হজরত খাদিজা রা. উত্তম নাকি হজরত আয়েশা রা.?

এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য আছে। কতক বলেন, হজরত খাদিজা রা. উত্তম। আবার কতক বলেন, হজরত আয়েশা রা.। এর বাহিরে গিয়ে কতক আবার এ বিষয়ে চুপ থাকাকেই উত্তম মনে করেন।

---

২৩৬. *ফাতাওয়া বাজজাযিয়া*, ২/৪৬৩

অনুরূপ হজরত আয়েশা রা. উত্তম নাকি হজরত ফাতেমা রা., এ প্রশ্নেও কতক মনে করেন, হজরত ফাতেমা রা. এবং কতক মনে করেন, হজরত আয়েশা রা.। এর বাহিরে গিয়ে কতক আবার এ বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম মনে করেন।
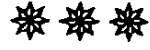
জিন ও শয়তান সম্পর্কে আকিদা

১. জিন বলা হয় এমন মাখলুককে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অদৃশ্য দেহধারী জীববিশেষ।

২. জিনজাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ যদি অস্বীকার করে বা ন্যূনতম পরিমাণ সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

> জিন ও মানুষকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[২৩৭]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

> (হে রাসুল) বলে দিন, আমার কাছে ওহি এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে। অতঃপর (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে যে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।[২৩৮]

৩. জিনকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾

আর তিনি জিন সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে।[২৩৯]

---

২৩৭. সুরা জারিয়াত, ৫৬
২৩৮. সুরা জিন, ১
২৩৯. সুরা রহমান, ১৫

৪. 'জিন' একটা আম বা ব্যাপক শব্দ, আগুন থেকে সৃষ্ট সকলেই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শয়তান দ্বারা জিনজাতির সকল সদস্য উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে অসৎ, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বলা হয় শয়তান। আর ইবলিশ বলা হয় হজরত আদম আ.-কে সেজদা না করার কারণে আল্লাহ তাআলার রহমত এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত শয়তানকে।

৫. ইবলিশ প্রথমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত এবং ফেরেশতাদের সাথেই থাকত। তারপর যখন আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ করলেন হজরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য, তখন সে অহংকারবশত আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো। ফলে তিনি তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেন।

৬. কতক ইমামের মত হলো, ইবলিশ জিনজাতির সদস্য। আবার কতকের মত, ইবলিশ ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾

> আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সেজদা করো। ইবলিশ ছাড়া বাকি সবাই তখন তাকে সেজদা করল। (বস্তুত) সে ছিল জিনদের একজন।[২৪০]

৭. তারা মানুষদের মতো আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন। খেয়ালখুশি অনুযায়ী নিজের ভালো-মন্দ নির্বাচনের ইখতেয়ারও তারা রাখে।

৮. তারা মানুষের মতো আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে বাধ্য। যে তা মানবে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করবে, সে জান্নাতি। আর যে তাঁর অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামি।

৯. জিনকে মানবজাতির পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

১০. অন্যান্য মাখলুকের মতো জিনরা পানাহার করে।

১১. জিনদের মধ্যে যেমন পুরুষ আছে, তেমন নারীও আছে।

১২. তাদের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয় এবং সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশবিস্তারের প্রচলন বিদ্যমান।

---

২৪০. সুরা কাহফ, ৫০

১৩. তারা মৃত্যুবরণ করে। তবে খোদ ইবলিশ কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে এবং অন্যদের বয়সসীমা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলা অবগত। হ্যাঁ, এটুকু জানা যায় যে, তাদের বয়স মানুষদের থেকে বেশি হয়।

১৪. জিনদের এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে, যা মানুষদের দেওয়া হয়নি। যেমন তারা খুব দ্রুত চলাফেরা ও ত্বরিত স্থান বদল করতে পারে।

১৫. তারা মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রাখলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণে অপারগ।

১৬. অতিপ্রাকৃত অনেককিছু করার শক্তি তাদের থাকলেও নবি-রাসুলগণের মুজিজা প্রকাশে তারা অক্ষম।

১৭. তারা অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আসমান ও জমিনে তাদের একটা গণ্ডি ও সীমা রয়েছে, যা তারা চাইলেও অতিক্রম করতে পারে না।

১৮. জিনদের কাছেও ওহি প্রেরিত হয়। তবে তা কীভাবে হয়, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কতক ইমামের মতে মানুষদের মধ্যে যেমন নবি হয়, তেমনই তাদের মধ্য থেকেও নবি হয়। আবার কেউ বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে জিনদের নিকট কোনো রাসুলই প্রেরণ করা হয়নি। তবে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, জিনদের মধ্য থেকে কোনো নবি-রাসুল হয় না, বরং নবি-রাসুল মানুষদের মধ্য থেকেই হয় এবং তারা নিজ নিজ সমকালীন সকল জিন-ইনসানের নবি। তবে জিনদের বিভিন্ন দল জমিনে বিচরণ করে নবিদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিধিবিধান শ্রবণ করে। তারপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং তাদের সতর্ক করে।

১৯. জিনদের মধ্যেও সৎ-অসৎ ও মুসলিম-অমুসলিম রয়েছে। হাশরের দিন তারাও পুনরুত্থিত হবে এবং মানুষের মতো তাদেরও হিসাবনিকাশ হবে।

২০. বলাবাহুল্য, গায়েব ও ভবিষ্যতের কোনো সংবাদই তারা জানে না, এমনকি জানা সম্ভবও নয়।

২১. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবের নবি, তেমনই তিনি সকল জিনেরও নবি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

❋❋❋

কুফরের পরিচয় ও তার প্রকার

কুফরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা।

আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, জরুরিয়াতে দ্বীন বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে যে-সকল বিষয় প্রমাণিত, তার কোনো একটিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা।

কুফর সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যম তিনটি—

ক. বিশ্বাসের মাধ্যমে কুফর সাব্যস্ত হওয়া। যেমন জরুরিয়াতে দ্বীনের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস লালন করলে কাফের হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিকরূপে সাব্যস্ত করল কিংবা হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করল ইত্যাদি।

খ. বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কুফর সাব্যস্ত হওয়া। যেমন কেউ জেনে-বুঝে, ইচ্ছাকৃতভাবে ও বিশ্বাসের সাথে কোনো কুফরি কথা, শব্দ বা বক্তব্য উচ্চারণ করল কিংবা জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনোকিছু অস্বীকারমূলক বক্তব্য দিলো, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি সে ভুলে বা একান্ত বাধ্য হয়ে নিছক অপারগতাবশত এগুলো বলে, তাহলে কাফের হবে না। আর যদি কেউ না বুঝে বলে, অর্থাৎ বলেছে ইচ্ছা করেই, কিন্তু সে জানে না যে এটা কুফরি কথা, তাহলে সে কাফের হবে কি না তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

গ. আমলের মাধ্যমে কুফর সাব্যস্ত হওয়া। তবে এর জন্য তিনটি শর্ত আছে, কেননা আমল মূলত ঈমান পূর্ণতারই একটি অংশ, ফলে আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঈমান পূর্ণ হওয়ার ওপর প্রভাব ফেললেও মূল ঈমানে কোনো প্রভাব ফেলে না। কাজেই এ হিসাবে আমলের মাধ্যমে ঈমান নষ্ট হয়ে কুফর সাব্যস্ত হবে না যদি না তিনটি অবস্থা পাওয়া যায়—

১. যদি সেই আমলটা এমন হয় যে, তা স্পষ্টই একটি কুফরি বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাচ্ছে, যেমন কেউ ক্রুশ বা মূর্তিকে সেজদা করল। এ জাতীয় কাজগুলো প্রকারান্তরে মুখে কুফরি শব্দ উচ্চারণেরই নামান্তর।

২. ইসলামের সুস্পষ্ট কোনো হারাম বিধানকে হালাল বলে মনে করে করা। যেমন হালাল মনে করে মদ পান করা। মদ পানের কারণে কাফের না হলেও হালাল মনে করে পানের কারণে কাফের হয়ে যাবে। বাস্তবে কুফরের এই সুরাতটা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. শরিয়তের যে বিধানগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এমন কোনো বিধান ও জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করা। এই প্রকারের কাজটাও মূলত বিশ্বাসের মাধ্যমে কুফর সাব্যস্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

কতিপয় কুফর

১. জরুরিয়াতে দ্বীন (ضروريات الدين)-এর কোনো একটিকে অস্বীকার ও বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলে কাফের হয়ে যাবে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জরুরিয়াতে দ্বীন

ক) আল্লাহ তাআলাকে এক জানা এবং তাঁর জাত ও সকল সিফাতের প্রতি ঈমান রাখা। খ) সকল আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান রাখা। গ) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখা। ঘ) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবির ওপর ঈমান রাখা এবং তাদের থেকে প্রকাশিত ও প্রমাণিত সকল অলৌকিক ঘটনাকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করা। ঙ) হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবি ও রাসুলরূপে বিশ্বাস করা। চ) জান্নাত-জাহান্নাম, মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও কেয়ামতকে বিশ্বাস করা। ছ) তাকদিরের ওপর ঈমান রাখা। জ) নিশ্চিতভাবে যেগুলোকে কুরআন-হাদিসে হালাল বা হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেগুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করা। ঝ) ইসলামের রোকনসমূহ, যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ ইত্যাদির প্রতি ঈমান আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আরকানে ইসলামের কোনো একটিকে অস্বীকার করা আর যেকোনো কারণে তা আদায় করতে না পারা, এতদুভয়ের হুকুম এক নয়।

কেউ যদি উপরিউক্ত কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার করে, অথবা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

২. জরুরিয়াতে দ্বীনকে সত্য মনে করা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করা এবং মুখেও স্বীকারোক্তি না দেওয়া কুফর।

৩. মন থেকে জরুরিয়াতে দ্বীনকে সত্য মনে করা, মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া এবং তা গ্রহণ করা। সেইসাথে যে-সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে কুরআনে কাফের বলা হয়েছে, তাদেরকে কাফের মনে না করা কুফর। যেমন ইহুদি, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক ইত্যাদি।

৪. জরুরিয়াতে দ্বীনকে মুখে স্বীকার করা, কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস করা কুফর।

৫. কেউ হয়তো জরুরিয়াতে দ্বীনকে বিশ্বাস করে এবং ইসলামও পালন করে। কিন্তু জরুরিয়াতে দ্বীনেরই স্বতঃসিদ্ধ কোনো বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ব্যাখ্যার বিপরীত, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের বহু গোমরাহির মাঝে এটিও একটি গোমরাহি।

৬. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা বলা এবং তাঁকে নবি ও সর্বশেষ নবি হিসাবে স্বীকার না করা কুফর।

৭. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেওয়ার পর অকাট্যভাবে প্রমাণিত তাঁর কোনো কথা বা কাজকে স্পষ্ট ভুল ও মিথ্যা বলা কুফর।

৮. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.-এর ওপর মিথ্যা অপবাদকে বিশ্বাস করা কুফর।

৯. কেয়ামতের পূর্বে হজরত ঈসা আ.-এর অবতরণকে বিশ্বাস না করা কুফর।

১০. অস্বীকার ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নামাজ ছেড়ে দেওয়া অথবা নামাজকে ফরজ মনে না করা কুফর। তবে অলসতার কারণে নামাজ ছেড়ে দেওয়া, কুফর না হলেও কবিরা গুনাহের কাজ।

১১.সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসা যেমন ঈমানের অংশ, তেমনই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নেফাক, কুফর, এবং সীমালঙ্ঘন করার পর্যায়ভুক্ত।

১২. পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার ও অপমান করা কুফর। সেইসাথে তা বিকৃত হয়ে গেছে, এমন বিশ্বাস লালন করা কুফর।

১৩. জেনে-বুঝে অনৈসলামিক কোনো বিধিবিধানকে ইসলামি বিধিবিধানের তুলনায় উত্তম মনে করা কুফর।

১৪. অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইসলামি কোনো বিধানকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও হাসি-ঠাট্টা করা কুফর।

১৫. কারও কাছ থেকে গায়েবের কোনো খবর জানা, অতঃপর তা বিশ্বাস করা কুফর।

১৬. আল্লাহ তাআলার জন্য মাখলুকের অনুরূপ কোনো গুণ বা মাখলুকসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় সাব্যস্ত করা কুফর। বলাবাহুল্য, দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী গোষ্ঠী এ ধরনের আকিদা পোষণ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উল্লিখিত সকল বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। কিন্তু কুফর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সকল বিষয়কে অস্বীকার করা শর্ত নয়, বরং জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো একটিকে অস্বীকার ও বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করলেই কাফের হয়ে যাবে।

২. কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে বা এমন কিছু বলে, যা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইখতেলাফ রয়েছে, অথবা কাজটি বা কথাটির একাধিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে, যার কোনোটি কুফর আবার কোনোটি কুফর নয়, তাহলে কুফরের হুকুম না দেওয়াই শ্রেয়, কারণ কুফর সাব্যস্তের জন্য অকাট্য দলিল লাগে। যা কোনো দুর্বল, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও সন্দেহপূর্ণ বিষয় দিয়ে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

৩. আহলে কিবলা দ্বারা এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়, যারা কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করে। এ অর্থ অনুসারে ইসলামের নামে সৃষ্টি হওয়া সকল দলই আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আহলে কিবলার মধ্যে মুসলিম ও মুমিন তাদেরকে বলা হয়, যারা কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায়ের সাথে সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ে আসা সকলকিছুকে স্বীকার ও সত্যায়ন করেন। আহলে কিবলার কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ

না সে জরুরিয়াতে দ্বীন ও উম্মতের ঐকমত্যের কোনো একটিকে অস্বীকার করে বা বিকৃত করে। আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন,

أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر ، فمن أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد ، وعلم الله سبحانه بالجزئيات ، وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات ، وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود لصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه ، فليس من أهل القبلة ومعنى : عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة.

আকিদাবিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় আহলে কিবলা বলা হয়, জরুরিয়াতে দ্বীন বা শরিয়তে যে-সকল বিষয় মজবুতভাবে প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ, এমন সকল বিষয়কে সত্যায়ন করা। যেমন বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, হাশর, আল্লাহ তাআলা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন, নামাজ-রোজা ফরজ। জরুরিয়াতে দ্বীনের এমন কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার করলে আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যদিও সে ইবাদতে নিমগ্ন। অনুরূপ কারও মাঝে মিথ্যা বা অস্বীকারের আলামত পাওয়া গেলে (সেও আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়), যেমন মূর্তিকে সেজদা করা, শরিয়তের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হাসি-ঠাট্টা করা, এমন ব্যক্তি আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলে কিবলাকে কাফের না বলার অর্থ হচ্ছে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলে বা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ছোটখাটো বিষয়কে অস্বীকার করলে কাফের না বলা।[২৪১]

৪. কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর সাথে 'কুফর' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া গেলেও সেখানে প্রকৃত কুফর উদ্দেশ্য নয়, বরং সেখানে শুধু কঠোরতা বোঝানো উদ্দেশ্য। যেমন পিতাবিমুখতা, মুসলিমদের পারস্পরিক লড়াই, অনিচ্ছাকৃত বা অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করা ইত্যাদি।

---

২৪১. *ইকফারুল মুলহিদিন*, ৪২

কুফরের বিধান

১. কুফর অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি। (নাউজুবিল্লাহ)

২. কুফর ও কাফেরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের প্রতি অসন্তোষ পোষণ করা। কাফেরদেরকে আল্লাহর দুশমন জ্ঞান করা এবং তাদের সঙ্গে কোনোরূপ বন্ধুসুলভ সম্পর্ক না রাখা।

৩. কোনো কাফের যেমন কোনো মুসলিমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, তেমনই কোনো মুসলিমও কাফেরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না।

৪. কাফেরের জানাজায় অংশগ্রহণ বা তাদের পাশে দাঁড়ানো বৈধ নয়। এমনকি মুসলিমদের জানাজায়ও কাফেরদের অংশগ্রহণ বৈধ নয়।

৫. মৃত কাফের নিকটাত্মীয় হলেও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা বৈধ নয়।

৬. কাফেরকর্তৃক শিকার করা বা জবাইকৃত পশু মুসলমানদের জন্য হালাল নয়।

৭. কোনো কাফেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা বৈধ নয়।

ولله الحمد.

আকিদাসংক্রান্ত

অন্যান্য জরুরি আলোচনা

(দ্বিতীয় ভাগ)

তাওহিদের পরিচয় ও প্রকার

তাওহিদের আভিধানিক অর্থ

التوحيد لغة : الحكم بأن الشيئ واحد والعلم بأنه واحد.

কোনো জিনিসকে এক বলে হুকুম দেওয়া এবং এক বলে জানাকে আভিধানিকভাবে তাওহিদ বলা হয়।[২৪২]

তাওহিদের পারিভাষিক অর্থ

شرعا : اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها لله تعالى جل شأنه.

আল্লাহ তাআলার উলুহিয়াত তথা প্রভুত্ব এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো শরিক ও অংশীদার নেই বলে বিশ্বাস করা।[২৪৩]

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত তাওহিদকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন—

১. তাওহিদুজ জাত (توحيد الذات)

ব্যাখ্যা : সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। দলিল—

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾

আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।[২৪৪]

২. তাওহিদুল আফআল (توحيد الأفعال)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। দলিল—

---

২৪২. *আত-তারিফাত*, ৭৩

২৪৩. শরহুল মাকাসিদ, ৩/২৭

২৪৪. সুরা ইখলাস, ১

﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

আল্লাহ তাআলা সকলকিছুর স্রষ্টা।[২৪৫]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

আর আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[২৪৬]

৩. তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত (توحيد الأسماء و الصفات)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। দলিল—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

কোনোকিছুই তাঁর মতো বা সদৃশ নয়।[২৪৭]

ইমাম শাহরাসতানি রহ. বলেন,

إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له ، وواحد في أفعاله لا شريك له.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার ক্ষেত্রে এক, যিনি অংশ ও খণ্ড খণ্ড নন। তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলিতে এক, যার সদৃশ কিছু নেই। তিনি তাঁর সকল ক্রিয়াকর্মে এক, যাতে তাঁর কোনো শরিক নেই।[২৪৮]

তাওহিদের মর্মকথা

তাওহিদ অর্থ এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার ও সমকক্ষ নেই। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সৃষ্টির সদৃশ হওয়া থেকে পবিত্র। তিনিই একমাত্র হক মাবুদ

---

২৪৫. সুরা জুমার, ৬২
২৪৬. সুরা সাফফাত, ৯৬
২৪৭. সুরা শুরা, ১১
২৪৮. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, ১/৫৫

তথা সত্য উপাস্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউ কোনোপ্রকার ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি সকলকিছুর স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি রিজিকদাতা, জীবন ও মৃত্যু দানকারী এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল গুণের পূর্ণাঙ্গ অধিকারীও তিনিই। তিনি উপমাহীন ও অতুলনীয়।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর নিকট তাওহিদের ভাগ

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. তাওহিদের নতুন একটি ভাগ উল্লেখ করেন। তা হলো—

১. তাওহিদুল উলুহিয়া

ব্যাখ্যা : শরিয়তের সকলপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা এবং কাউকে শরিক না করা।

২. তাওহিদুর রুবুবিয়া

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার সকল আফআল তথা যাবতীয় কর্মে কাউকে শরিক না করা।

৩. তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।

মতবিরোধের সারকথা

এই ইখতেলাফের বড় একটি প্রভাব পড়েছে অসিলা গ্রহণ বিষয়ে। কেননা যখন কোনো ব্যক্তি অসিলা গ্রহণ করে, তখন ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর দৃষ্টিতে সে কুফরি করছে। তার ও মুশরিকদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা তারা উভয়ে তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী, কিন্তু তাওহিদুল উলুহিয়ায় বিশ্বাসী নয়।

অর্থাৎ তারা উভয়ে বিশ্বাস করে এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তিনিই একমাত্র পরিচালনাকারী, একমাত্র রিজিক দানকারী, জীবন ও মৃত্যু দানকারী ইত্যাদি। সাথে সাথে উভয়ে আল্লাহ তাআলা ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুর ইবাদত ও উপাসনা করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অসিলা গ্রহণ করে। ফলে মুশরিক এবং অসিলা গ্রহণকারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

এই বিষয়টি সাব্যস্তের জন্য তিনটি জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে—

১. তাওহিদুল উলুহিয়া ও তাওহিদুর রুবুবিয়া আলাদা হতে পারে।

২. মুশরিকরা শুধু তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল।

৩. নবি-রাসুল প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেওয়া।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অবস্থান

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর এই ভাগ ও পরিচয়ের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বিশেষ কোনো দ্বিমত নেই। শুধু দ্বিধার জায়গাটি হলো, তাওহিদুল উলুহিয়া ও তাওহিদুর রুবুবিয়া একটি কি অপরটির জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যক?

এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অভিমত হলো, তাওহিদুর রুবুবিয়া ও তাওহিদুল উলুহিয়া একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য।

অর্থাৎ কেউ যদি তাওহিদুর রুবুবিয়া স্বীকার করে, তাহলে সে তাওহিদুল উলুহিয়াও স্বীকার করতে বাধ্য। অনুরূপ কেউ যদি তাওহিদুল উলুহিয়া স্বীকার করে, তাহলে সে তাওহিদুর রুবুবিয়াও স্বীকার করতে বাধ্য। তাওহিদুর রুবুবিয়ায় শিরক করা মানে, তাওহিদুল উলুহিয়ায় শিরক করা। অনুরূপ তাওহিদুল উলুহিয়ায় শিরক করা মানে, তাওহিদুর রুবুবিয়ায় শিরক করা। সুতরাং বোঝা গেল, একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য এবং একটি থেকে অপরটি পৃথক হতে পারে না।

পক্ষান্তরে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মত হলো, একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যক নয়, বরং এ দুটি পৃথকও হতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদুল উলুহিয়া স্বীকার করা মানে তাওহিদুর রুবুবিয়া স্বীকার করে নেওয়া নয়। অনুরূপভাবে তাওহিদুর রুবুবিয়া স্বীকার করা মানে তাওহিদুল উলুহিয়া স্বীকার করে নেওয়া নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের দলিল

১. রুহের জগতে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেন,

﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾

আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললেন, অবশ্যই।[২৪৯]

এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে সাক্ষ্য নেওয়ার সময় শব্দ ব্যবহার করেছেন 'রব', এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের থেকে তিনি শুধু তাঁর রুবুবিয়ার সাক্ষ্য চেয়েছেন, উলুহিয়ার সাক্ষ্য চাননি। অথবা আমরা শুধু তাঁর রুবুবিয়ার সাক্ষ্যই দিয়েছি, উলুহিয়ার দিইনি। (নাউজুবিল্লাহ) বরং 'রব' শব্দটির মাঝে তাওহিদুর রুবুবিয়ার সাক্ষ্যের সাথে সাথে তাওহিদুল উলুহিয়ার সাক্ষ্যও নিহিত আছে।

২. হজরত বারা ইবনে আজিব রা.-এর হাদিসে এসেছে, কবরে প্রশ্ন করা হবে, من ربك—'তোমার রব কে?'

উত্তরে যখন বলা হবে, ربي الله—'আমার রব আল্লাহ।' তখন পুনরায় এ প্রশ্ন করা হবে না, من إلهك—'তোমার ইলাহ কে?'

সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়ার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো, তাঁর উলুহিয়ারও সাক্ষ্য দেওয়া। একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য এবং একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না।

৩. আমাদের কালিমার প্রথম অংশ لا إله إلا الله—'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'।

এই কালিমা পড়ার মাধ্যমে আমরা শুধু আল্লাহ তাআলার উলুহিয়ার সাক্ষ্য দিই, বিষয়টা এমন নয়; বরং 'ইলাহ' শব্দটির মাঝে তাওহিদুল উলুহিয়ার সাক্ষ্যের সাথে সাথে তাওহিদুর রুবুবিয়ার সাক্ষ্যও নিহিত আছে।

কাজেই যারা বলেন, তাওহিদুর রুবুবিয়া এবং তাওহিদুল উলুহিয়া—উভয়টা আলাদা এবং একটির সাক্ষ্য দ্বারা অন্যটির সাক্ষ্য সাব্যস্ত হয় না, তাদের উচিত নতুন কোনো কালিমা আবিষ্কার করা, যেখানে তাওহিদুল উলুহিয়ার জন্য যেমন শব্দ থাকবে, তেমনই তাওহিদুর রুবুবিয়ার জন্যও আলাদা শব্দ থাকবে।

৪. তাওহিদুল উলুহিয়া ও তাওহিদুর রুবুবিয়ার মাঝে পার্থক্য না করাই হলো সুস্থ বিবেকের দাবি। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

২৪৯. সুরা আরাফ, ১৭২

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ - يُدَبِّرُ الْأَمْرَ - مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ - أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশে ইসতাওয়া। তিনি (সকল) বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি (লাভের) আগে কোনো সুপারিশকারী (তাঁর কাছে) সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[২৫০]

উল্লিখিত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আয়াতের প্রথম অংশে, অর্থাৎ, 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশে ইসতাওয়া। তিনি (সকল) বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি (লাভের) আগে কোনো সুপারিশকারী (তাঁর কাছে) সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব।' এই কথাগুলো দ্বারা তাওহিদুর রুবুবিয়া বোঝানো হয়েছে। তারপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ, তথা, 'সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো,' এই কথা দ্বারা তাওহিদুল উলুহিয়ার আদেশ করা হচ্ছে।

অর্থাৎ, যখন কেউ আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করবে, তখন সে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। সুস্থ বিবেকের দাবি এটাই।

❋❋❋

---

২৫০. সুরা ইউনুস, ৩

মুশরিকরা কি তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল?

মুশরিকদের অবস্থা

১. তারা বিশ্বাস করত, আল্লাহ তাআলা যেমন নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনই তাদের বিভিন্ন উপাস্যরা ইচ্ছা করলেই সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾

তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে?[২৫১]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾

এবং আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে যে, তারা তোমাদের বিষয়ে (আল্লাহর) শরিক।[২৫২]

২. তারা বিশ্বাস করত, উপাস্যরা তাদের লাভ-ক্ষতি ও সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾

তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে, (এই প্রত্যাশায় যে,) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[২৫৩]

---

২৫১. সুরা জুমার, ৪৩
২৫২. সুরা আনআম, ৯৪
২৫৩. সুরা ইয়াসিন, ৭৪

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে, এজন্য যে, যাতে তারা তাদের সাহায্য করতে পারে।[২৫৪]

৩. তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মগুরুদের বিধানদাতা মনে করত। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (তথা ইহুদি ধর্মগুরু) এবং রাহিব (তথা খ্রিষ্টান বৈরাগীকে) রব বানিয়ে নিয়েছে।[২৫৫]

৪. আল্লাহর পরিবর্তে তারা একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী ছিল। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

ভিন্ন ভিন্ন বহু মাবুদ উত্তম, নাকি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ?[২৫৬]

৫. দুনিয়াতে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে নানান সমকক্ষ সাব্যস্ত করত। কেয়ামতের দিন এজন্য তারা আফসোস করে বলবে,

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম।[২৫৭]

এমন বহু দলিল আছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল না।

২৫৪. সুরা মারইয়াম, ৮১
২৫৫. সুরা তাওবা, ৩১
২৫৬. সুরা ইউসুফ, ৩৯
২৫৭. সুরা শুআরা, ৯৭/৯৮

নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য কি একমাত্র তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেওয়া?

১. নমরুদ নিজেকে রব মনে করত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾

তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দান করার কারণে সে নিজ প্রতিপালকের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহিমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহিম বললেন, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তখন সে বলল, আমিও জীবন দিই এবং মৃত্যু ঘটাই।[২৫৮]

২. ইউসুফ আ.-এর যুগের মানুষেরা একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

ভিন্ন ভিন্ন বহু মাবুদ উত্তম, নাকি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ?[২৫৯]

৩. ফেরাউন নিজেকে ইলাহ ও রব মনে করত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾

আর ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না।[২৬০]

---

২৫৮. সুরা বাকারা, ২৫৮
২৫৯. সুরা ইউসুফ, ৩৯
২৬০. সুরা কাসাস, ৩৮

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾

তখন সে (ফেরাউন) বলল, আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।[২৬১]

৪. নবিরা নাস্তিক ও আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের নিকট দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

আর তারা বলে, দুনিয়াবি জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে।[২৬২]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনছ না? অথচ রাসুল তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, যেন তোমরা তোমাদের 'রবের' ওপর ঈমান আনো।[২৬৩]

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, নবিদেরকে শুধু তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে, এটা চরম ভুল ও অজ্ঞতা।

প্রশ্ন আসতে পারে, নিম্নোক্ত আয়াত দুটির ব্যাখ্যা তাহলে কী?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

আর যারা (আল্লাহ তাআলার) পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (এ কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।[২৬৪]

---

২৬১. সুরা নাজিআত, ২৪
২৬২. সুরা জাসিয়া, ২৪
২৬৩. সুরা হাদিদ, ৮

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে, তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।[২৬৫]

উল্লিখিত আয়াত দুটির ব্যাখ্যা

১. তাওহিদুর রুবুবিয়া একটি আম ও ব্যাপক শব্দ। হতে পারে তাদের কতক তাওহিদুর রুবুবিয়ার কিছু অংশে আল্লাহকে বিশ্বাস করত। কিন্তু এই সামান্য অংশের ওপর ভিত্তি করে ঢালাওভাবে বলে দেওয়া যে, তারা সবাই আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল, এটা স্পষ্ট কুরআনবিরোধী কথা।

২. এটা নিছক তাদের মুখের দাবি। অন্তরের বিশ্বাস তাদের এটা ছিল না, বরং যখন বিভিন্ন আয়াত ও দলিলের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত বিশ্বাস তুলে ধরা হচ্ছিল, তখন তারা বাধ্য হয়ে এ সমস্ত দাবির আশ্রয় নিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

আর যারা (আল্লাহ তাআলার) পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (এ কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যার মাঝে তারা মতবিরোধ করছে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথপ্রদর্শন করেন না, যে চরম মিথ্যুক ও কুফরের ওপর অবিচল।[২৬৬]

আয়াতের শেষ অংশ, তথা, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথপ্রদর্শন করেন না, যে চরম মিথ্যুক ও কুফরের ওপর অবিচল', এই অংশ থেকে স্পষ্ট

---

২৬৪. সুরা জুমার, ৩
২৬৫. সুরা জুমার, ৩৮
২৬৬. সুরা জুমার, ৩

বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা তাতে অবিশ্বাসী ছিল এবং সর্বদা ছিল কুফরের ওপর অবিচল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বক্তব্যের শেষে তাদের স্পষ্টভাবেই মিথ্যুক বলেছেন।

খোলাসা

তাওহিদুল উলুহিয়া ও তাওহিদুর রুবুবিয়া একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যক। কোনোটি কোনোটি থেকে পৃথক হতে পারে না, সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসাবে বিশ্বাস করে, তাহলে সে তাঁকে ইলাহ হিসাবেও বিশ্বাস করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে যদি কেউ তাঁকে ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করে, তাহলে তাঁকে রব হিসাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য।

বলাবাহুল্য, 'মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়ায় বিশ্বাসী ছিল, নবিদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেওয়া', এমন দাবি স্পষ্ট কুরআনবিরোধী এবং চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা।

তাওহিদের প্রকারের ক্ষেত্রে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের ভাগটা গ্রহণ করার চেষ্টা করি। তবে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ভাগটা গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু তাওহিদুল উলুহিয়া ও তাওহিদুর রুবুবিয়ার মাঝে তার পার্থক্যটা স্পষ্ট কুরআনবিরোধী, সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা স্থান, কাল, পাত্র থেকে চিরপবিত্র

আল্লাহ তাআলার অবস্থান বিষয়ে মৌলিকভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়—

১. আল্লাহ তাআলা কোনো সৃষ্টি বা বিশ্বজগতের কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি সকলকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের সকলকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।[২৬৭]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।[২৬৮]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾

আর আল্লাহই ধনী বা অমুখাপেক্ষী এবং তোমরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী।[২৬৯]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

কোনোকিছুই (আল্লাহ তাআলার) মতো বা সদৃশ নয়।[২৭০]

---

২৬৭. সুরা আনকাবুত, ৬
২৬৮. সুরা ইখলাস, ২
২৬৯. সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮
২৭০. সুরা শুরা, ১১

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত তাঁর মতো। সৃষ্ট কিছুই তাঁর মতো বা সদৃশ নয়। যেমন যাবতীয় সৃষ্টি স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ হলেও তিনি কিন্তু কোনো স্থান বা কালের সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি বিশ্বজগতের সকলকিছু থেকে ভিন্ন ও অমুখাপেক্ষী।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيئ من خلقه.

> তিনি আপন সৃষ্টির কোনোকিছুর সদৃশ নন এবং আপন সৃষ্টির কোনোকিছু তাঁর সদৃশ নয়।[২৭১]

নববি রহ. বলেন,

> اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيئ وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق.
>
> আমাদের সুদৃঢ় আকিদা হলো, কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার মতো বা সদৃশ নয়। সেইসাথে তিনি যাবতীয় দেহ, স্থানান্তর, কোনো দিকে থাকা এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে চিরপবিত্র।[২৭২]

২. কিছু আয়াত ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, তিনি আরশে আছেন,

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন।[২৭৩]

তিনি আসমানে আছেন,

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾

তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ তার থেকে, যিনি আসমানে আছেন?[২৭৪]

---

২৭১. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৪
২৭২. *আল-মিনহাজ*, ৩/২৪-২৫
২৭৩. সুরা আরাফ, ৫৪
২৭৪. সুরা মুলক, ১৬

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনে আছেন,

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

তিনিই ওই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনে আছেন।[২৭৫]

তিনি প্রতিটি মানুষের সাথে সাথে আছেন,

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

আর তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।[২৭৬]

তিনি সকল দিকেই আছেন,

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা।[২৭৭]

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾

তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচজনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না।[২৭৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা তিনি বলেছেন, **নিশ্চয় তার ও কিবলার মাঝে তার প্রতিপালক রয়েছেন**। কাজেই তোমাদের কেউ যেন

---

২৭৫. সুরা আনআম, ৩
২৭৬. সুরা হাদিদ, ৪
২৭৭. সুরা বাকারা, ১১৫
২৭৮. সুরা মুজাদালা, ৭

কিবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং সে যেন তা তার বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে।[২৭৯]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা একইসাথে আরশে, আসমানে ও জমিনে—সবখানেই রয়েছেন এবং তিনি সকলের সাথে সাথে ও সকল দিকেই রয়েছেন।

৩. সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তখন না তিনি ছিলেন কোনো স্থানে আর না আরশে। ছিল না তাঁর সাথে কিছুই। মনে রাখতে হবে, তাঁর সত্তা ও সিফাত ছাড়া বাকি সকলকিছুই সৃষ্ট। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ - وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তিনিই আদি, অন্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর তিনি সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।[২৮০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ.

(একমাত্র) আল্লাহই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কোনোকিছুই ছিল না।[২৮১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

كان الله ولم يكن شيئ قبله.

(সবকিছুর আগে) একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনোকিছুই ছিল না।[২৮২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ.

---

২৭৯. *বুখারি*, ৪০৫
২৮০. সুরা হাদিদ, ২
২৮১. *বুখারি*, ৩১৯১
২৮২. *বুখারি*, ৭৪১৮

> হে আল্লাহ! আপনিই আদি। আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না। আপনিই অন্ত। আপনার পরেও কিছু নেই।[২৮৩]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।[২৮৪]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছিলেন এবং সকলকিছু ধ্বংসের পরও কেবল তিনিই থাকবেন। সৃষ্টির পূর্বে তাঁর সাথে কোনো মাখলুক তো ছিলই না; বরং কোনোপ্রকার স্থান বা আরশ ছাড়াই তিনি বিদ্যমান ছিলেন পুরোমাত্রায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত প্রথম ও তৃতীয় অবস্থাকে সামনে রেখে বলেন, আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন কোনো স্থান ও আরশের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তেমনই সকলকিছু সৃষ্টির পরেও তিনি কোনো স্থান ও আরশের মুখাপেক্ষী নন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? এর উত্তর হচ্ছে, কোনো সৃষ্টির পক্ষে এটা কখনো জানা সম্ভব নয় যে, তার সৃষ্টির পূর্বে তার স্রষ্টা কোথায় ছিলেন। কেউ যদি দাবি করে, তিনি সংবাদ দিয়েছেন সৃষ্টির পর তিনি আরশে উঠেছেন বা ওপরে আছেন, তাহলে তার এমন দাবিও সঠিক নয়। কেননা তিনি শুধু আরশে বা ওপরে থাকার সংবাদ দেননি; বরং তিনি আরশ, আসমান জমিন এবং সকল দিকে থাকার সংবাদই দিয়েছেন। এমনকি সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকার সংবাদও তিনি দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে যদি শুধু আরশে বা ওপরের আয়াতসমূহ থাকত এবং অন্য কোনো আয়াত না থাকত, তাহলে হয়তো এ বক্তব্য সঠিক ছিল। কিন্তু কুরআন ও হাদিসে তো শুধু আরশে থাকার কথা আছে এমন নয়, বরং বহু স্থানে থাকার কথা এসেছে। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত পুরো কুরআন ও হাদিসকে সামনে রেখে এমন আকিদা পোষণ করে থাকেন।

তিনি ওপরে আছেন, শুধু এ সংক্রান্ত কোনো আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা করা যাবে না; বাকি সকল আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা করা যাবে, বিষয়টি এমন

---

২৮৩. *মুসলিম*, ২৭১৩

২৮৪. সুরা কাসাস, ৮৮

নয়। এমনকি এ জাতীয় কোনো আয়াত-হাদিসও বর্ণিত হয়নি। ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত ওপরের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত-হাদিসের যেমন ব্যাখ্যা করেন, তেমনই অন্যান্য স্থানের আয়াত-হাদিসেরও ব্যাখ্যা করেন। কাজেই কেউ যদি বলে, ওপরের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না, এ ছাড়া বাকি সকল আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে, এটা নিছক নিজেদের বানানো একটি মূলনীতি। কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত কোনো মূলনীতি নয়।

তবে নানান প্রেক্ষাপটে বক্তব্যকে জোরালো ও মজবুত করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াত-হাদিসে নিজেকে বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। সেগুলোর কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরে তাঁর জন্য যদি এমন কোনো অবস্থা, সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করা হয়, যা সৃষ্টির পূর্বে তাঁর ছিল না, তবে তা হবে পরিষ্কার ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মৌলিক একটি আকিদা হলো, মাখলুক সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে এমন কোনো সিফাত বা গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে তাঁর সিফাত হিসাবে ছিল না।

সেইসাথে যদি এটি সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয় যে, সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা আরশে বা অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করেছেন, তাহলে এর দ্বারা তাঁর সত্তার মাঝেও একটি পরিবর্তন সাব্যস্ত করা হয়। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আরেকটি মৌলিক আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত সকলপ্রকার পরিবর্তন থেকে চিরপবিত্র। পরিবর্তন-পরিবর্ধন মাখলুকের সিফাত ও গুণ। এটি কখনো স্রষ্টার সিফাত হতে পারে না। যেমন ইমাম আবুল ফজল আত-তামিমি, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর আকিদা হিসাবে উল্লেখ করে লেখেন,

> والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.
>
> আল্লাহ তাআলার (মাঝে) কোনো বদল ও পরিবর্তন হয়নি এবং দিক ও সীমা তাঁর সাথে যুক্ত হয়নি। না আরশ সৃষ্টির পূর্বে, না আরশ সৃষ্টির পর।[২৮৫]

---

২৮৫. *ইতিকাদুল ইমাম আল-মুনাব্বাল*, ৩৮

এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত সমগ্র কুরআন-হাদিসকে সামনে রেখে এই আকিদা-বিশ্বাসে স্থির হয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত সৃষ্টির সদৃশ নয় এবং তিনি সব ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, স্থানান্তর, নড়াচড়া ও সৃষ্টির সকল গুণবৈশিষ্ট্য থেকে চিরপবিত্র। সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন কোনো স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তেমনই সকলকিছু সৃষ্টির পরেও তিনি কিছুর মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন।

উল্লিখিত দাবির পক্ষে নিম্নোক্ত পাঁচটি মূলনীতির আলোকে দলিল পেশ করা হয়—

ক. কুরআন। খ. হাদিস। গ. সালাফের ইজমা। ঘ. চার মাজহাব। ঙ. যুক্তি।

ক. কুরআন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾

কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়।[২৮৬]

আয়াতটি আল্লাহ তাআলা ও সৃষ্টির মধ্যকার যাবতীয় সকল সাদৃশ্যকে নাকচ করছে। সৃষ্টি যেমন হয় বা যতকিছুর মুখাপেক্ষী হয়, আল্লাহ তাআলা তেমন নন এবং তিনি সেসবের মুখাপেক্ষী নন। যেমন সৃষ্টি স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু তিনি কোনো স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ নন। কেননা এতে তাঁর জন্য সৃষ্টির সদৃশ হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ইমাম কুশাইরি রহ. উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে লেখেন,

> قد وقع قوم في تشبيه ذاته بذات المخلوقين ، فوصفوه بالحد والنهاية والكون في المكان.
>
> একটি সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সত্তাকে সৃষ্টির সত্তার সাথে উপমা দেওয়াতে পতিত হয়েছে। (এভাবে যে,) তারা (আল্লাহর জন্য) সীমা, প্রান্ত এবং স্থানে থাকাকে সাব্যস্ত করে।[২৮৭]

---

২৮৬. সুরা শুরা, ১১

২৮৭. *লাতায়িফুল ইশারাত*, ৩/৩৬০-৩৬১

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের সকলকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।[২৮৮]

ইমাম রাজি রহ. আয়াতটির তাফসিরে লেখেন,

تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فإنه من العالم والله غني عنه والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان.

আয়াতটি এ কথা বোঝায় যে, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) কোনো স্থানে নেই এবং নেই তিনি নির্দিষ্টভাবে আরশের ওপরেও। কেননা আরশ বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যিনি স্থান থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি কোনো স্থানে প্রবেশ (বা অবস্থান করা) সম্ভব না।[২৮৯]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾

আর আল্লাহই ধনী বা অমুখাপেক্ষী এবং তোমরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী।[২৯০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সুজাউদ্দিন তুরকিস্তানি রহ. বলেন,

فوجب إثبات تعاليه عن كل ما يفتقر إليه الخلق من الاتصاف بالجهة والمكان.

(আয়াতটির অপরিহার্য দাবি হলো), আল্লাহ তাআলাকে এমন সকলকিছু থেকে চিরপবিত্র মনে করা, সৃষ্টি যেগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। (যেমন) দিক ও স্থান।[২৯১]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

---

২৮৮. সুরা আনকাবুত, ৬

২৮৯. *আত-তাফসিরুল কাবির*, ২৫/২৯

২৯০. সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮

২৯১. *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া*, ১১১

তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।[২৯২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজি রহ. বলেন,

ظاهر هذه الآية يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات ، وحينئذ يبقى الحق سبحانه وتعالى منزها عن الحيز والجهة ، وإذا ثبت ذلك امتنع كونه الآن في جهة وحيز وإلا لزم وقوع التغير في الذات.

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আরশসহ সকল স্থান ও দিক নস্যাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তখনও বাকি থাকবেন, যিনি স্থান ও দিক হতে চিরপবিত্র। সুতরাং (সকলকিছু ধ্বংসের পর তিনি স্থান ও দিগ্‌বিহীন বাকি থাকবেন) এটা যেহেতু সুসাব্যস্ত হলো, সেহেতু এটাও পরিষ্কার হলো যে, এখনো তিনি কোনো দিক ও স্থানে থাকা অসম্ভব। অন্যথায় তাঁর সত্তার মাঝে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে।[২৯৩]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ﴾

আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানেও (একমাত্র) মাবুদ এবং জমিনেও (একমাত্র) মাবুদ। আর তিনিই প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ।[২৯৪]

ইমাম রাজি রহ. বলেন,

هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء ، لأنه تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض ، فلما كان إلها للأرض مع أنه غير مستقر فيها يجب أن يكون إلها للسماء مع أنه لا يكون مستقرا فيها.

এই আয়াত বড় একটি দলিল যে, আল্লাহ তাআলা আসমানে (বা আসমানের ওপর) অবস্থান করেন না। কেননা আয়াতটির মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর প্রভুত্বের বিষয়টি জমিনের দিকে সম্পৃক্তের মতো আসমানের দিকেও সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং যখন তিনি জমিনে

---

২৯২. সুরা কাসাস, ৮৮
২৯৩. *তাসিসুত তাকদিস*, ৭০
২৯৪. সুরা যুখরুফ, ৮৪

অবস্থান ছাড়াই জমিনের মাবুদ, তখন অবশ্যক হচ্ছে (এই আকিদা রাখা যে), তিনি আসমানের মাবুদ, কিন্তু তিনি আসমানে অবস্থান করেন না।[২৯৫]

খ. হাদিস

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شيءٌ.

হে আল্লাহ! আপনিই আদি। আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না। আপনিই অন্ত। আপনার পরেও কিছু নেই। আপনিই ব্যক্ত। আপনার ঊর্ধ্বে কিছু নেই। আপনিই গুপ্ত। আপনার নিচে কিছু নেই।[২৯৬]

উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম বাইহাকি রহ. লেখেন,

وإذا لم يكن فوقه شيئ ولا دونه شيئ لم يكن في مكان.

যদি তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) ঊর্ধ্বে কিছু না থাকে এবং তাঁর নিচেও কিছু না থাকে, তাহলে তিনি কোনো স্থানে নেই।[২৯৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

বান্দা সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তখন তোমরা অধিক মাত্রায় দোয়া করতে থাকো।[২৯৮]

উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বদর ইবনুস সাহিবের বক্তব্য নকল করে ইমাম সুয়ুতি রহ. লেখেন,

في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى.

হাদিসটিতে আল্লাহ তাআলা থেকে দিককে নাকচের দিকে ইশারা করা হয়েছে।[২৯৯]

---

২৯৫. *আত-তাফসিরুল কাবির*, ২৭/১৯৮
২৯৬. *মুসলিম*, ২৭১৩
২৯৭. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৩৭৩
২৯৮. *নাসায়ি*, ১১৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ.

(একমাত্র) আল্লাহই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কোনোকিছুই ছিল না।[৩০০]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদিস থেকে বোঝা যায়, মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন। আগুন-পানি, আকাশ-বাতাস, জিন-ইনসান, ফেরেশতা-দানব কিংবা আরশ-জমিন কিছুই তখন ছিল না। এমনকি ছিল না কোনো স্থান, দিক বা সময়ও। এরপর তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনি এতসবকিছু সৃষ্টি করলেন। কাজেই স্থান সৃষ্টির পূর্বে যেমন তিনি স্থানবিহীন থাকতে সক্ষম ছিলেন, তেমনই এখনো তিনি স্থানবিহীনই থাকতে সক্ষম।

গ. ইজমা

১. ইমাম আবদুল কাহির বাগদাদি রহ. বলেন,

وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ، ولا يجري عليه زمان ، على خلاف قول من زعم من الهشامية والكرامية أنه مماس لعرشه ، وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا له ، وقال أيضا: قد كان ولا مكان ، وهو الآن على ما كان.

এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, কোনো স্থান তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে) বেষ্টন করতে পারে না। এমনকি কোনো সময়ও তাঁর ওপর অতিবাহিত হয় না। (আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা) হিশামিয়া ও কাররামিয়াদের আকিদার বিপরীত। (কেননা তারা বলে,) তিনি আরশের সংস্পর্শে রয়েছেন। অথচ আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আরশকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত প্রকাশের জন্য, তাঁর স্থানের জন্য নয়। তিনি এও বলেন, অবশ্যই তিনি তখনও ছিলেন, (যখন কোনো) স্থান ছিল

---

২৯৯. *শরহুস সুয়ুতি লি-সুনানিন নাসায়ি*, ১/৫৭৬
৩০০. *বুখারি*, ৩১৯১

না। এখনো তিনি তেমনই আছেন, (সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩০১]

২. ইমাম জুয়াইনি রহ. বলেন,

مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري – تعالى عن قولهم – متحيز مختص بجهة فوق، تعالى الله عن قولهم.

সকল আহলে হকের মাজহাব হলো, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোনো স্থান ও দিকে অবস্থান করা থেকে চিরপবিত্র। কিন্তু কাররামিয়া ও কিছু হাশাবির মতে আল্লাহ তাআলা ওপরের দিকে অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এ সকল কথা থেকে চিরপবিত্র।[৩০২]

৩. ইবনে হাজাম জাহেরি রহ. বলেন,

أما القول الثالث في المكان: فهو أن الله تعالى لا في مكان ولا في زمان أصلا وهو قول الجمهور من أهل السنة وبه نقول.

স্থান বিষয়ে তৃতীয় কথা হলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা না কোনো স্থানে আছেন, আর না তিনি কোনো সময়ে আবদ্ধ। এটাই অধিক সংখ্যক আহলে সুন্নাতের মত এবং আমিও এটাই বলি।[৩০৩]

ঘ. চার মাজহাব

১. হানাফি মাজহাব

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

تعالى عن الحدود والغايات ... لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সীমা, পরিধি থেকে চিরপবিত্র। সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয়টি দিক তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে) বেষ্টন করতে পারে না।[৩০৪]

---

৩০১. *আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক*, ২৮৭
৩০২. *আল-ইরশাদ*, ২১
৩০৩. *আল-ফিসাল ফিল মিলাল*, ২/৯৮

ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ. বলেন,

والله – تعالى – يتعالى عن المكان ، كان ولا مكان فهو على ما كان.

আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র। যখন স্থান ছিল না তখনও তিনি ছিলেন। সুতরাং তিনি (এখনো) তেমন আছেন, (স্থান সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩০৫]

কাসানি রহ. বলেন,

وهو الآن على ما كان.

আর তিনি এখনো তেমন আছেন, (সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩০৬]

নাসাফি রহ. বলেন,

لأنه تعالى كان ولا مكان ، فهو على ما كان قبل خلق المكان ، لم يتغير عما كان.

আর যখন স্থান ছিল না তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন, ফলে তিনি এখনো তেমন আছেন, স্থান সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন। তিনি পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হননি।[৩০৭]

জাইনুদ্দিন রাজি রহ. বলেন,

والعرش ليس له مكان وقرار ، فمن قال : إن العرش له مكان وقرار فهو كذب وافترى ، فلو كان له إليه فقبله أين كان ، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا ، والله تعالى ليس على مكان ولا في مكان ولا في الجهات ولا في الزمان ، بل كان ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان.

আরশ আল্লাহ তাআলার স্থান ও অবস্থানের জায়গা নয়। সুতরাং কেউ যদি বলে, নিশ্চয় আরশ তাঁর স্থান ও অবস্থানের জায়গা, তাহলে সে

---

৩০৪. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৫
৩০৫. *তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ*, ২/১০৪
৩০৬. *আল-মুতামাদ মিনাল মুতাকাদ*, ৬২
৩০৭. *তাফসিরুন নাসাফি*, ২/৩৫৭

মিথ্যা বলল এবং মিথ্যা অপবাদ দিলো। কেননা তিনি যদি (আরশের) মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে (প্রশ্ন আসবে, আরশ সৃষ্টির পূর্বে) তিনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ তাআলা এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো স্থানের ওপরে বা মাঝে নেই এবং নেই তিনি বিভিন্ন দিকে। তিনি কোনো সময়ে আবদ্ধ নন, বরং তিনি তখনও ছিলেন, যখন ছিল না কোনো স্থান ও সময় আর তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩০৮]

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في زمان من الأزمنة ، لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات ، وهو سبحانه كان موجودا في الأزل ولم يكن معه شيئ من الموجودات.

আল্লাহ তাআলা না কোনো স্থানে আছেন, না তিনি কোনো সময়ে আবদ্ধ, কেননা স্থান ও সময় তো সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আজালে আল্লাহ তাআলার সাথে বিদ্যমান সৃষ্টির কোনোকিছুই ছিল না।[৩০৯]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থান

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

لو قيل : أين الله تعالى ؟ قيل له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق ، كان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيئ، وهو خالق كل شيئ.

যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা কোথায়? তাহলে বলা হবে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে (যখন) কোনো স্থান ছিল না, তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তিনি তখনও ছিলেন, যখন 'আইনা' (মানে 'কোথায়') শব্দটি (বলার মতো কিছু) ছিল না এবং ছিল না কোনো সৃষ্টি ও বস্তু। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন সকলকিছুকে।[৩১০]

---

৩০৮. *শারহু বাদয়িল আমালি*, ২০১
৩০৯. *শারহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার*, ৮৯
৩১০. *আল-ফিকহুল আবসাত*, ৯৬

ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন,

نقر بأن الله تعالى على العرش استوى ، من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه ، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالَم وتدبيره كالمخلوقين ، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

আমরা এটা স্বীকার করি যে, আরশের প্রতি কোনোরূপ মুখাপেক্ষিতা এবং আরশের ওপর ওঠা ও অবস্থান গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলা আরশে ইসতাওয়া। কোনোপ্রকার মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষণকারী। সৃষ্টিজীবের মতো যদি মুখাপেক্ষীই হতেন, তবে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও তা পরিচালনায় তিনি সক্ষম হতেন না। (একইভাবে) আরশের ওপর বসা, ওঠা ও অবস্থানের মুখাপেক্ষীও যদি হতেন তিনি, তাহলে (প্রশ্ন জাগে,) আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন? কাজেই তিনি এ সবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ও পবিত্র।[৩১১]

সংক্ষিপ্তভাবে বললে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এখানে চারটি বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য—

১. ﴿ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾—এই আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখা। তবে اسْتَوٰى-এর অর্থ বসা, অবস্থান করা ও ওঠা নয়।

২. মাখলুক যেমন আবিষ্কার ও পরিচালনায় অনেককিছুর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তেমন নন। তিনি কখনো কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। না সৃষ্টির পূর্বে, না পরে।

৩. সৃষ্টির পূর্বে যেমন আল্লাহ তাআলা কোনো স্থান ও আরশের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তেমনই সৃষ্টির পরেও তিনি আরশ ও অন্য কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন।

---

৩১১. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫০-৫১

৪. যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা এখন আরশে অবস্থান করেন। তাহলে প্রশ্ন করা হবে, আরশ সৃষ্টির পর যদি তাঁকে আরশে অবস্থান করতে হয়, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আরশ সৃষ্টির পূর্বে যিনি আরশ ও স্থানবিহীন থাকতে সক্ষম, আরশ সৃষ্টির পরও তিনি আরশ ও অন্যান্য স্থানবিহীন থাকতে সক্ষম।

আবদুল গনি মাইদানি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্য নকল করে লেখেন,

فانظر كيف أجراه على ظاهر التنزيل من غير تأويل مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل.

তুমি দেখো, কীভাবে তিনি (অর্থাৎ আবু হানিফা) কোনো তাবিল ছাড়া যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবেই উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে মহীয়ান সত্তা (আল্লাহ)-এর শানে উপযুক্ত নয় এমন অর্থ থেকে তাঁকে পবিত্র বলেছেন।[৩১২]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নামধারী সালাফিরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর نقر بأن الله تعالى على العرش استوى—শুধু এটুকু অংশ উল্লেখপূর্বক দাবি করেন যে, তিনিও নামধারী সালাফি আকিদা লালন করতেন। অর্থাৎ তিনিও নাকি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করেন, বা আরশে আছেন বা আরশে উঠলেন ইত্যাদি। নাউজুবিল্লাহ।

২. মালেকি মাজহাব

ক. ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি রহ. বলেন,

ولا نقول إن العرش له قرار، ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان فلما خلق المكان لم يتغير عما كان.

আর আমরা বলব না যে, নিশ্চয় আরশ (আল্লাহ তাআলার) অবস্থান বা ওঠার জায়গা। কেননা তিনি তো তখনও ছিলেন, যখন স্থান বলতে

---

৩১২. *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া*, ৭৪

কিছুই ছিল না, ফলে স্থান সৃষ্টির পর তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হননি।[৩১৩]

খ. কুরতুবি রহ. বলেন,

ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها ، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان ، وهو الآن على ما عليه كان.

আর তিনি (আল্লাহ তাআলা) যদিও স্থানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্থান ও সময় সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। অথচ তখন না ছিল কোনো স্থান, আর না ছিল কোনো সময়, সুতরাং তিনি এখনো তেমনই আছেন, (সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩১৪]

৩. শাফেয়ি মাজহাব

ক. গাজালি রহ. বলেন,

تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان ، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان.

কোনো স্থান আল্লাহ তাআলাকে বেষ্টন করা এবং সময় তাঁকে আবদ্ধ করা থেকে তিনি চিরপবিত্র। তিনি তো সময় ও স্থান সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। কাজেই তিনি এখনো তেমন আছেন, (সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩১৫]

খ. ইবনে জামায়া রহ. বলেন,

كان الله ولا زمان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان.

যখন কোনো সময় ও স্থান ছিল না তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন। সুতরাং তিনি এখনো তেমন আছেন, (সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৩১৬]

---

৩১৩. *আল-ইনসাফ*, ১১৩

৩১৪. *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ২১/১২৬

৩১৫. *ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন*, ১০৬

৩১৬. *ইজাহুদ দালিল*, ১৩৩

৪. হাম্বলি মাজহাব

ক. ইবনুল জাওজি রহ. বলেন,

الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله عز وجل لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا بالانتقال.

আমাদের এই আকিদা রাখা ওয়াজিব যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা খণ্ডবিখণ্ড নয় এবং তাঁকে কোনো স্থান বেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি রূপান্তর ও স্থানান্তরও হন না।[৩১৭]

খ. আবদুল বাকি আল-মাওয়াহিবি রহ. বলেন,

يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه ، فكان ولا مكان ثم خلق المكان ، وهو كما كان قبل خلق المكان.

আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টি থেকে পৃথক, বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা ওয়াজিব। তিনি তখনও ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। অতঃপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ তিনি এখনো তেমন আছেন, স্থান সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন।[৩১৮]

৬. যুক্তি

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি আপনার সমীপে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন যে, আমরা যা-কিছু দেখি বা না দেখি, এ সবকিছু সৃষ্ট এবং সবকিছুর একটা শুরু আছে, একটা সময় এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না?

যদি বলেন যে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।

তাহলে বলব, আচ্ছা বলুন তো, স্থান ও দিক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা ঠিক কোন স্থানটিতে বা দিকটিতে ছিলেন?

আপনার উত্তর যদি হয়, তিনি তখন অমুক স্থান বা দিকটিতে ছিলেন।

---

৩১৭. দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ, ৪২

৩১৮. *আল-আইনু ওয়াল-আসার ফি আকায়িদি আহলিল আসার*, ৩৫

তাহলে এটি আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, আল্লাহ তাআলা যেমন অনাদি, ঠিক ওই স্থান ও দিকটিও তেমনই অনাদি। নাউজুবিল্লাহ! এই বিশ্বাস আমাদের ঈমানের সাথেই সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত ছাড়া বাকি সবকিছুই সৃষ্ট।

আর যদি আপনার উত্তর হয় যে, না, তিনি তখন কোনো স্থানে ছিলেন না।

তাহলে বলব, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যে সত্তা স্থানবিহীন ছিলেন, সে সত্তাকেই আপনি স্থান সৃষ্টির পর কীভাবে স্থানবিহীন থাকতে অক্ষম মনে করেন? ঠিক কোন যুক্তির আলোকে আপনি তাঁকে স্থানের মুখাপেক্ষী মনে করেন? নাউজুবিল্লাহ!

পক্ষান্তরে সৃষ্টির পর কোনো স্থানে থাকা, এটা তো তাঁর সত্তার মাঝেও পরিবর্তন সাব্যস্ত করছে। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের একটি মৌলিক আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাতের মাঝে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না, বরং তিনি খোদ সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করেন। লামিশি রহ. বলেন,

> ولأن في القول بالمكان قولا بقدم المكان ، أو بحدوث الباري تعالى ، لأنه لو كان لم يزل في المكان لكان المكان قديما أزليا ، ولو كان ولا مكان ، ثم خلق المكان وتمكن فيه لتغير عن حاله ، ولحدثت فيه صفة التمكن بعد أن لم تكن وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو على الله محال.

> (আল্লাহ তাআলা) স্থানে আছেন বলা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মতো স্থানকেও অনাদি বলা হয়, অথবা (স্থান সৃষ্টির মতো) তাঁকেও সৃষ্ট বলা হয়। কেননা তিনি যদি শুরু থেকে স্থানে অবস্থান করেন, তাহলে তো সে স্থানও তাঁর মতো অনাদি, সৃষ্ট নয়। অথচ (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র) তিনিই ছিলেন, তখন কোনো স্থান ছিল না। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করলেন। এখন যদি তিনি স্থানে অবস্থান করেন, তাহলে তো তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। এবং নতুনভাবে (স্থানে) অবস্থানের একটি সিফাত ও গুণ তাঁর মাঝে সৃষ্টি হলো, যে সিফাত পূর্বে তাঁর ছিল না। সৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করা সৃষ্টির লক্ষণ, ফলে এ সবকিছু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।[৩১৭]

---

৩১৭. *আত-তামহিদ*, ৯২

আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

ولأن الله كان قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يقال: انتقل إلى العرش ، لأن الانتقال من صفات المخلوقين وإمارات المحدثين ، والله تعالى منزه عن ذلك . ولأن من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مثل العرش والعرش أكبر منه ، أو هو أكبر من العرش ، وأيما كان فقائله كافر ، لأنه جعله محدودا.

আল্লাহ তাআলা আরশ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, সুতরাং এটা বলা জায়েজ নেই, তিনি (আরশ সৃষ্টির পর) আরশে স্থানান্তরিত হয়েছেন। কেননা স্থানান্তর হলো সৃষ্টির গুণ ও লক্ষণ। আর তিনি এসব থেকে চিরপবিত্র। আর যে বলবে, তিনি আরশে উঠলেন বা অবস্থান করেন, (এই কথা তিনটি অবস্থার যেকোনো একটিকে অবশ্যক করবে), হয় তিনি আরশের সমান হবেন বা আরশ তাঁর থেকে বড় হবে বা তিনি আরশ থেকে বড় হবেন। তিনটির যেকোনো একটি বললেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা (এ কথা বলে) সে আল্লাহকে একটা সীমায় আবদ্ধ করে ফেলছে।[৩২০]

এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত বলেন, আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তিনি তেমনই আছেন। সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন স্থানবিহীন থাকতে সক্ষম ছিলেন, সকলকিছু সৃষ্টির পরেও তিনি স্থানবিহীন থাকতে সক্ষম। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

وهو أن الدلائل الواضحة قد قامت على أن البارى تعالى ليس بجسم ولا محتاجًا إلى مكان يحله ويستقر فيه؛ لأنه تعالى قد كان ولا مكان وهو على ما كان، ثم خلق المكان فمحال كونه غنيا عن المكان قبل خلقه إياه، ثم يحتاج إليه بعد خلقه له، هذا مستحيل.

বহু স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট নন। অবস্থান ও ওঠার জন্য তিনি কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন, কেননা যখন স্থান ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন আর তিনি এখন

---

৩২০. *বাহরুল কালাম*, ৫১/৫২

তেমনই আছেন। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেন। যিনি স্থান সৃষ্টির পূর্বে স্থানের অমুখাপেক্ষী ছিলেন, তিনি স্থান সৃষ্টির পর স্থানের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবেন, এটা অসম্ভব।[৩২১]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক আকিদা ও প্রকৃত সালাফদের আকিদা গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সালাফি আলেম শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া হাফি. একটি আলোচনায় বলছেন, আল্লাহ তাআলাকে আরশের ওপর বিশ্বাস করবেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর নেই, সেই ব্যক্তি কাফের, তার পেছনে সালাত হবে না। নাউজুবিল্লাহ।

তার মানে কি ইমাম আবু হানিফা, তাহাবি, আবু বকর বাকিল্লানি, আবদুল কাহির বাগদাদি, ইবনে হাজাম জাহেরি, কুরতুবি, গাজালি, জুয়াইনি, ইবনুল জাওজি, রাজি, কাসানি, ইবনে বাত্তাল, মোল্লা আলি কারির মতো হাজার-লক্ষ ইমাম কাফের ছিলেন? তাদের সালাত হয়নি? তাদের পেছনে যারা সালাত পড়েছেন তাদের সালাতও হয়নি? নাউজুবিল্লাহ।

এটাই হচ্ছে নামধারী সালাফি আকিদা অনুসরণের চূড়ান্ত ফলাফল। এই আকিদা একটা সময় আপনাকে আপনার চারপাশ ও ইসলামি ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আপনি শুধু আপনার চারপাশে কাফের দেখবেন। যুগে যুগে কুরআন ও হাদিসের খাদেমদেরকে আপনার নিকট মনে হবে কাফের, তারা কুরআন-হাদিস বোঝেনি, তারা কুরআন-হাদিসকে বিকৃত করেছে, একমাত্র নামধারী সালাফিরাই কুরআন-হাদিস সঠিকভাবে বুঝেছে এবং তারাই সঠিকভাবে অনুসরণ করছে। নাউজুবিল্লাহ। এই একটি আকিদাই যথেষ্ট হাজার-লক্ষ-কোটি মুসলিমকে কাফের বানিয়ে দেওয়ার জন্য। এই একটি আকিদাই যথেষ্ট মুসলিমদের মাঝে পরস্পর বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য।

---

৩২১. *শারহুল বুখারি*, ১০/৪৬৭

আল্লাহ তাআলা শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া হাফি.-কে সহিহ বুঝ দান করুন। বাড়াবাড়ি কখনো ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না, তাই বাড়াবাড়ি পরিহার করে শায়েখ ও তার অনুসারীদের আল্লাহ তাআলা ইসলামের সঠিক পথে এবং প্রকৃত সালাফদের পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হুলুলি ও দেহবাদী আকিদা নিয়ে কিছু কথা

হুলুলি আকিদা

যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সর্বত্র এমনভাবে বিরাজমান যে, তাঁর সত্তা ও সৃষ্টির সত্তা মিশে একাকার, চিনি যেমন পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়।

তাদের মূলনীতি হলো, কুরআন-হাদিসের বক্তব্যে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা।

হুলুলিদের দাবি হচ্ছে—

১. আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন। দলিল—

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন।[৩২২]

২. তিনি আসমানেও আছেন। দলিল—

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾

তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ তার থেকে, যিনি আসমানে আছেন?[৩২৩]

৩. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনে আছেন। দলিল—

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

তিনিই ওই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনে আছেন।[৩২৪]

---

৩২২. সুরা আরাফ, ৫৪
৩২৩. সুরা মুলক, ১৬
৩২৪. সুরা আনআম, ৩

৪. তিনি প্রতিটি মানুষের সাথে সাথে আছেন। দলিল—

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾

আর তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।[৩২৫]

৫. তিনি সকল দিকেই আছেন। দলিল—

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা।[৩২৬]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও এ জাতীয় সকল আয়াতকে হুলুলিরা শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে এবং বলে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টির সত্তা একত্রে মিশে একাকার হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

দেহবাদী আকিদা[৩২৭]

দেহবাদীদের আকিদা হলো, সত্তাগতভাবে আল্লাহ তাআলা শুধু আরশে আছেন। তাদের ও হুলুলিদের মূলনীতি অভিন্ন অর্থাৎ আয়াত ও হাদিসের বক্তব্যে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে শুধু শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা।

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

صانع العالم ليس بمتمكن في مكان، وعند المشبهة والمجسمة والكرامية متمكن على العرش لقوله تعالى (الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ).

বিশ্বজগতের স্রষ্টা কোনো স্থানে অবস্থান করেন না। (কিন্তু) সাদৃশ্যবাদী, দেহবাদী ও কাররামিয়াদের নিকট (আল্লাহ তাআলা)

---

৩২৫. সুরা হাদিদ, ৪

৩২৬. সুরা বাকারা, ১১৫

৩২৭. যারা আয়াত ও হাদিসের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ ধরে আল্লাহ তাআলার জন্য স্থান, কাল, পাত্র এবং দেহ ও দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে এবং তার উপমা ও ধরন উল্লেখ করে, তাদের দেহবাদী বলা হয়। অনুরূপ যারা আয়াত ও হাদিসের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ ধরে তাঁর জন্য স্থান, কাল, পাত্র এবং দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে কিন্তু উপমা দেয় না এবং ধরন অজ্ঞাত বলে, সালাফরা তাদেরকেও দেহবাদী বলতেন। উল্লিখিত বিভিন্ন দলিল থেকে আশা করছি বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ।

আরশে অবস্থান করেন। দলিল তাঁর এই কথা, 'রহমান আরশে ইসতাওয়া'।[৩২৮]

কামালুদ্দিন মাকদিসি রহ. বলেন,

والحشوية – وهم المجسمة – يصرحون بالاستقرار على العرش ، وتمسكوا بظواهر ، منها قوله تعالى : الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ.

আর হাশাবি সম্প্রদায়ই হলো দেহবাদী। যারা পরিষ্কার আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আরশের ওপর ওঠা বা অবস্থানের দাবি করে। এ ক্ষেত্রে কিছু আয়াত-হাদিসের বাহ্যিক অর্থকে তারা দলিল হিসাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো 'রহমান আরশে ইসতাওয়া'।[৩২৯]

দেহবাদীদের দাবি

আল্লাহ তাআলা শুধু আরশে আছেন। দলিল—

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

তারপর তিনি আরশে উঠলেন।[৩৩০]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾

তোমরা কি তাঁর থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ, যিনি আকাশের (ওপর) আছেন?[৩৩১]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾

তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।[৩৩২]

---

৩২৮. *আল-ইতিমাদ ফিল-ইতিকাদ*, ১৬৪
৩২৯. *আল-মুসামারা*, ১৮৫
৩৩০. সুরা আরাফ, ৫৪
৩৩১. সুরা মুলক, ১৬
৩৩২. সুরা নাহল, ৫০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

> যারা জমিনে আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো। তবেই যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৩৩৩]

অন্য হাদিসে এসেছে,

سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ جَارِيَةً ، أَيْنَ اللهُ ؟ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ.

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানের (ওপর)।[৩৩৪]

হুলুলি ও দেহবাদী আকিদার মূলনীতি এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে আয়াতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থের ওপরই ঈমান নিয়ে আসতে হবে। তবে উভয়ের মাঝে মূলনীতির প্রয়োগ ও অনুসরণের দিক থেকে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। যেমন হুলুলিগণ, তারা তাদের মূলনীতি পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে দেহবাদীরা সহিহ আকিদা, সালাফি আকিদা বললেও মূলত তাদের আকিদার শুরু-শেষ বিকৃতি ও জালিয়াতিতে ভরপুর।

তারা শুধু ওপরের সাথে সম্পৃক্ত সকল আয়াত-হাদিসকে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে। ওপরের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত-হাদিসের ক্ষেত্রে তারা অন্য কোনো ইমামের কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে অন্য যে-সকল আয়াত-হাদিস আল্লাহ তাআলার ঊর্ধ্বাসন ছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির সাথে থাকাকে সাব্যস্ত করে, সে সকল আয়াত-হাদিসের ক্ষেত্রে তারা শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন ইমামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করে থাকে।

মজার বিষয় হলো, এ সকল আয়াত-হাদিসের ক্ষেত্রে আপনি যদি তাদেরকে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কথা বলেন, উত্তরে তারা বলবে, কুরআন-হাদিস কি আপনি বেশি বোঝেন, না অমুক অমুক ইমাম বেশি বুঝেছেন? আবার যদি আপনি তাদের দলিলের ব্যাখ্যা অন্য কোনো ইমাম থেকে দেন,

৩৩৩. *তিরমিজি*, ১৯২৪
৩৩৪. *মুসলিম*, ৫৩৭

তখন তারা বলবে, আমি দলিল দিচ্ছি কুরআন থেকে, আর আপনি দিচ্ছেন ইমাম থেকে! আপনি তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইমামকে রব বানিয়ে ফেলেছেন, নাউজুবিল্লাহ। এককথায় বলা যায়, যখন যাকে যে পদ্ধতিতে বিভ্রান্ত করা যায়, তখন তারা সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকে।

কিছু উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে যাতে বিষয়টি বুঝতে আরও সুবিধা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

তিনিই ওই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহে ও জমিনে আছেন।[৩৩৫]

আপনি কোনো দেহবাদীকে এই আয়াতটা দেখিয়ে বললেন যে, উল্লিখিত আয়াত থেকে তো বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আসমানেও আছেন, অনুরূপ জমিনেও আছেন।

দেহবাদী তখন কী করবে জানেন? আপনাকে তখন সে নিয়ে যাবে *তাফসিরে ইবনে কাসিরে* এবং বলবে, দেখুন ইবনে কাসির রহ. এখানে কী লিখেছেন?

> اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال ، بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين – تعالى عن قولهم علوا كبيرا - بأنه في كل مكان ، حيث حملوا الآية على ذلك.
>
> এ আয়াতটি নিয়ে মুফাসসিরগণ ইখতেলাফ করেছেন। তবে জাহমিয়াগণ যে আয়াতটিকে 'আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান' এই অর্থে নিয়েছে সেটি সকলে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন কথা থেকে চিরপবিত্র।[৩৩৬]

এবার যদি আপনি তাদের দলিলের জবাবে পেশ করেন যে, ইমাম সুয়ুতি রহ. তো আপনাদের এই দলিলের তাফসিরে লিখেছেন,

> أَأَمِنتُم (مَّن فِي السَّمَاءِ) سلطانه وقدرته.
>
> তোমরা কি তাঁর থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ, আসমানে যার রাজত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে।[৩৩৭]

---

৩৩৫. সুরা আনআম, ৩

৩৩৬. *ইবনে কাসির*, ৩-৫২১

৩৩৭. *তাফসিরে জালালাইন*, সুরা মুলক, ১৬

ইমাম কুরতুবি রহ. লেখেন,

> اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة ، محدثهم ، وفقيههم ، ومتكلمهم ، ومقلدهم ، ونظارهم ، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى (في السماء) كقوله : أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ، ليست على ظاهرها وإنها متأولة عند جميعهم.

> জেনে রাখো, সকল মুসলিম, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুতাকাল্লিম, মুকাল্লিদ, বিজ্ঞ, কারও মধ্যেই এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই যে, (في السماء) 'আসমানে' বলে যত আয়াত আছে, যেমন أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ—এ সকল আয়াত বাহ্যিক অর্থে নয়, বরং সকলের নিকট এ সকল আয়াত তাবিল বা ব্যাখ্যাযোগ্য।[৩৩৮]

আপনি যদি তাদের দলিলের এ ব্যাখ্যাটা ইমাম কুরতুবি ও ইমাম সুয়ুতি থেকে তুলে ধরেন, তখন তারা বলবে, আমি আপনাকে দলিল দিচ্ছি কুরআন থেকে, আর আপনি বলছেন ইমামের কথা? আপনি তো আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছেন ইমামদেরকে।

অনুরূপ তাদের আরেকটি দলিল,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾

তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।[৩৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জামায়া রহ. বলেন,

> اعلم أن لفظة "فوق" في كلام العرب تستعمل بمعنى الحيز العالي ، وتستعمل بمعنى القدرة وبمعنى الرتبة العلية ... إنما يخاف الخائف من هو أعلى منه رتبة ومنزلة وأقدر عليه منه ، فمعناه : يخافون ربهم القادر عليهم القاهر لهم ... أن المراد بالفوقية في الآيات : القهر والقدرة والرتبة ... لا فوقية المكان له.

---

৩৩৮. *আল-মুফহিম*, ২/১৪৪

৩৩৯. সুরা নাহল, ৫০

জেনে রাখো, আরবদের কথায় فوق তথা 'ওপর' শব্দটা উঁচু স্থানের অর্থে ব্যবহার হয়। আবার ক্ষমতা ও উচ্চ মর্যাদার অর্থেও ব্যবহার হয়। ভীত ব্যক্তি তার থেকে স্তর, মর্যাদা ও ক্ষমতায় বড় ব্যক্তিকে ভয় করে থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, 'তারা তাদের ওই প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী।' এখানকার আয়াতসমূহে 'ওপর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও মর্যাদা। আল্লাহর জন্য এখানে স্থানের উচ্চতা উদ্দেশ্য নয়।[৩৪০]

উল্লিখিত আয়াতের এই সঠিক ব্যাখ্যাটি তাদের নিকট তুলে ধরলে তারা বলবে, আমি আপনাকে দলিল দিচ্ছি কুরআন থেকে আর আপনি দিচ্ছেন ইমামের কথা?

তাদের আরেকটি দলিল দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

যারা জমিনে আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো। তবেই যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৩৪১]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লা-মাজহাবি আলেম শায়েখ মুবারকপুরি রহ. লেখেন,

(يرحمكم من في السماء) ... المراد من سكن فيها وهم الملائكة فإنهم يستغفرون للمؤمنين.

যারা আসমানে আছেন, তারা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন—এখানে যারা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানে বসবাস করা ফেরেশতাগণ। কেননা তারা মুমিনদের জন্য ইসতেগফার করেন।[৩৪২]

তাদের আরও একটি দলিল খেয়াল করুন,

سأَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّمَ جَارِيَةً ، أَيْنَ الله ؟ فَقَالَتْ فِي السَّماءِ.

---

৩৪০. *ইজাহুদ দালিল*, ১৩৮/১৩৯

৩৪১. *তিরমিজি*, ১৯২৪

৩৪২. *তুহফাতুল আহওয়াজি*, ৫/৩৮২, হাদিস : ১৯২৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিলো, আসমানে।[৩৪৩]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

أين الله ؟ هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع الجارية على قدر فهمها ، إذا أراد أن يظهر منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبد الأصنام والحجارة التي في الأرض فأجابت بذلك ... و (أين) ظرف يسأل به عن المكان ... وهو لا يصح إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة ، إذ الله تعالى منزه عن المكان ، كما هو منزه عن الزمان ، بل هو خالق الزمان والمكان ولم يزل موجودا ، ولا زمان ولا مكان ، فهو الآن على ما عليه كان ... أن قول الجارية : "في السماء" ليس على ظاهره باتفاق المسلمين ... وأن من حمله على ظاهره فهو ضال من الضالين.

'আল্লাহ কোথায়'—এ প্রশ্নটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীর বুঝ অনুসারে করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দাসী থেকে এটা সাব্যস্ত করা যে, সে মূর্তি ও পাথরপূজারি নয়। আর সেও ঠিক ওই জবাবটি দিয়েছে। أين (কোথায়) শব্দটি হলো (আরবি ব্যাকরণিক ভাষায়) একটা 'জরফ', যা দ্বারা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। ফলত আল্লাহর ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থের ব্যবহার শুদ্ধ নয়। কেননা তিনি সময়ের মতো স্থান (-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া) থেকে পবিত্র, বরঞ্চ তিনি নিজেই এসবের স্রষ্টা। তিনি তো সে সময়ও ছিলেন, যখন সময়-স্থান কিছুই ছিল না। এখনো তিনি তেমনই আছেন, পূর্বে ঠিক যেমন ছিলেন। কাজেই সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, দাসীর 'আসমানে' কথাটা বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য হবে না, বরং যে এটাকে বাহ্যিক অর্থে মনে করবে সে নিজেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে।[৩৪৪]

ইমাম কুরতুবি রহ. থেকে দাসীর হাদিসের এ ব্যাখ্যা তুলে ধরলে দেহবাদীরা আপনাকে সেই একই 'কাসুন্দি' শোনাবে, আমি আপনাকে দলিল দিচ্ছি

---

৩৪৩. *মুসলিম*, ৫৩৭

৩৪৪. *আল-মুফহিম*, *শরহু মুসলিম*, ২/১৪২-১৪৩-১৪৫

রাসুলের হাদিস থেকে, আর আপনি কিনা আমাকে শোনাচ্ছেন ইমামের কথা! আপনি তো দেখছি রাসুলের পরিবর্তে ইমামকে রব বানিয়ে নিয়েছেন।

এখানে একটি মজার বিষয় কী জানেন? হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের ফলে ইমাম কুরতুবি যাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন, সেই তারাই আজকে এই 'পথভ্রষ্ট আকিদা'-কে সালাফি আকিদা নামে প্রচার করছে। নাউজুবিল্লাহ।

ইমাম নাসিরুদ্দিন বাইজাবি রহ. বলেন,

> وقوله لها : "أين الله ؟ وفي رواية : أين ربك ؟ لم يرد به السؤال عن مكانه فإنه منزه عنه ، والرسول أعلى من أن يسأل أمثال ذلك ، بل أراد به أن يتعرف أنها موحدة أو مشركة لأن كفار العرب كانوا يعبدون الأصنام وكان لكل قوم منهم صنم مخصوص ... فأراد أن يتعرف أنها ما تعبد ، فلما قالت : في السماء وفي رواية : أشارت إلى السماء ، فهم منها أنها موحدة ، تريد بذلك نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام ، لا إثبات السماء مكانا له ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীকে 'আল্লাহ কোথায়' বা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী 'তোমার প্রতিপালক কোথায়' বলা দ্বারা নবিজির উদ্দেশ্য ছিল না দাসীকে আল্লাহ তাআলার স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা। কেননা তিনি স্থান থেকে পবিত্র। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় প্রশ্ন করা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এতটুকু জানা, দাসী কি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী না মুশরিকা। কেননা আরবের কাফেররা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছিল আলাদা আলাদা মূর্তি... তাই নবিজির উদ্দেশ্য ছিল, সে কীসের ইবাদত করে তা জানা।

যখন দাসী বলল, 'আসমানে,' বা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী 'আসমানের দিকে ইশারা করল', তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝেছেন সে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী। এ কথা বলে দাসী মূর্তি নামক জমিনের উপাস্যগুলোর উপাসনাকে নাকচ করেছে। আল্লাহ তাআলার জন্য

আসমানকে স্থানরূপে সাব্যস্ত করেনি। বস্তুত জালেমরা যা বলে, তাঁর সত্তা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সমুচ্চ।[৩৪৫]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> حكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه مما يقتضي التشبيه.
>
> (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীকে মুমিনা হুকুম দিয়েছেন এই আশঙ্কায় যে, সে আল্লাহর অস্তিত্বকেই নাকচ করে দিতে পারে, (কেননা যে-সকল শব্দ) সাদৃশ্য বোঝায়, তা থেকে (আল্লাহ তাআলাকে) চিরপবিত্র মনে করা অপরিহার্য, (এটার ক্ষেত্রে) তার বুঝের কমতি ছিল।[৩৪৬]

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

> وأما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عند إشارة الأمة إلى السماء بكونها مؤمنة فباعتبارأنها يظن بها أنها من عبدة الأوثان فبإشارتها إلى السماء علم أن معبودها ليس من الأصنام.
>
> দাসী আসমানের দিকে ইশারা করার সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুমিনা বলার কারণ হচ্ছে, তিনি ধারণা করেছিলেন সে মূর্তিপূজারি। আসমানের দিকে ইশারা দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর মাবুদ মূর্তি নয়।[৩৪৭]

তাদের আরও একটি দলিল, দোয়ায় দুই হাত ওপরে ওঠানো দ্বারা নাকি এটা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তাআলা ওপরে আছেন। অথচ ইমাম কাজি ইয়াজ রহ. এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন যে,

> لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها ، كذلك لم يدل التوجه إلى السماء والإشارة إلى السماء على أن الله سبحانه فيها.

---

৩৪৫. *তুহফাতুল আবরার*, ২/৩৯৫

৩৪৬. *ফাতহুল বারি*, ১৩-৪৭৮

৩৪৭. *মারতাবাতুল উজুদ ও মানজিলাতুশ শুহুদ*, ১৩৯; *মাজমুআতু রাসায়িলি আলি কারি*, ৪/১৩৯

কিবলাঅভিমুখী হওয়া দ্বারা যেমন এটা প্রমাণ হয় না যে, আল্লাহ তাআলা কিবলার দিকে আছেন, তেমনই আসমান অভিমুখী হওয়া এবং সেদিকে ইশারা দ্বারাও এটা প্রমাণ হয় না যে, আল্লাহ আসমানে আছেন।[৩৪৮]

ইমাম নববি রহ. আরও চমৎকার বলেছেন,

وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة القبلة ، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين ، كما أن الكعبة قبلة المصلين.

নামাজি যেমন কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করেন, দোয়াকারীও তেমনই আসমানমুখী হয়ে তাঁর (আল্লাহর) নিকট প্রার্থনা করে। এর মানে এটা নয় যে, (আল্লাহ) আসমানে আছেন, যেমন তিনি নেই কিবলার দিকেও, বরং এগুলোর অভিমুখী হওয়ার কারণ হচ্ছে, কাবা যেমন নামাজিদের কিবলা, আসমান তেমনই দোয়াকারীদের কিবলা।[৩৪৯]

কামালুদ্দিন বায়াজি রহ. বলেন,

بأن رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء ليس لكونه تعالى فوق السماوات العلى ، بل لكونها قبلة الدعاء ، إذ منها يتوقع الخيرات ويستنزل البركات ، لقوله تعالى : وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

দোয়ার সময় আসমানের দিকে হাত উত্তোলনের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহের ওপরে আছেন। (আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করা হয়) কেননা তা হলো দোয়াকারীর কিবলা। সেখান থেকেই সে বিভিন্ন কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যাশা করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾

---

৩৪৮. *ইকমালুল মুলিম*, ২/৪৬৫
৩৪৯. *আল-মিনহাজ*, ৫/৩৩

আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং তোমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা করা হয় তা।[৩৫০]

তাদের আরও একটি দলিল, **হজরত যাইনাব রা.-কে সাত আসমানের ওপর থেকে বিবাহ দেওয়া।**[৩৫১]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. হাদিসটির ব্যাখ্যায় লেখেন,

قال السهيلي : قوله : "من فوق سبع سماوات" معناه أن الحكم نزل من فوق ، قال ومثله قول زينب بنت جحش "زوجني الله من نبيه من فوق سبع سماوات" أي نزل تزويجها من فوق ، قال ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه.

সুহাইলি বলেন, 'সাত আসমানের ওপর থেকে' কথাটির অর্থ হচ্ছে ওপর থেকে বিবাহের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপ যাইনাব বিনতে জাহশের কথা 'সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ আমাকে তাঁর নবির সাথে বিবাহ দিয়েছেন,' (এই কথার অর্থ হচ্ছে) তাঁর বিবাহের হুকুম ওপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, 'ওপর' শব্দকে আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী অর্থে তাঁর গুণ হিসাবে উল্লেখ করা যাবে, কিন্তু 'ওপর' শব্দকে (তাঁর সাথে) এমন অর্থে নেওয়া যাবে না, যা (তাঁকে) সীমায় আবদ্ধ হওয়া বোঝাবে (এবং) যা তাশবিহ ও উপমার দিকে নিয়ে যাবে।[৩৫২]

কাসতাল্লানি রহ. বলেন,

وكانت تقول : إن الله عز وجل أنكحتني به صلى الله عليه وسلم في السماء ،... وذات الله تعالى منزهة عن المكان والجهة ، فالمراد بقولها في السماء الإشارة إلى علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أن محله تعالى في السماء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

---

৩৫০. সুরা জারিয়াত, ২২; *ইশারাতুল মারাম*, ৩৮৫

৩৫১. *বুখারি*, ৭৪২০

৩৫২. *ফাতহুল বারি*, ৭/৫০২

যাইনাব বিনতে জাহশ রা. বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর নবির সাথে আমাকে আসমানে বিবাহ দিয়েছেন... আল্লাহ তাআলার সত্তা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। (হজরত যাইনাব রা.)-এর আসমানে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, (মর্যাদাগতভাবে) সত্তা ও গুণের উচ্চতার দিকে ইশারা করা। 'আসমানে' এই বিবেচনায় বলা হয়নি যে, আসমানে তাঁর অবস্থান। আল্লাহ তাআলা এসব থেকে অনেক উর্ধ্বে।[৩৫৩]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قال الكرماني : قوله "في السماء" ظاهره غير مراد ، إذ الله منزه عن الحلول في المكان ، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات.

কিরমানি বলেন, তার 'আসমানে' বলা কথাটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, কারণ আল্লাহ স্থানে থাকা থেকে পবিত্র। ওপরের দিক অন্যান্য দিক থেকে মর্যাদাবান। ফলে (মর্যাদাগতভাবে) সত্তা ও সিফাতের উচ্চতার দিকে ইশারার জন্য 'ওপর' শব্দটিকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৩৫৪]

তাদের আরও একটি দলিল **ইসরা ও মেরাজ**।

আল্লাহ তাআলা কোনো নবির সাথে সাক্ষাতের জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করা দ্বারা যদি সাব্যস্ত হয় তিনি সেখানে আছেন, তাহলে তো বলতে হবে মেরাজের পূর্বে তিনি তুর পাহাড়ে ছিলেন, কেননা তিনি সেখানে হজরত মুসা আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এর পূর্বে তিনি ফিলিস্তিন ছিলেন, কেননা হজরত ইবরাহিম আ. বলেন,

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ.

আর আমি আমার রবের কাছে যাচ্ছি, অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।[৩৫৫]

---

৩৫৩. *ইরশাদুস সারি*, ১৫/৩৮৯
৩৫৪. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪৯০
৩৫৫. সুরা সাফফাত, ৯৯

আমি আমার রবের কাছে যাচ্ছি বলে তিনি আসমানে যাননি, বরং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত স্থানে গিয়েছেন।

নবিগণ মানুষ হওয়ার কারণে স্থানের মুখাপেক্ষী ছিলেন, ফলে তাদের সাক্ষাতের জন্য আল্লাহ তাআলা ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্ধারণ করেছেন, সুতরাং সাক্ষাতের জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করা দ্বারা তিনি সেখানে আছেন, এটা বোঝায় না। দেহবাদীদের আকিদা যেহেতু তিনি ওপরে আছেন, তাই মেরাজের ঘটনা দ্বারা নিজেদের আকিদার দলিল দেয়, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করে। তাদের আকিদা যদি হতো তিনি তুর পাহাড়ে আছেন, তাহলে হজরত মুসা আ.-এর সাক্ষাৎ দ্বারা দলিল দিত এবং অন্যগুলো ব্যাখ্যা করত। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অবস্থান সকলগুলোর ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। আবু বকর আল-আহসায়ি রহ. বলেন,

> وكذالك عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لا يدل على أن الله تعالى حال فيها ، كما أن خروج موسى عليه السلام إلى الجبل وسماعه لكلام الله عز وجل عنده ، لا يدل أن الله تعالى حال في الجبل.
>
> অনুরূপ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানে আরোহণ করা দ্বারা প্রমাণ হয় না আল্লাহ তাআলা আসমানে আছেন। যেমন হজরত মুসা আ. পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া এবং সেখানে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা দ্বারা প্রমাণ হয় না আল্লাহ তাআলা পাহাড়ে আছেন।[৩৫৬]

তাদের আরও একটি দলিল, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন।[৩৫৭]

হাদিসটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو ، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز ، تعالى الله عن ذلك . قد اختلف في معنى النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة ، تعالى الله عن قولهم.

---

৩৫৬. *মাসলাকুস সিকাত ফি নুসুসিস সিফাত*, ৬৩-৬৪
৩৫৭. *বুখারি*, ১১৪৫

> 'আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন', যারা (আল্লাহ তাআলার জন্য) দিক সাব্যস্ত করে তারা হাদিসটির এই অংশ দ্বারা দলিল দেয়, আর তা হলো ওপরের দিক। অথচ অধিকাংশ আলেম এটাকে অস্বীকার করেছেন। কেননা এমন কথা দ্বারা (আল্লাহ তাআলা) স্থানে থাকা সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি এসব থেকে চিরপবিত্র। 'নুজুল' (অবতরণ) শব্দটির অর্থ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে, তবে একদল অবতরণকে বাহ্যিক ও বাস্তবিক অর্থে গ্রহণ করে। আর তারা হলো মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা থেকে চিরপবিত্র।[৩৫৮]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নামাকে বাহ্যিক ও বাস্তবিক অর্থ নিয়ে ওপরে থাকার আকিদা পোষণ করত গোমরাহ সাদৃশ্যবাদীরা। অথচ আজকে এই গোমরাহ আকিদাকে সালাফি আকিদা, সহিহ আকিদা নামে প্রচার করে আমার সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের পরকালকে বরবাদ করে দিচ্ছে কিছু তথাকথিত শায়েখ। আল্লাহ তাআলা তাদের সঠিক বুঝ দান করুন ও আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।

দেহবাদীদের সকল দলিল-প্রমাণের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের জালিয়াতি, অপব্যাখ্যা। এমনকি সালাফবিরোধী একটা আকিদাকে সালাফি আকিদা নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক করা।

মোটকথা, হুলুলি আকিদা যেমন পথভ্রষ্ট, তেমনই দেহবাদী আকিদাও একটি গোমরাহি আকিদা। উভয় ফেরকার দলিলসমূহের একটি সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে, এমনকি পূর্ববর্তী মুহাক্কিক আলেমগণ যেগুলো স্পষ্ট করে লিখেও গেছেন। তারা মুহাক্কিক আলেমদের সেসব লেখার ধারেকাছেও না ঘেঁষে নতুন করে সেগুলো নিজেদের মতো ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে, ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে, উভয় দলই গোমরাহির অতলে নিমজ্জিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার অবস্থান সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা ও দলিল আমরা পূর্বেই (১৮৫ নং পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছি। তাই এখানে আর পুনরুল্লেখ করছি না। তবে ইমাম নাসাফি, ইমাম গজনবি, ইমাম লামিশির বক্তব্য এবং বুখারির একটি হাদিস ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর একটি

---

৩৫৮. *ফাতহুল বারি*, ৩/৩৫

ব্যাখ্যা উল্লেখ করে এখানে বিষয়টির ইতি টানছি, এতে নামধারী সালাফিদের সালাফ কারা, তাও আশা করছি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

صانع العالم ليس بمتمكن في مكان ، وعند المشبهة والمجسمة والكرامية متمكن على العرش.

বিশ্বজগতের স্রষ্টা কোনো স্থানে অবস্থান করেন না, (কিন্তু) সাদৃশ্যবাদী, দেহবাদী ও কাররামিয়াদের নিকট (আল্লাহ তাআলা) আরশে অবস্থান করেন।[৩৫৯]

ইমাম গজনবি রহ. বলেন,

وإنما قال : (هو مستغن عن العرش وما دونه) نفيا لتوهم الحاجة إلى التمكن على العرش والتحيز في الجهة كما قاله المجسمة.

'তিনি আরশ এবং আরশ ছাড়া অন্য যা-কিছু আছে সব থেকে অমুখাপেক্ষী', (ইমাম তাহাবির এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে,) আল্লাহ তাআলা আরশে বা দিকে থাকা বা অবস্থানের প্রয়োজন রয়েছে, এমন ধারণাকে নাকচ করা। তবে 'দেহবাদীরা' এটা বলে থাকে (অর্থাৎ দেহবাদীদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করেন বা আরশে উঠেছেন বা ওপরে থাকেন)।[৩৬০]

ইমাম লামিশি রহ. বলেন,

وقال كثير من الناس كاليهود والمجسمة والكرامية وغلاة الروافض : إن الله تعالى متمكن في العرش ، وقال بعض المتأخرين منهم : إنه ليس بمتمكن بمكان ، ولكنه في الجهة العليا.

ইহুদি, দেহবাদী, কাররামিয়া এবং কট্টর শিয়াদের অনেকে বলে (বা তাদের আকিদা হচ্ছে), নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন এবং তাদের পরবর্তীদের কেউ কেউ বলে, তিনি কোনো স্থানে অবস্থান করেন না, তবে তিনি ওপরের দিকে আছেন।[৩৬১]

---

৩৫৯. *আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ১৬৪
৩৬০. *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া*, ১৯০
৩৬১. *আত-তামহিদ*, ৯৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা তিনি বলেছেন, নিশ্চয় তার ও কিবলার মাঝে তার প্রতিপালক রয়েছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে।[৩৬২]

হাদিসে উল্লেখিত 'নিশ্চয় তার ও কিবলার মাঝে তার প্রতিপালক রয়েছেন', এ অংশের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন,

وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته.

হাদিসটির মাঝে এমন ব্যক্তির আকিদার খণ্ডন নিহিত রয়েছে, যে বিশ্বাস করে, সত্তাগতভাবে আল্লাহ তাআলা শুধু আরশে রয়েছেন।[৩৬৩]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের কেউ কেউ শুধু সাধারণ মানুষদের বোঝানোর সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান কথা বলেন, কিন্তু তারা কেউ হুলুল বা সৃষ্টি-স্রষ্টা মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থে বলেননি এবং তারা এই আকিদা পোষণও করতেন না।

সাধারণ মানুষের জন্য স্থানবিহীন কোনো বস্তুর বিদ্যমানতা বিশ্বাস করা কঠিন। এজন্যই যখন বলা হয়, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর আছেন, তখন সাধারণ মানুষ খুব সহজেই এই আকিদা গিলে ফেলেন, কেননা সে দেখছে, প্রতিটি বস্তু একটি স্থানে রয়েছে আর আল্লাহ তাআলা আছেন এবং তাঁর একটি সত্তা রয়েছে, ফলে তিনিও

৩৬২. *বুখারি*, ৪০৫
৩৬৩. *ফাতহুল বারি*, ১/৬৩৯

কোনো একটি স্থানে থাকবেন আর সেই স্থানটি হচ্ছে আরশ। এমন আকিদা সাধারণ মানুষ খুব সহজেই নিতে পারে, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা এটা নয়।

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের কেউ কেউ শুধু সাধারণ মানুষদের বোঝানোর সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান কথাটি বলে থাকেন, তবে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থে নয়, বরং দেহবাদী আকিদা এবং অন্যান্য ভ্রান্ত আকিদাগুলো থেকে সাধারণ মানুষের আকিদা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে, তবে মূল আকিদা হচ্ছে, **'তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমন আছেন।'**

আল্লাহ তাআলা ভেতর-বাহির থেকে চিরপবিত্র

পবিত্র মদিনায় একদিন জনৈক সালাফি আমাকে বড় অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলেন। তিনি বলেন, আপনারা যে আল্লাহ তাআলাকে কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী মনে করেন না, বরং দাবি করেন তিনি বিশ্বের ভেতরে নেই, বাহিরেও নেই, তবে কি আপনারা মনে করেন যে, বাস্তবে আল্লাহই নেই?

আমি বললাম, আকিদা যেহেতু আমাদের, তাই ব্যাখ্যাটা আমাদের থেকেই নিন। নিজ থেকে সন্দেহবশত কিছু ভেবে শুধু শুধু গুনাহগার হওয়ার কী দরকার?

আমি তখন প্রশ্নকারীকে বললাম, এটুকু তো নিশ্চয় আপনিও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্তা, যার কোনো শুরু-শেষ নেই। পক্ষান্তরে এই গোটা বিশ্বজগৎ এবং তার ভেতর-বাহির, সকল সৃষ্টিরই একটা শুরু-শেষ আছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা তো বিশ্বাস করিই।

আমি বললাম, এবার তাহলে আপনি আমাকে বলুন, এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন? তিনি বিশ্বজগতের বাহিরে ছিলেন না ভেতরে?

উত্তরে তিনি খুব চমৎকার একটা কথা বললেন, কিন্তু সাথে একটা লেজ জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, সে সময় তো আল্লাহ কোনো স্থানেই ছিলেন না, তবে হ্যাঁ, সবকিছু সৃষ্টির পর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।

অর্থাৎ প্রথম ব্যাপারটিতে আমার সঙ্গে তিনিও একমত যে, একটা সময় আল্লাহ তাআলা না কিছুর ভেতরে ছিলেন, না বাহিরে। কিন্তু সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলার অবস্থান নিয়ে তিনি ভিন্ন আকিদা পোষণ করছেন। তিনি মনে করছেন যে, সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থান করছেন। এই বিশ্বাসের দরুন কতগুলো পরস্পরবিরোধী ব্যাপার তৈরি হচ্ছে। দেখুন—

১. একটা সময় আল্লাহ তাআলা কোনো স্থান বা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং কোনো স্থান বা সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু সৃষ্টির পর তিনি একটি স্থান তথা আরশের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলেন এবং আরশে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন।

২. একটা সময় তাঁর কোনো ওপর-নিচ ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পর তিনি ওপরের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর নিচ বলে একটি দিক সাব্যস্ত হয়ে গেল! এবং তিনি একটি সুনির্দিষ্ট (ওপর) দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন।

৩. একটা সময় তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পর হঠাৎ কী এমন হয়ে গেল যে, তাঁর জন্য একটি স্থান তথা আরশকে সাব্যস্ত করে ফেলতে হলো!

আমি বললাম, তাহলে আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই সৃষ্টিকুল অস্তিত্বে আসার পূর্বে আল্লাহ তাআলার এক অবস্থা ছিল, আর এগুলো অস্তিত্বে আসার পর তাঁর আরেক অবস্থা হয়েছে। তার মানে তাবৎ কিছু সৃষ্টির পর স্রষ্টা স্বয়ং তাঁর সৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন, এমনকি সেই সৃষ্টির দরুন তাঁর নিজের মাঝেও উল্লিখিত পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে। আশ্চর্য বইকি!

আচ্ছা আপনি কি জানেন, আপনার এই কথা ও বিশ্বাস থেকে কত জঘন্য কিছু আকিদা সাব্যস্ত হচ্ছে? আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত সকলপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে চিরপবিত্র। ওদিকে আপনার এই আকিদার ফলে তাঁর সত্তার মাঝে মাখলুক তথা সৃষ্টিকর্তৃক কতগুলো পরিবর্তন সাধিত হলো! নাউজুবিল্লাহ।

আসলে কি জানেন? আমরা হরহামেশা আমাদের চারপাশে যা-কিছু দেখতে পাই—চাই জীব বা জড়—তার সকলকিছুরই একটা দৈহিক আকৃতি রয়েছে এবং সেগুলো কোনো একটা স্থানজুড়ে আছে। ফলে এসব দেখে আমাদের অবচেতন মনে একটা ধারণা তৈরি হয় যে, কোনোকিছুর অস্তিত্ব মানেই যদি তার দেহ ও স্থান জরুরি হয়, তাহলে তো আল্লাহ তাআলারও একটি অস্তিত্ব আছে, তাই অতি আবশ্যকীয়ভাবে তাঁর জন্যও কোনো না কোনো স্থান লাগবে। এখন চাই সেটা বিশ্বের ভেতরে হোক বা বাহিরে।

প্যাঁচটা লাগে যখন কেউ এসে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান জরুরি না, তিনি না বিশ্বের ভেতরে আছেন, আর না বাহিরে। তখন আমার অবচেতন মনের সেই যুক্তি এসে বলে, এই ব্যাটা বোধ হয় আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। নাউজুবিল্লাহ। অথচ কিনা এই আমিই আবার বিশ্বাস করি যে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে তিনি না বিশ্বের ভেতরে ছিলেন, আর না বাহিরে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

আমি সেই ভদ্রলোককে বললাম, আচ্ছা আপনি কি জানেন, প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস করে যে, তার মাঝে ভালোলাগার গুণ যেমন বিদ্যমান, তেমনই খারাপ লাগার গুণও বিদ্যমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও আছে। আমি বললাম, তাহলে আপনি কি আমাকে দেখাতে পারবেন আপনার সেই ভালোলাগা বা খারাপ লাগার গুণটা ঠিক কোন স্থানে আছে? তিনি আমার এই প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ রইলেন।

আমি বললাম, এই যে দেখুন, ১-২-৩-৪ এবং এ জাতীয় যত সংখ্যা রয়েছে, আমরা সবাই এই সংখ্যাগুলোর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। কিন্তু কেউ যদি এসে হঠাৎ বলে যে, এই ১ সংখ্যাটা আসলে কেমন এবং তা কোথায় আছে আমাকে একটু দেখান তো? কিংবা ধরুন সে বলল, ১০০ সংখ্যাটা কেমন এবং তা কোথায় আছে মশায়? আপনি কি পারবেন তাকে ব্যাখ্যা করতে বা দেখাতে? ভদ্রলোক গভীর ভাবনায় পড়ে গেলেন এবং ডানে-বাঁয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন—পারবেন না। আমি বললাম, তাহলে কি আপনি এগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না? তিনি চমকে উঠে আমার দিকে চাইলেন। আমি বললাম, ঠিক একইভাবে আপনাদের যে দাবি—যেকোনোকিছুর অস্তিত্ব মানেই তার আকৃতি ও স্থান জরুরি—এটা সঠিক নয়, বরং তা ঘোরতর বাস্তবতাবিরোধী একটা কথা।

মনে হলো তিনি একটা ঘোরের ভেতর চলে গেছেন। বিষয়টা বুঝলেন কি না ঠিক পরিষ্কার হতে পারছি না। বললাম, আচ্ছা আমি আরও ভেঙে বলছি, ভেতর-বাহির এবং সাদা-কালো—এসব দোষ-গুণ কেবল ওই ব্যক্তি বা বস্তুর বেলায়ই বিবেচিত হয়, যে এসব দোষ-গুণসম্পন্ন হওয়ার জন্য উপযুক্ত। আর যদি কেউ এর উপযুক্ত না হয়, তবে তার বেলায় এর প্রয়োগ ও ব্যবহার কোনোটাই সঠিক হবে না।

উদাহরণস্বরূপ আমি বললাম, আপনার পেছনের দেয়ালটা অন্ধ বা চক্ষুষ্মান। আপনিই বলুন, আমার এ কথার কোনো অর্থ আছে? নিশ্চয় নেই! কেন নেই? কারণ দেখতে পারা না-পারা—কোনো গুণই উক্ত দেয়ালটির মাঝে বিদ্যমান নেই। ফলত আমার এ কথারও কোনো অর্থ নেই।

আরেকটা উদাহরণ দিই। বিয়ের সময় আমরা পাত্রী দেখার পূর্বে কী করি? তার গায়ের রং সম্পর্কে জানতে চাই যে, সে দেখতে সাদা না কালো? এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করি না, সে সবুজ, হলুদ বা নীল কি না, কেন? কারণ আমরা জানি, মানুষ শুধু সাদা বা কালোই হয়। আবার দেখুন, কাপড় কেনার সময়

আমরা দোকানে গিয়ে কী বলি? ভাই এই কাপড়টা নীল, কালো, সবুজ, মেরুন বা ইত্যাকার নানান রং সম্পর্কে জানতে চাই যে, সেই রঙের হবে কি না। এখানে এতগুলো রঙের উল্লেখ কেন করি? কারণ আমরা জানি যে, কাপড় বিভিন্ন রঙের হতে পারে।

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। আপনি বা আমি, আমরা কেউ কি এটা দাবি করতে পারব যে, আল্লাহর হাকিকত সম্পর্কে আমরা পূর্ণ অবগত? নিশ্চয় পারব না? তবে এটুকু আমরা সবাই মানি যে, যখন কোনোকিছুই ছিল না, তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন এবং তখন তিনি না কিছুর ভেতরে ছিলেন, আর না বাহিরে। কাজেই তিনি এমন সত্তা, যার সঙ্গে ভেতর-বাহির—বিপরীতমুখী এই দুটি গুণের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যদি থাকতই, তাহলে সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বেও তিনি হয় কোনোকিছুর ভেতরে থাকতেন অথবা বাহিরে। তখন যেহেতু তিনি কোনোকিছুর ভেতরে বা বাহিরে ছিলেন না, কাজেই এখনো নেই। একইভাবে সে সময় যেহেতু তাঁর অবস্থানের জন্য আরশের প্রয়োজন হয়নি, এখনো তার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলার সাথে ভেতর-বাহির—কোনো গুণই সংযুক্ত করে না। এ প্রসঙ্গে ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى ؟ فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا.
>
> আল্লাহ তাআলা যদি বসা, ওঠা ও অবস্থানের (জন্য আরশের) মুখাপেক্ষীই হতেন, তাহলে তো (প্রশ্ন জাগে যে,) আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই (এ থেকে স্পষ্ট যে,) তিনি এ সবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ও পবিত্র।[৩৬৪]

অর্থাৎ আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন কিন্তু তখন তিনি আরশ বা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, কাজেই তাবৎ কিছু সৃষ্টির পরেও তিনি এসবের মুখাপেক্ষী নন।

ইমাম জাইনুদ্দিন রাজি রহ বলেন,

> والله تعالى منزه عن الجهات والمكان ، ولا ينتفي بنفي الجهات فهذه الجهات حادثة وهو الذي خلقها وأحدثها فكان هو في الأول ، ولم تكن هذه

---

৩৬৪. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫১

الجهات الست فلو صار مختصا بجهة بعد خلقه لكان بتخصيص قبله وذلك باطل.

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দিক ও স্থান থেকে চিরপবিত্র। দিককে নাকচ করা দ্বারা (আল্লাহ তাআলার সত্তাকে) নাকচ করা হয় না, কেননা এ সকল দিক সৃষ্ট। (আল্লাহই) এ সকল (স্থান ও দিককে) সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্বে এনেছেন, কেননা প্রথমে শুধু তিনিই ছিলেন। তখন এই ছয় দিক ছিল না। সুতরাং (স্থান, দিক) সৃষ্টির পর যদি তাঁকে বিশেষ কোনো দিকে থাকতে হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি (স্থান, দিক) সৃষ্টির পূর্বে বিশেষ কোনো (স্থান ও দিকে) ছিলেন। অথচ (সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোনো স্থানে বা দিকে থাকা) হচ্ছে একটি বাতিল আকিদা।[৩৬৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু কোনো স্থান বা দিকে ছিলেন না, ফলে সৃষ্টির পরেও তিনি কোনো স্থান বা দিকে নেই। দিক ও স্থানকে নাকচ করা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাকে নাকচ করা হয় না। কেননা তাঁর সত্তার হাকিকত হচ্ছে এমন, যা সৃষ্ট স্থান ও দিককে গ্রহণ করে না। যদি করত, তাহলে একমাত্র তাঁর সত্তা ও সিফাতকেই অনাদি বলা হতো না, বরং সত্তা ও সিফাতের সাথে সাথে তাঁর অবস্থানের স্থান ও দিককেও অনাদি বলা হতো। সুতরাং তাঁর সত্তা এসব থেকে সৃষ্টির পূর্বে যেমন পবিত্র ছিল, সৃষ্টির পরেও তেমন পবিত্র। ইমাম গাজালি রহ. বলেন,

وهو أن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه.

আর আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র। সেইসাথে পবিত্র বিভিন্ন দিক ও প্রান্ত থেকে। তিনি না বিশ্বের ভেতরে আছেন, আর না বাহিরে, না বিশ্বের সাথে যুক্ত আছেন, আর না পৃথক।[৩৬৬]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন,

وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات.

---

৩৬৫. *শারহু বাদয়িল আমালি*, ১৪৭

৩৬৬. *ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন*, ১৮১০

অনুরূপ এটাও বলা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা না বিশ্বের ভেতরে আছেন, আর না বাহিরে; কেননা ভেতর-বাহির স্থানবিশিষ্ট সত্তার জন্য অপরিহার্য।[৩৬৭]

কামালুদ্দিন বায়াজি রহ. বলেন,

بأن لا يكون الباري تعالى داخل العالم لامتناع أن يكون الخالق داخلا في الأشياء المخلوقة ، ولا خارجا عنه بأن يكون في جهة منه لوجوده تعالى قبل المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات .

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের ভেতরে নন, কারণ স্রষ্টা খোদ তাঁরই সৃষ্ট জিনিসের মাঝে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, এটা অসম্ভব এবং তিনি বিশ্বের বাহিরেও নন, কেননা সে ক্ষেত্রে তাঁর একটি দিকে থাকা সাব্যস্ত হয়। অথচ তিনি তো সকল মাখলুকের পূর্বে, এমনকি বিভিন্ন স্থান ও দিক অস্তিত্বে আসার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন।[৩৬৮]

আবু হাফস আল-ফাসি রহ. বলেন,

لا شك أن المعتقد هو أن الله تعالى سبحانه ليس في جهة ، ... فهو سبحانه ليس بداخل العالم ولا خارجه ، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه.

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আকিদা হচ্ছে তিনি কোনো দিকে নেই। তিনি না আছেন বিশ্বজগতের ভেতরে আর না বাহিরে, না তিনি বিশ্বজগতের সাথে যুক্ত আর না তিনি বিশ্বজগৎ থেকে পৃথক।[৩৬৯]

আবুল মাহাসিন তারাবুলুসি রহ. বলেন,

فإذا قال لك : أين الله ؟ فقل : مع كل أحد بعلمه لا بذاته ، وفوق كل أحد بقدرته ، وظاهر بكل آثار شيئ بآثار صفاته ، وباطن بحقيقة ذاته أي لا يمكن تصويره في النفس منزه عن الجهة والجسمية ، فلا يقال: له يمين ولا

---

৩৬৭. *দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ*, ২৩৭
৩৬৮. *ইশারাতুল মারাম*, ৩৮৫
৩৬৯. *বারায়াতুল আশ-আরিয়্যিন*, ১/৮৩

شمال ولا خلف ولا أمام ولا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل في العالم ولا خارج عنه ، ولا يقال : لا يعلم مكانه إلا هو.

যদি কেউ বলে, আল্লাহ কোথায়? তাহলে বলো, তিনি জ্ঞানগতভাবে সকলের সাথে আছেন, সত্তাগতভাবে নয়। তিনি ক্ষমতার দিক থেকে সবার উর্ধ্বে। তাঁর গুণের নিদর্শনসহ তিনি প্রতিটি বস্তুর মাঝে ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর সত্তার প্রকৃতিতে ও বাস্তবতায় তিনি সুপ্ত। অর্থাৎ মানবমনে তাঁর চিত্রায়ণ করা অসম্ভব। তিনি দিক ও দেহ থেকে চিরপবিত্র। সুতরাং 'তাঁর ডান-বাম রয়েছে বা সামনে-পেছনে রয়েছে, তিনি আরশের ওপর কিংবা আরশের নিচে আছেন, অথবা তিনি ডান দিকে কিংবা বাম দিকে আছেন, তিনি বিশ্বের ভেতর আছেন অথবা বিশ্বের বাহিরে আছেন' এমন কথা বলা যাবে না। এমনটিও বলা যাবে না যে, 'তাঁর স্থান শুধু তিনিই জানেন, অন্যকেউ জানে না।'[৩৭০]

মুহাম্মাদ আরাবি আত-তাব্বানি রহ. বলেন,

وقد زعم المشبهة أن من يعبد إلها لا يكون داخل العالم ولا خارجا عنه يعبد إلها معدوما ، وجمهور الأمة الإسلامية قالوا : أنه تعالى لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارج عنه لأن الدخول والخروج من صفات الحوادث.

সাদৃশ্যবাদীদের বিশ্বাস হচ্ছে কেউ যদি এমন কোনো ইলাহের ইবাদত করে, যিনি বিশ্বের ভেতরে নেই এবং নেই বাহিরে, তাহলে সে এক অস্তিত্বহীন ইলাহের ইবাদত করছে। অথচ উম্মতে ইসলামিয়ার অধিকাংশ বলে থাকেন, আল্লাহ তাআলা না বিশ্বের ভেতরে আছেন আর না বাহিরে, কেননা প্রবেশ-বাহির সৃষ্টির গুণাগুণ।[৩৭১]

যে পবিত্র মদিনা হলো বিশুদ্ধ আকিদার প্রাণকেন্দ্র, আজ সেই পবিত্র মদিনায় বসেই কতক নামধারী সালাফি প্রচার করছে ভুলভাল আকিদা। এমনকি আল্লাহ তাআলার জন্য দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না। নাউজুবিল্লাহ।

---

৩৭০. *মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ৯-১০
৩৭১. *বারাআতুল আশআরিয়িন*, ২/৭১

আমি একটা মজার বিষয় খেয়াল করেছি। সেটা হলো, তারা যদি বোঝে যে, আপনি বাংলাদেশি, তাহলে তারা আপনাকে নানান রকম ওয়াসওয়াসা আর জ্ঞান দিতে আসবে। কিন্তু আলোচনায় যদি বুঝে ফেলে যে, আপনি আকিদা সম্পর্কে জানাশোনা লোক এবং তার তথাকথিত 'সহিহ আকিদা'র গুমর আপনি ফাঁস করে দিচ্ছেন, তাহলে দেখবেন, সে আপনাকে তাদের 'সহিহ আকিদা' শেখাবে তো দূরের কথা, মানে মানে করে কেটে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। শত চেষ্টা করেও আর তাদেরকে আপনি বসাতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যদি দেখে, আপনি একটু সহজ-সরল আলাভোলা মানুষ। আকিদা সম্পর্কে তেমন কিছু বোঝেন না। তাহলে দেখবেন, সে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আপনাকে দেহবাদী আকিদা গেলানোর পাঁয়তারা করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীদের আকিদা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা আছেন, তবে তিনি না বিশ্বের ভেতরে, আর না বাহিরে, না তিনি এই বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, আর না পৃথক। কেননা তিনি দেহবিশিষ্ট নন, ফলে ভেতর-বাহির—এই বিপরীতমুখী ব্যাপারটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যদি থাকত, তবে তিনি সৃষ্টির পূর্বেও কোনো না কোনোকিছুর ভেতরে থাকতেন বা বাহিরে। সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু তিনি কোনোকিছুর ভেতরে বা বাহিরে ছিলেন না, কাজেই তিনি এখনো কোনোকিছুর ভেতরে বা বাহিরে নেই, বরং **তিনি সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন।**

❋❋❋
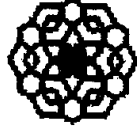
আল্লাহ তাআলার অবস্থান বিষয়ে সালাফিদের দুটি ভুল বিশ্লেষণ

১. একজন সালাফি ভাই বলছেন, আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে কোথায় ছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু তিনি এখন আরশের ওপর আছেন।

সালাফিদের কেউ কেউ এই আকিদাকে কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত আকিদা বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবে এটা খুবই জঘন্য একটি আকিদা। কেননা যখন বলবে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির পূর্বে কোথায় ছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু সৃষ্টির পর তিনি আরশে আছেন, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর সত্তা মাখলুকের মতো পরিবর্তন ও স্থানান্তর গ্রহণ করে। বিষয়টা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি কথোপকথন উল্লেখ করছি।

আকিদা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন আমাদের মাসলাকের কয়েকজন না জানার কারণে বললেন, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে আরশে আছেন।

আমি বললাম, আপনারা আমার দুটি প্রশ্নের জবাব দিন—

ক. আপনারা কি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট এবং তাঁর একটি আয়তন রয়েছে?

জবাবে তারা বললেন, না।

খ. আপনারা কি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাআলা মাখলুকের মতো স্থানান্তর ও পরিবর্তিত হন?

তারা বললেন, না।

আমি বললাম, তাহলে আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন আবার তিনি দেহবিশিষ্ট নন এবং স্থানান্তর ও পরিবর্তিতও হন না, এটা কীভাবে সম্ভব?

তারা বললেন, বিষয়টা বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।

আমি বললাম, দেখুন, আরশ একটি মাখলুক ও দেহবিশিষ্ট বস্তু। তার একটি আকৃতি, পরিধি ও আয়তন রয়েছে।

আপনি যদি বলেন, আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন, তাহলে আরশের মতো তাঁরও একটি আয়তন, দেহ ও পরিধি সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। হয় তা আরশ থেকে বড় হবে বা ছোট বা সমান। আমরা নির্ধারণে না যাই বা কীভাবে আছেন এটাও বলার দরকার নেই। অন্তত একটি আয়তন যে সাব্যস্ত হচ্ছে এটা তো নিশ্চিত। কেননা আরশের একটি আয়তন রয়েছে, তার মাঝে বা ওপরে যে থাকবে অবশ্যই তারও একটি আয়তন সাব্যস্ত হবে। অথচ দেখুন এই আরশ যখন ছিল না তখনও কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছিলেন।

এখন আপনি যদি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন', তাহলে বোঝা যায়, আরশ সৃষ্টির পূর্বের ও পরের অবস্থা তাঁর এক নয়, বরং ভিন্ন। আরশ সৃষ্টির পর তিনি আরশে অবস্থানের অর্থ হচ্ছে তাঁর সত্তার মাঝে একটি স্থানান্তর ও পরিবর্তন সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং এবার বলুন, আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন আবার তিনি দেহবিশিষ্ট নন এবং তাঁর মাঝে কোনো স্থানান্তর ও পরিবর্তন হয়নি, এটা কীভাবে সম্ভব?

ইমাম আবুল ফজল আত-তামিমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর আকিদা হিসাবে উল্লেখ করে লেখেন,

> والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.
>
> আল্লাহ তাআলার (সত্তার মাঝে) কোনো বদল ও পরিবর্তন হয়নি এবং দিক ও সীমা তাঁর সাথে যুক্ত হয়নি, না আরশ সৃষ্টির পূর্বে, না আরশ সৃষ্টির পর।[৩৭২]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> معتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول.
>
> পূর্ববর্তী ইমাম এবং পরবর্তী হাদিসবিশেষজ্ঞ বা আহলুল হাদিসদের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা নড়াচড়া, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হওয়া এবং 'হুলুল' বা সবকিছুর সাথে মিশে যাওয়া থেকে চিরপবিত্র।[৩৭৩]

---

৩৭২. *ইতিকাদুল ইমাম আল-মুনাব্বাল*, ৩৮

৩৭৩. *ফাতহুল বারি*, ৭/১৪৮

এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন এখনো তেমন আছেন। এই আকিদা দ্বারা তিনি দেহবিশিষ্ট সাব্যস্ত হন না আবার তাঁর মাঝে কোনো স্থানান্তর ও পরিবর্তনও সাব্যস্ত হয় না। যে আল্লাহ আসমান জমিন, দিক, স্থান, কাল, পাত্র, আরশ সৃষ্টির পূর্বে এসব ছাড়া থাকতে সক্ষম ছিলেন, তিনি এ সকলকিছু সৃষ্টির পরেও এসব ছাড়া থাকতে সক্ষম।

২. আল্লাহ তাআলার সত্তার মাঝে যেন কোনো পরিবর্তন সাব্যস্ত না হয়। এজন্য সালাফিদের কেউ কেউ বলে থাকেন, ওপরে থাকা এটা আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত। যখন তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তখন তিনি তাঁর নিচে বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন।

এই আকিদা পূর্বের আকিদা থেকেও জঘন্য। কেননা ওপর-নিচ, ডান-বাম, সামনে-পেছনে, এই ছয়টি দিক মাখলুক বা সৃষ্ট। যদি বলা হয়, তিনি বিশ্বজগৎকে তাঁর নিচে সৃষ্টি করেছেন, তখন বোঝা যায় ওপর-নিচ এই দুটি দিক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সিফাতের মতো সৃষ্ট নয়। নিচে সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে ওপর-নিচের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। কেননা যদি ওপর-নিচ না থাকে তাহলে নিচে সৃষ্টি করেন কীভাবে? নিচে সৃষ্টি করেছেন বলা দ্বারাই বোঝা যায় ওপর-নিচ এই দুটি দিক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সিফাতের মতো সৃষ্ট নয়, বরং অনাদি। নাউজুবিল্লাহ।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সিফাত ছাড়া দুনিয়ার সকলকিছু মাখলুক বা সৃষ্ট। তিনি বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করার পর তা ছয়টি দিকে আবদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে এই ছয় দিকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তখন তিনি কোনো স্থান ও দিক ছাড়াই ছিলেন, ফলে তিনি এখনো তেমন আছেন।

এজন্য আপনি যদি কোনো সালাফিকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওপর' কি মাখলুক?

সে বলবে, হ্যাঁ... মাখলুক।

'ওপর' যদি মাখলুক হয় তাহলে ওপর সৃষ্টির পূর্বে তিনি 'ওপরে' থাকেন কীভাবে?

তখন দেখবেন সে হয় চুপ হয়ে যাবে বা আপনার সাথে সকলকিছু সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে, পূর্বের অবস্থা নিয়ে করবে না। অথবা বলবে, এ জাতীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। অথবা বলবে, আমাদের থাকা ও তাঁর থাকা এক নয়।

তখন বলবেন, আমরা দাবি করছি না আমাদের থাকা ও তাঁর থাকা এক। তিনি তাঁর মতো করে থেকেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওপর-নিচ যদি মাখলুক বা সৃষ্ট হয়, তাহলে এই মাখলুক অস্তিত্বে আসার পূর্বে তিনি এই মাখলুকের ওপর থাকেন কীভাবে?

আবার কেউ কেউ বলবেন 'ওপর' মানে কোনো 'দিক' না।

'ওপর' যদি 'দিক' না হয় তাহলে এই 'ওপর' শব্দটা আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যবহারের কী প্রয়োজন রয়েছে? কেননা 'ওপর' শব্দটা বললে সবাই একটা দিককেই বুঝবে, কেউ আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু বুঝবে না। সুতরাং ওপর শব্দ বলে যদি দিক উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাথে এমন শব্দ ব্যবহারের কী প্রয়োজন রয়েছে, যা মানুষকে একটি ভুল আকিদায় পতিত করবে!

মূলত 'ওপর' যদি মাখলুক হয় তাহলে ওপর সৃষ্টির পূর্বে তিনি 'ওপরে' থাকেন কীভাবে? এই প্রশ্নের উপযুক্ত কোনো জবাব নামধারী সালাফিদের নিকট নেই, ফলে যখন যার যেভাবে মন চায় সেভাবেই একটু বলার চেষ্টা করেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, (العلو) সমুন্নত, সর্বোচ্চ এটা তো আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত। তাঁর কোনো সিফাত সৃষ্ট না, সুতরাং তাঁর ওপরে থাকা সৃষ্ট না।

সমুন্নত, সর্বোচ্চ এটা তাঁর সিফাত ঠিক, কিন্তু এই সমুন্নত, সর্বোচ্চ দ্বারা স্থান ও দিকগত সমুন্নত, সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদাগত দিক থেকে সমুন্নত, সর্বোচ্চ হওয়া। ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته.

> আল্লাহ তাআলার উঁচু ও সমুন্নত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মর্যাদা, গুণ, ক্ষমতা ও রাজত্বের দিক থেকে উঁচু ও সমুন্নত হওয়া।[৩৭৪]

ইমাম ইবরাহিম জাজ্জাজ রহ. বলেন,

والله تعالى عال على كل شيئ، وليس المراد بالعلو: ارتفاع المحل؛ لأن الله تعالى يجل عن المحل والمكان وإنما العلو علو الشأن وارتفاع السلطان.

---

৩৭৪. *তাফসিরে কুরতুবি*, ৯/২৪০

আল্লাহ তাআলা সকলকিছুর ওপর সমুন্নত। কিন্তু এই সমুন্নত দ্বারা স্থানগত উচ্চতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা জায়গা ও স্থান থেকে পবিত্র। ফলে সমুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে উন্নত ও উচ্চতর হওয়া।[৩৭৫]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس.

ওপর ও নিচ দুটি দিক আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাঁকে সর্বোচ্চ ও সমুন্নত গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। কেননা তাঁর সমুন্নত হওয়াটা হলো অর্থগত দিক থেকে, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে সমুন্নত বা ওপর (দিক তাঁর জন্য) অসম্ভব।[৩৭৬]

মোটকথা, 'আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে কোথায় ছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু তিনি এখন আরশের ওপর আছেন', অথবা, 'তিনি যখন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তখন তিনি তাঁর নিচে বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন,' উভয় আকিদার কোনো আকিদাই সঠিক ও শুদ্ধ নয়। কেননা উভয় আকিদা তাঁর সত্তা ও সিফাতের সাথে সাথে আরও কিছু মাখলুককে অনাদি সাব্যস্ত করছে এবং তাঁর জন্য সৃষ্টির বিভিন্ন গুণাগুণ সাব্যস্ত করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾

কোনোকিছুই (আল্লাহ তাআলার) মতো বা সদৃশ নয়।[৩৭৭]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيئ من خلقه.

তিনি আপন সৃষ্টির কোনোকিছুর সদৃশ নন এবং আপন সৃষ্টির কোনোকিছু তাঁর সদৃশ নয়।[৩৭৮]

---

৩৭৫. *তাফসির আসমাইল্লাহিল হুসনা*, ৬০
৩৭৬. *ফাতহুল বারি*, ৬/১৭৪
৩৭৭. সুরা শুরা, ১১
৩৭৮. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৪

নববি রহ. বলেন,

اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيئ وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق.

আমাদের সুদৃঢ় আকিদা হলো, কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার মতো বা সদৃশ নয়। সেইসাথে তিনি যাবতীয় দেহ, স্থানান্তর, কোনো দিকে থাকা এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে চিরপবিত্র।[৩৭৯]

কামালুদ্দিন বায়াদি রহ. বলেন,

لا يجري عليه تعالى ما يجري على المخلوقات ، من التغير والزمان فلا يتصف ذاته تعالى وصفاته بقبول التغير.

সৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য, আল্লাহ তাআলার জন্য তা অপরিহার্য নয়। যেমন পরিবর্তন হওয়া, সময় (ইত্যাদি)। ফলে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সকল গুণ কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করে না।[৩৮০]

মুহাম্মাদ আরাবি আত-তাব্বানি রহ. বলেন,

اتفق العقلاء من أهل السنة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته.

শাফেয়ি, হানাফি, মালেকি ও সঠিক ধারার হাম্বলি এবং আহলে সুন্নাতের অন্য সকল বিজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত যে, মহান আল্লাহ তাআলা দিক, দেহ, সীমা, স্থান ও সমস্ত মাখলুকের সদৃশ হওয়া থেকে চিরপবিত্র।[৩৮১]

❋❋❋

---

৩৭৯. *আল-মিনহাজ*, ৩/২৪-২৫

৩৮০. *ইশারাতুল মারাম*, ২৪৪

৩৮১. *বারাআতুল আশআরিয়িন*, ১/৭৯

আল্লাহ তাআলা কোথায়?

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা কোথায়?

উত্তর : ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> لو قيل : أين الله تعالى ؟ قيل له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، كان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء.

> যদি বলা হয় আল্লাহ তাআলা কোথায়? তাহলে উত্তর হবে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে (যখন) কোনো স্থান ছিল না, তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তিনি তখনও ছিলেন, যখন 'আইনা' (মানে 'কোথায়') শব্দটিও ছিল না এবং ছিল না কোনো সৃষ্টি ও বস্তু। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন সকলকিছুকে।[৩৮২]

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর এ উত্তরটি সঠিক ও যথাযথ হলেও নামধারী সালাফিদের কাছে তা আশানুরূপ নয়। তারা হয়তো বলবে, এটা কি উত্তর হলো? কেউ হয়তো আরও আগ বেড়ে বলবে, ইমাম সাহেব প্রশ্নই বোঝেননি। না হয় কী প্রশ্নের তিনি কী উত্তর দিলেন? কেননা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আল্লাহ কোথায়? তিনি হয়তো বলবেন আসমানে বা জমিনে বা আরশের ওপর বা ভিন্ন কোনো স্থানে। এভাবে বললে উত্তরটি সঠিক। অথচ ইমাম সাহেবের উত্তর থেকে এমন কিছুই বোঝা যায় না।

আরও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এই উত্তরটি যদি সঠিকই হয়, তাহলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' এর উত্তরে সে কেন বলেছিল যে, তিনি আসমানে আছেন? আর নবিজিই-বা কেন তা মেনে নিয়েছিলেন?

---

৩৮২. *আল-ফিকহুল আবসাত*, ৯৬

এর উত্তর হলো, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির বুঝ-বুদ্ধি অনুযায়ী তার সাথে কথা বলতেন এবং উম্মতকেও তিনি এভাবে কথা বলতে নির্দেশ করেছেন। ফলে দাসীকে জিজ্ঞেস করার বেলায় তিনি তাঁর বোঝার সুবিধার্থে তার মতো করে প্রশ্নটি করেছেন। এ কথা আমরা বানিয়ে বলছি না; বরং ইমাম কুরতুবি রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেন,

أين الله ؟ هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع الجارية على قدر فهمها ، إذا أراد أن يظهر منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبد الأصنام والحجارة التي في الأرض فأجابت بذلك ... و (أين) ظرف يسأل به عن المكان ... وهو لا يصح إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة ، إذ الله تعالى منزه عن المكان ، كما هو منزه عن الزمان ، بل هو خالق الزمان والمكان ولم يزل موجودا ، ولا زمان ولا مكان ، فهو الآن على ما عليه كان ... أن قول الجارية : "في السماء" ليس على ظاهره باتفاق المسلمين ... وأن من حمله على ظاهره فهو ضال من الضالين.

'আল্লাহ কোথায়'—দাসীকে এ প্রশ্নটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বুঝ অনুসারে করেছেন। এখানে উদ্দেশ্য ছিল, দাসী থেকে এটা সাব্যস্ত করা যে, সে মূর্তি ও পাথরপূজারি নয়। আর সেও ঠিক ওই জবাবটিই দিয়েছে। أين (কোথায়) শব্দটি হলো (আরবি ব্যাকরণিক ভাষায়) একটা 'জরফ'। যা দ্বারা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। ফলত আল্লাহর ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থের ব্যবহার শুদ্ধ নয়। কেননা তিনি সময় (এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া) থেকে যেমন পবিত্র, তেমনই স্থান থেকেও। তিনি তো বরং নিজেই এসবের স্রষ্টা। ফলে তিনি তখনও ছিলেন, যখন সময়-স্থান কিছুই ছিল না এবং তিনি এখনো ঠিক তেমনই আছেন, পূর্বে যেমনটি ছিলেন। কাজেই সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, দাসীর 'আসমানে' কথাটি বাহ্যিক অর্থে তো প্রযোজ্য হবেই না, এমনকি যে এটিকে বাহ্যিক অর্থে মনে করবে, সে নিজেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে।[৩৮৩]

---

৩৮৩. *আল-মুফহিম শরহু মুসলিম*, ২/১৪২-১৪৩-১৪৫

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> حكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه مما يقتضي التشبيه.
>
> (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীকে মুমিনা হুকুম দিয়েছেন এই আশঙ্কায় যে, সে আল্লাহর অস্তিত্বকেই নাকচ করে দিতে পারে। (কেননা যে-সকল শব্দ) সাদৃশ্য বোঝায়, (আল্লাহ তাআলাকে) সেগুলো থেকে চিরপবিত্র মনে করা অপরিহার্য। (এ ক্ষেত্রে) তার বুঝের কমতি ছিল।[৩৮৪]

'আইনা' বা 'কোথায়' শব্দ দ্বারা মূলত প্রশ্ন করা হয় কোনো স্থান সম্পর্কে। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা খোদ এসব শব্দ ও স্থানের স্রষ্টা। কারণ যখন এগুলোর অস্তিত্বও ছিল না, আল্লাহ তখনও বলবৎ ছিলেন। এজন্য প্রকৃত অর্থে এসব শব্দের ব্যবহার আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বৈধ নয়, যেমনটি ইমাম কুরতুবি ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তিনি তেমনই আছেন। নামধারী সালাফিগণ 'আল্লাহ কোথায়' প্রশ্নটি এনে দেহবাদী আকিদার পক্ষে যে উত্তরটি শুনতে চায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলার সত্তাকে তা থেকে পবিত্র মনে করেন। ফলে তারা এ জাতীয় প্রশ্নের এমন উত্তর দেন না। যেমনটা ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-ও দেননি।

এখন কথা হলো, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি দাসীকে 'কোথায়' শব্দ দ্বারা প্রশ্ন না করে জিজ্ঞেস করতেন, বলো তো সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন কি না? তাহলে হয়তো সে প্রশ্নটিই বুঝত না বা এর মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হতো। যেমনটা ইবনে হাজার রহ. বলেছেন। কারণ সাধারণ মানুষ মনে করে, আল্লাহ যেহেতু আছেন একজন, ফলে তাঁকে কোনো না কোনো স্থানে থাকতে হবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এটা কিন্তু তাদের বুঝ, আকিদা নয়। অথচ সালাফিরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আকিদা সম্পর্কে বিভিন্ন অবুঝ বাচ্চাদের ভিডিও দেখিয়ে বলে, অমুক বাচ্চাও বোঝে আল্লাহ তাআলা আসমানের ওপরে আছেন, কিন্তু তোমরা বোঝ না।

---

৩৮৪. *ফাতহুল বারি*, ১৩-৪৭৮

অথচ এটা তো জানা বিষয় যে, বাচ্চা ও আকিদা সম্পর্কে জানাশোনাহীন সাধারণ মানুষের বুঝ এমনই সাদামাটা হবে। গভীরে না গিয়ে তারা ভাসাভাসা আকিদা রাখবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা স্থানবিহীন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা তাদের জন্য কঠিনই বটে। কিন্তু এর অর্থ তো এটা নয় বাচ্চা ও সাধারণ মানুষের আকিদাই সঠিক।

আকিদার কথা নাহয় বাদই দিলাম, দুনিয়ার সাধারণ সাধারণ বিষয়েও কিন্তু বাচ্চা, অনভিজ্ঞ বা সাধারণ মানুষের বক্তব্য আমলে নেওয়া হয় না; বরং বিবেচনা করা হয় ওই বিষয়ে যিনি বিজ্ঞ, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ তার কথা। অথচ আকিদার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে এসে সালাফিরা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম কুরতুবি, হাফেজ ইবনে হাজারের মতো বাঘা বাঘা সর্বজনস্বীকৃত ও বিজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্য গ্রহণ না করে করছে বাচ্চা ও সাধারণ মানুষের বক্তব্য। কতটা হাস্যকর বালখিল্য এটা তাদের!

সুতরাং এটা তো স্পষ্ট যে, দাসীকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন ওভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। ফলে সে যখন তার মতো করে জবাব দিলো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেয়ে গেলেন, তখন তিনি তাকে মুমিনা বলে হুকুম দিয়ে দিলেন।

নামধারী সালাফিরা এই প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম কুরতুবি ও ইবনে হাজার রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্যকে গ্রহণ করবে না। কারণ তাদের আকিদা ও ব্যাখ্যা সালাফিদের দেহবাদী ভ্রান্ত আকিদাকে সমর্থন করে না। ফলে 'বিচার মানি তালগাছ আমার' জাতীয় গোঁড়া সালাফিরা হয়তো বলে বসবে যে, তারা তো হাদিসই বুঝত না, বা হাদিস বুঝলেও আকিদা বুঝত না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি যদি গভীর মনোযোগের সাথে বর্তমান সময়ের নামধারী সালাফিদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন, তারা এমন একটি ফিরকা, যারা নিজেদের মত ও আকিদা প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোনো বিজ্ঞ-পণ্ডিত ইমামকে কাফের আখ্যা দিতে পারে। এমনকি শুধু নিজেদের মতানুসারী না হওয়ার 'অপরাধে' যেকোনো স্বীকৃত মুহাদ্দিস-মুফাসসিরকে পর্যন্ত কুরআন-হাদিসের বিকৃতিকারী বানিয়ে দিতে পিছপা হবে না। প্রায়ই দেখবেন, তারা বলছে, অমুক ইমাম সত্যটা জেনেও গ্রহণ করেনি, তমুক ইমামের নিকট সত্যটা পৌছেনি, তমুক ইমাম এখানে ভুল করেছেন ইত্যাদি। নিজেদের ভ্রান্ত আকিদার প্রচার-প্রসারের জন্য তারা হেন কিছু নেই, যা বলে না ও করে

না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করুন। আমিন।

দুটি উক্তি উল্লেখ করে প্রসঙ্গটি শেষ করছি। 'আল্লাহ কোথায়' এ প্রশ্নের একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন ইমাম আবুল মাহাসিন তারাবুলুসি রহ.।

ইমাম শিরাজি রহ. বলেন,

فدل على أنه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما عليه كان ، فإن قيل: إذا قلتم إنه ليس على العرش ولا في السماوات ولا في جهة من الجهات فأين هو ؟ ، يقال لهم : أول جهلكم وصفكم له بأين لأن "أين" استخبار عن المكان والرب عز وجل منزه عن ذلك.

(উল্লিখিত আলোচনা) প্রমাণ করে, যখন স্থান ছিল না, তখন (আল্লাহ তাআলা) ছিলেন। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেন। ফলে তিনি এখনো তেমন আছেন, (সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।

যদি প্রশ্ন করে, তোমরা যদি বলো তিনি আরশে নেই, আসমানে নেই এবং কোনো দিকেও নেই, তাহলে তিনি 'কোথায়'?

জবাবে বলা হবে, তোমাদের প্রথম অজ্ঞতা হচ্ছে, তোমরা তাঁর সাথে 'আইনা' বা কোথায় (শব্দটি) ব্যবহার করেছ। অথচ 'আইনা' বা 'কোথায়' (শব্দটি) দ্বারা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র।[৩৮৫]

ইমাম আবুল মাহাসিন তারাবুলুসি রহ. বলেন,

فإذا قال لك : أين الله ؟ فقل : مع كل أحد بعلمه لا بذاته ، وفوق كل أحد بقدرته ، وظاهر بكل آثار شيئ بآثار صفاته ، وباطن بحقيقة ذاته أي لا يمكن تصويره في النفس منزه عن الجهة والجسمية ، فلا يقال : له يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل في العالم ولا خارج عنه ، ولا يقال : لا يعلم مكانه إلا هو.

৩৮৫. *আল-ইশারাতু ইলা-মাজহাবি আহলিল হক*, ১৫১

যদি কেউ বলে, আল্লাহ কোথায়? তাহলে বলো, তিনি জ্ঞানগতভাবে সকলের সাথে আছেন, সত্তাগতভাবে নয়। তিনি ক্ষমতার দিক থেকে সবার উর্ধ্বে। তাঁর গুণের নিদর্শনসহ তিনি প্রতিটি বস্তুর মাঝে ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর সত্তার প্রকৃতিতে ও বাস্তবতায় তিনি সুপ্ত। অর্থাৎ মানবমনে তাঁর চিত্রায়ণ করা অসম্ভব। তিনি দিক ও দেহ থেকে চিরপবিত্র। সুতরাং 'তাঁর ডান-বাম রয়েছে বা সামনে-পেছনে রয়েছে, তিনি আরশের ওপর কিংবা আরশের নিচে আছেন, অথবা তিনি ডান দিকে কিংবা বাম দিকে আছেন, তিনি বিশ্বের ভেতর আছেন অথবা বিশ্বের বাহিরে আছেন' এমন কথা বলা যাবে না। এমনটিও বলা যাবে না যে, 'তাঁর স্থান শুধু তিনিই জানেন, অন্য কেউ জানে না।'[৩৮৬]

৩৮৬. *মুখতাসারুল ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ৯-১০

তাফবিদ

তাফবিদ মানে ন্যস্ত বা অর্পণ করা। অর্থাৎ মুতাশাবিহ আয়াত এবং যে-সকল বর্ণনা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সদৃশ বোঝায়, সেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নিকট অর্পণ করা। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মাসলাক দুটি—

১. তাফবিদ (تفويض) তথা অর্পণ করা।

২. তাবিল (تأويل) তথা ব্যাখ্যা করা।

ইমাম বদরুদ্দিন জারকাশি রহ. বলেন,

قد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق :

أحدها أنه لا مدخل للتأويل فيها ، بل تجرى على ظاهرها ، ولا تؤول شيئا منها ، وهم المشبهة.

والثاني : أن لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ، ونقول : لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف.

الثالث : أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به ، الأول باطل والأخيران منقولان عن الصحابة.

আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত শব্দ নিয়ে তিনটি মতানৈক্য রয়েছে।

এক. তাবিলের কোনো অবকাশ নেই, বরং বাহ্যিক অর্থে যা বোঝায়, তা-ই গ্রহণ করতে হবে। এ বক্তব্য 'মুশাব্বিহা' বা সাদৃশ্যবাদী গোষ্ঠীর।

দুই. এগুলোর একটি তাবিল ও ব্যাখ্যা থাকলেও আমরা তা করা থেকে বিরত থাকব। সেইসাথে 'সদৃশ ও অস্বীকার করা' থেকে আকিদাকে বিশুদ্ধ রাখতে আমরা বলব, এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এটি সালাফদের বক্তব্য।

তিন. (এ সকল আয়াত ও হাদিসকে) আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী শব্দে তাবিল করা হবে। উল্লেখ্য, প্রথমটি বাতিল হলেও শেষ মতাদর্শ দুটি সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত।[৩৮৭]

তাফবিদের পরিচয়

তাফবিদ (التفويض)-এর আভিধানিক অর্থ হলো, সমর্পণ করা, ন্যস্ত করা ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾

আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি।[৩৮৮]

তাফবিদের পারিভাষিক অর্থ তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত—

১. মুতাশাবিহ আয়াত ও আল্লাহর সিফাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা এবং কোনোটিকেই অস্বীকার না করা।

২. অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা।

৩. শব্দের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করা। একটি উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

আয়াতের একটি শব্দ হচ্ছে 'ইসতাওয়া'। এ শব্দের ওপর পূর্ণ ঈমান রাখা এবং অস্বীকার না করা। আর এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করা।

ইসতাওয়া শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো কোনো স্থানে থাকা, ওঠা, সমাসীন হওয়া বা আয়ত্তাধীন হওয়া ইত্যাদি। এ সকল অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে চিরপবিত্র মনে করা। অন্যথায় তিনি সৃষ্টির সদৃশ সাব্যস্ত হন, যা অসম্ভব। আরেকটি উদাহরণ, তিনি ইরশাদ করেন,

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

---

৩৮৭. *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, ৩৭৬

৩৮৮. সুরা মুমিন, ৪৪

উল্লিখিত আয়াতে (يَـد) শব্দটিকে আল্লাহ তাআলার সিফাত মনে করা এবং অস্বীকার না করা। সেইসাথে শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের ইলম তাঁর নিকট সমর্পণ করা।

يَـد শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'হাত', যা শরীরের একটি অঙ্গ। আয়াতে এই অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, কেননা তখন আল্লাহ তাআলার সত্তা সৃষ্টির সদৃশ সাব্যস্ত হয়, যা কিনা অসম্ভব।

তাফবিদের দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

তিনিই সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন, যার একাংশ মুহকাম আয়াতসমূহ (অর্থাৎ যেগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট)। সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্য আয়াতগুলো হচ্ছে 'মুতাশাবিহ' (অর্থাৎ যেগুলোর অর্থ বিদিত বা নির্দিষ্ট নয়)। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে পড়ে থাকে, এগুলো নিয়ে ফিতনা ও (মনগড়া) ব্যাখ্যা তৈরির নিমিত্তে। অথচ এসব আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ব, তারা বলেন, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর উপদেশ কেবল বুদ্ধিমানরাই গ্রহণ করে।[৩৮৯]

তাফবিদের প্রয়োগক্ষেত্রে

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলো কয়েক স্তরের—

১. কিছু শব্দ আল্লাহ তাআলা এবং মাখলুক উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিবেচনায় একটা পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন দেখা-

---

৩৮৯. সুরা আলে-ইমরান, ৭

শোনা-জানা ইত্যাদি। এ শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে যে পূর্ণতা ও ব্যাপকতার অর্থ দেবে, বান্দার ক্ষেত্রে তা দেবে না। কাজেই এ জাতীয় শব্দের বেলায় তাফবিদ প্রযোজ্য হবে না।

২. কিছু শব্দ আছে, যেগুলো কুরআনে এসেছে এবং শব্দগুলোর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলার মাঝে একপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা বোঝায়। যেমন 'তিনি ভুলে যান' বা 'তিনি সর্বোত্তম চক্রান্তকারী' ইত্যাদি। এই প্রকার শব্দে তাফবিদ প্রযোজ্য হবে না। এখানে তাবিল অবশ্যক।

৩. কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সদৃশ সাব্যস্ত করে। বলাবাহুল্য, শুধু এই প্রকার শব্দের ক্ষেত্রেই তাফবিদ প্রযোজ্য।

তাফবিদ সম্পর্কে কতক আলেমের বক্তব্য

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

> سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية.
>
> ইমাম আওজায়ি, মালেক, সুফিয়ান সাওরি, লাইস বিন সাদ রহ.-কে 'সাদৃশ্য বোঝায়' এমনসব হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, কোনো ধরন ছাড়া সেভাবেই বর্ণনা করো, যেভাবে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে।[৩৯০]

ইমাম রাজি রহ. বলেন,

> حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيئ غير ظواهرها ، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ، ولا يجوز الخوض في تفسيرها.
>
> (সালাফদের বক্তব্যের) সারকথা হলো, প্রথমত মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে এই আকিদা রাখতে হবে যে, **বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য নয়**। অতঃপর এগুলোর অর্থকে আল্লাহ তাআলার

---

৩৯০. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৪১৮

নিকট সোপর্দ করা। মনে রাখতে হবে, এসব আয়াতের তাফসিরে মত্ত হওয়া জায়েজ নেই।[৩৯১]

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

في تمسك المجسمة بظواهر النصوص مذهب السلف أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله تعالى مع التنزيه عن التشبيه ولا نشتغل بتأويلها بل نعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق.

দেহবাদীরা এ সকল নসের বাহ্যিক অর্থকে আঁকড়ে ধরার বিষয়ে সালাফদের মাজহাব হচ্ছে, আমরা নসগুলোকে সত্যায়ন করব। সাদৃশ্য থেকে পবিত্র বিশ্বাসের সাথে সাথে এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করব। তাবিলের পেছনে পড়ব না, বরং বিশ্বাস করব, আল্লাহ তাআলা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা সত্য।[৩৯২]

হাফেজ যাহাবি রহ. বলেন,

فقولنا في ذلك وبابه الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم.

এ বিষয়ক অন্যান্য বর্ণনা ও অধ্যায়ের ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, (বর্ণনাগুলোকে) স্বীকার করা ও (হুবহু) বর্ণনা করা। আর তার অর্থকে সমর্পণ করা রাসুলের নিকট, যিনি নিষ্পাপ ও সত্যবাদী।[৩৯৩]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال : ... الثالث : إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى.

চোখ, চেহারা ও হাত—(আল্লাহ তাআলার এ জাতীয়) সিফাতের মাঝে আহলুল কালাম বা আকিদাবিশেষজ্ঞদের তিনটি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তৃতীয় মতটি হলো, এসব শব্দের অর্থকে আল্লাহ

---

৩৯১. *তাসিসুত তাকদিস*, ২২৯
৩৯২. *আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ১৬৬
৩৯৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৮/১০৫

তাআলার নিকট তাফবিদ তথা সোপর্দ করা এবং অবিকল যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা করা।[৩৯৪]

ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন,

وجمهورأهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها.

সালাফ ও আহলুল হাদিসসহ আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ ইমামের মাজহাব হলো, (এসব আয়াত ও হাদিসের ওপর) ঈমান আনতে হবে এবং তার উদ্দিষ্ট অর্থকে আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পণ করতে হবে। আর আমরা এগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো তাফসির করতে যাব না এবং সেইসাথে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র ঘোষণা করব শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ থেকে।[৩৯৫]

আহলে হাদিস আলেম শায়েখ আবদুর রহমান মুবারকপুরি রহ. লেখেন,

قال القاري: مذهب السلف التسليم والتفويض مع التنزيه ... قلت: الأمر كما قال القاري، فلا شك أن التسليم والتفويض هو الأسلم بل هو المتعين.

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, সালাফদের মাজহাব হলো, (এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তাআলার নিকট) ন্যস্ত ও অর্পণ করা। সেইসাথে (বাহ্যিক অর্থ থেকে তাঁকে) চিরপবিত্র ঘোষণা করা। আমার বক্তব্যও তা-ই। (কারণ) এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যস্ত ও অর্পণ করাই নিরাপদ, বরং তা সুনির্ধারিত (মাজহাব)।[৩৯৬]

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত দুটি কারণে তাফবিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকে নাকচ করেন।

১. সৃষ্টি ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায় বলে। অথচ তিনি স্পষ্ট বলেছেন,

---

৩৯৪. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪৬৫

৩৯৫. *আল-ইতকান*, ৪৩১

৩৯৬. তুহফাতুল আহওয়াজি, ৬/৪৬৮-৪৬৯, হাদিস : ২৫৫৭

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾

কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়।[৩৯৭]

২. বাহ্যিক অর্থের কারণে একটা ধরন সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত ধরন থেকে চিরপবিত্র। ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন,

هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية ، والكيفية عن الله سبحانه وصفاته منفية.

এই কথাটিকে বাহ্যিক অর্থে নিলে তার মাঝে এক প্রকারের ধরন সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত ধরন থেকে চিরপবিত্র।[৩৯৮]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. তাফবিদের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তাআলার নিকট অর্পণ করেন। পক্ষান্তরে নামধারী সালাফিরা শব্দের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে রীতিমতো আল্লাহ তাআলার জন্য দৈহিক অঙ্গ সাব্যস্ত করে। অতঃপর সেই অঙ্গের ধরন কেমন হবে, সেই জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার নিকট অর্পণ করে বসে থাকে। অর্থাৎ সালাফিরা كيف-কে তাফবিদ করে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে তাফবিদ করে।

২. তাফবিদ বোঝানোর ক্ষেত্রে কতক ইমাম সংক্ষেপে على ظاهره শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে على ظاهر التنزيل—অর্থাৎ যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করা। কিন্তু নামধারী সালাফিরা এটাকে বিকৃত করে অর্থ নেয় على ظاهر معناه الحقيقي—অর্থাৎ তার বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে। আল্লাহ তাআলা নামধারী সালাফিদের সঠিক বুঝ দান করুন ও তাদের বিকৃতি থেকে সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

---

৩৯৭. সুরা শুরা, ১১

৩৯৮. *মাআলিমুস সুনান*, ৪/৩২৮

৩. তাফবিদ করা দ্বারা শব্দ বা সিফাতকে নাকচ, বাতিল বা অস্বীকার করা হয় না; বরং শব্দটি সম্পর্কে যিনি অধিক জ্ঞাত তাঁর তথা আল্লাহ তাআলার নিকট বিষয়টি অর্পণ করা হয়। দুনিয়াতেও দ্বীনি বিভিন্ন বিষয় আমরা সে বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করে থাকি। এই অর্পণ দ্বারা কখনো বিষয়টিকে নাকচ বা অস্বীকার করা হয় না। ঠিক তেমনই সিফাতের মাঝে তাফবিদ দ্বারাও শব্দটিকে নাকচ বা অস্বীকার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যিনি বিষয়টি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত তাঁর নিকট অর্পণ করা।
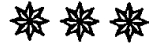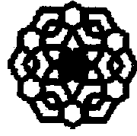
তাবিল

'তাবিল' (التأويل)-এর আভিধানিক অর্থ হলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা।

পারিভাষিক অর্থে তাবিল বলা হয়, শব্দের বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে পূর্বাপর দেখে এমন একটি অর্থ করা, যা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত এবং আরবি ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাবিলের বিষয়ে ইমামদের তিনটি মত—

১. ইমাম জুয়াইনি রহ.-এর মত হলো, পরবর্তীদের জন্য তাবিল করা জরুরি ও অপরিহার্য। তবে সালাফরা তাবিল না করে তাফবিদ করার কারণ হলো, তাদের যুগে দেহবাদী এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাগুলোর মতাদর্শ তেমন একটা ছিল না। ফলে তারা তাফবিদ করেছেন।

২. ইমাম গাজালি রহ.-সহ কতক ইমাম বলেন, প্রয়োজন হলে তাবিল করার সুযোগ আছে, তবে প্রয়োজন ছাড়া তাফবিদ করাই উত্তম।

৩. ইমাম ইবনে দাকিক রহ.-এর মত হচ্ছে, প্রয়োজন ছাড়াও তাবিল জায়েজ। তবে শর্ত হচ্ছে তা আরবি ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ যদি হয়, তাহলে এরকম তাবিল না করে তাফবিদ করাই উত্তম।

তাবিলের দলিল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন বলবেন, হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কী করে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করোনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে।

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমি কী করে আপনাকে আহার করাতে পারি? আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে।

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমি কী করে আপনাকে পান করাব, অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেয়ে যেতে।[৩৯৯]

উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে অসুস্থ হওয়া এবং পানাহারের মতো বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ এগুলো স্রষ্টার সিফাত হতে পারে না, কেননা এগুলো সৃষ্টির সিফাত। তারপর আল্লাহ তাআলা নিজেই তাবিল করে শব্দগুলোর সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার শানে অনুপযোগী এবং খালেক ও মাখলুকের মাঝে সাদৃশ্য

---

৩৯৯. *মুসলিম*, ২৫৬৯

বোঝায়, এমন শব্দ আল্লাহ তাআলার সাথে কুরআন ও হাদিসে ব্যবহার হলেও শব্দগুলোর তাবিল ও ব্যাখ্যা বৈধ।

তাবিল শুদ্ধ হওয়ার চারটি শর্ত

১. এমন অর্থ নিতে হবে যা আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত।

২. এমন অর্থ নিতে হবে যা আরবি ভাষা সমর্থন করে এবং সে অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

৩. অর্থটি আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনোপ্রকার ত্রুটি, অসম্মান বোঝাতে পারবে না।

৪. শব্দটি আল্লাহ তাআলার জন্য সম্মান ও মর্যাদাসূচক হবে।

সালাফদের থেকে তাবিলের কয়েকটি উদাহরণ

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, بأيد (হাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, بقـوة— অর্থাৎ শক্তি দ্বারা।[৪০০]

অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাস রা. এখানে হাতকে তাবিল করেছেন শক্তি দ্বারা।[৪০১]

---

৪০০. *তাফসিরে তাবারি*, ২১/৫৪৫

৪০১. أَيْدٍ হচ্ছে اليد-এর বহুবচন। ইমাম ফাইয়ুমি রহ. বলেন,

(اليد) ... جمع القلة : أَيْدٍ، وجمع الكثرة : الأيادي.

اليد (হাত)-এর স্বল্পসংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন হলো أَيْدٍ এবং বহুসংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন হলো الأيادي। (*আল-মিসবাহুল মুনির*, ৬৮০)ইমাম ইবনু জিন্নি রহ. বলেন,

اليد التي هي العضو، قالوا فيها : أَيْدٍ.

اليد দ্বারা যখন অঙ্গ উদ্দেশ্য হয়, তখন ভাষাবিশেষজ্ঞরা (তার বহুবচন) বলেন, أَيْدٍ। (*আল-খাসাইস*, ১/২৬৭)

পবিত্র কুরআনের আরেক জায়গায় أَيْدٍ শব্দটিকে اليد-এর বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾

তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে। (সুরা আরাফ, ১৯৫)

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, يَأْتِيَ رَبُّكَ—এখানে 'তোমার প্রতিপালক আসবে' কথার উদ্দেশ্য হলো, أمر ربك—'তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আসবে।'[৪০২]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর আগমনকে তাবিল করছেন তাঁর নির্দেশ আসা দ্বারা।

৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, كرسيه علمه—তাঁর কুরসি হলো, তাঁর ইলম।[৪০৩]

অর্থাৎ তিনি এখানে কুরসিকে তাবিল করছেন ইলম দ্বারা।

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ.

> জাহান্নাম বলতেই থাকবে, আর আছে কি? এমনকি রাব্বুল ইজ্জত তাতে তাঁর পা রাখবেন।[৪০৪]

ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন,

القدم الذين قدمهم الله لها من شرار خلقه وأثبتهم لها.

> পা দ্বারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট একটি দল উদ্দেশ্য, যাদের তিনি জাহান্নামে ফেলবেন এবং জাহান্নামই হবে তাদের চূড়ান্ত ঠিকানা।[৪০৫]

---

৪০২. *তাফসিরে কুরতুবি*, ৯/১২৭
৪০৩. *তাফসিরে তাবারি*, ৪/৫৩৭
৪০৪. *বুখারি*, ৬৬৬১
৪০৫. *দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ*, ২৫০

অর্থাৎ হাসান বসরি রহ. আল্লাহর পা-কে তাবিল করছেন সৃষ্টির নিকৃষ্ট একটি দল দ্বারা।

৫. উল্লিখিত হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেন,

لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع ... لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار، جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه.

আরবরা قدم তথা পা-কে জায়গার অর্থে ব্যবহার করে।... এটা তো এখানে মোটেও উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন। কেননা আমাদের প্রতিপালক এ জাতীয় (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) থেকে চিরপবিত্র।[৪০৬]

উল্লিখিত হাদিসটি কুরআনের স্পষ্ট একটি আয়াতের বিপরীত। ফলে অবশ্যই হাদিসটির ব্যাখ্যা জরুরি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা।[৪০৭]

৬. ইমাম মালেক রহ.-কে শেষরাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহ তাআলার নেমে আসার হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, يتنزل أمره—অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ নেমে আসে।[৪০৮]

অর্থাৎ ইমাম মালেক রহ. এখানে আল্লাহ তাআলার নেমে আসাকে তাবিল করেছেন 'তাঁর নির্দেশ নামা' দ্বারা।

৭. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, جاء ثوابه—তথা তাঁর প্রতিদান আসে।

---

৪০৬. *সহিহ ইবনে হিব্বান*, ১/৫০২
৪০৭. সুরা সাজদা, ১৩
৪০৮. *আত-তামহিদ*, ৬/১৩৪

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, এর সনদে কোনোপ্রকার সমস্যা নেই।[৪০৯]

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আল্লাহর আগমনকে তাবিল করছেন 'তাঁর সওয়াব আসা' দ্বারা।

৮. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥ﴾

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, إِلَّا وَجْهَهُ-এর অর্থ হচ্ছে, إلا ملكه। অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব ছাড়া বাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪১০]

অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ. আল্লাহ তাআলার চেহারাকে তাবিল করেছেন 'তাঁর রাজত্ব' দ্বারা।

৯. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.
>
> ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ হাসেন, যারা পরস্পরকে হত্যা করেও উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। তাদের একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহিদ হয়েছে। আর অপরজন তথা হত্যাকারী পরবর্তী সময়ে তাওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওবা কবুল করেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহিদ বলে গণ্য হয়ে যায়।[৪১১]

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, এখানে معنى الضحك الرحمة—হাসার অর্থ হলো দয়া ও অনুগ্রহ।[৪১২]

অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহ. আল্লাহ তাআলার হাসাকে তাবিল করছেন 'তাঁর অনুগ্রহ' দ্বারা।

---

৪০৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩২৭

৪১০. *বুখারি*, সুরা কাসাস

৪১১. *বুখারি*, ২৮২৬

৪১২. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৪৩৩

১০. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾

ইমাম জামালুদ্দিন কাসিমি রহ. بِيَدَيَّ—তথা 'আমার দুই হাত দ্বারা' কথাটিকে তাবিল করেছেন, أي بنفسي من غير توسط—অর্থাৎ কোনোরূপ মধ্যস্থতা ছাড়া আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি।[৪১৩]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তাআলার দুই হাতকে তাবিল করছেন, 'তাঁর নিজ সত্তা' দ্বারা।

সালাফদের থেকে তাবিলের এমন শত শত উদাহরণ পেশ করা যাবে। আশা করছি, বুঝমানদের জন্য এই ১০টি উদাহরণই যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, নামধারী সালাফিরা বলতে চান যে, তাবিল করা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মাজহাব নয়। তাদের সমীপে আমরা বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারি ও ইমাম ইবনে হিব্বান, রহ. প্রমুখ মনীষীগণও যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত না হন, আদতে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত তাহলে কারা? তারা নিজেরাই শুধু? (নাউজুবিল্লাহ)

পরবর্তীরা কেন তাফবিদের পরিবর্তে তাবিল করলেন?

মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন,

> وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلالة واستيلائهم على عقول العامة ، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم.
>
> তাদের সময়ে মূলত দেহবাদী, জাহমিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আধিক্য এবং সাধারণ মানুষের বুঝ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে সে সময় তাবিলের প্রয়োজন দেখা দেয়। যদ্দরুন তাবিলের মধ্য দিয়ে তারা সেসব বাতিল ফেরকার বক্তব্য খণ্ডন করেন এবং তা অসাররূপে সাব্যস্ত করেন।[৪১৪]

---

৪১৩. *মাহাসিনুত তাবিল*, ২/১৯২৭

৪১৪. *মিরকাত*, ৩/২৯৯-৩০০

আমাদের সালাফগণ যে দেহবাদী আকিদা খণ্ডন করতে গিয়ে তাবিলের আশ্রয় নিয়েছেন, এমনকি কিতাবও লিখেছেন, উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, যুগের বিবর্তনে আজ সেই দেহবাদী আকিদাই প্রচার হচ্ছে 'সালাফি আকিদা' নামে। কিছু অন্ধভক্ত আবার না বুঝেই এ আকিদা গিলে বরবাদ করে দিচ্ছেন নিজের আখেরাতকে, আসতাগফিরুল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের তাবিল করার অর্থ এটা নয় যে, তারা জাহমিয়াদের মতো সিফাতকে অস্বীকার করে তাবিল করেন, বরং তারা সিফাতকে স্বীকার করেন। তবে কখনো প্রয়োজন হলে তাবিলের আশ্রয় নেন। নামধারী সালাফিরা যেমন সিফাতকে স্বীকারের সাথে সাথে তাবিল করেন।

যেমন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ও فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ আয়াত দুটিতে وَجْهُ-কে সালাফিরাও তাবিল করে থাকে। কাজেই সালাফিদের তাবিলের কারণে যেমন সিফাতকে অস্বীকার করা হয় না, তেমনই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের তাবিলের কারণেও সিফাতকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু জাহমিয়া-মুতাজিলাগণ তাফবিদ না করে তাবিলের মাধ্যমে সিফাতকে অস্বীকার করে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত করে না। পার্থক্যটা মনে রাখুন, কেননা নামধারী সালাফিরা এ জায়গাটা বেশ গুলিয়ে ফেলে।

❋ ❋ ❋

তাবিল নিয়ে জনৈক দেহবাদীর সাথে কথোপকথন

দেহবাদী : আমরা আশআরি, মাতুরিদিদের মতো তাবিল তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি না, বরং আমরা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আল্লাহ তাআলা যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই ঈমান রাখি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : তাহলে তো আপনি দুনিয়ার সব থেকে জঘন্য আকিদা লালন করেন।

দেহবাদী : কীভাবে?

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

তিনিই ওই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনে আছেন।[৪১৫]

আপনি কি এই আকিদা রাখেন যে, আল্লাহ তাআলা আসমানেও আছেন এবং জমিনেও আছেন?

দেহবাদী : না না, এখানে ব্যাখ্যা আছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : এই তো আপনি নিজেও ব্যাখ্যায় যাচ্ছেন।

আচ্ছা, এ আয়াতের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী,

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

আর তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।[৪১৬]

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের সাথে সাথেই আছেন?

দেহবাদী : না না, এর একটা ব্যাখ্যা আছে।

---

৪১৫. সুরা আনআম, ৩

৪১৬. সুরা হাদিদ, ৪

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : তার মানে আপনি এখানেও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। তাহলে ভাই আপনি যে মাত্রই বললেন, আপনারা কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই কুরআনে যেভাবে এসেছে সেভাবেই ঈমান আনেন, এটা তবে কীসের ক্ষেত্রে?

দেহবাদী : আসলে ভাই এটা হলো আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের ক্ষেত্রে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : আচ্ছা! তবে তো মাশাআল্লাহ এটাও আপনার পূর্বের আকিদার মতোই জঘন্য।

দেহবাদী : কীভাবে?

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : এই যে দেখুন আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

সবকিছু ধ্বংসশীল। তবে তাঁর (আল্লাহর) চেহারা ছাড়া।[৪১৭]

আপনি কি এই আকিদা রাখেন যে, কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু তাঁর চেহারা ছাড়া?

দেহবাদী : না ভাই, কী বলেন? এখানে তো চেহারা দ্বারা তাঁর গোটা সত্তাই উদ্দেশ্য।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : আচ্ছা তাই! কিন্তু আপনি না মাত্রই বললেন, সিফাতের ক্ষেত্রে আপনি কোনোরূপ তাবিল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যান না? وجه তো আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত। অথচ আপনি রীতিমতো সিফাতটির ব্যাখ্যা করছেন!

আচ্ছা বাদ দিন। فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ—এ আয়াতের ব্যাপারে কী বলবেন?

এখানে তো আল্লাহ বলছেন, সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা।[৪১৮]

---

৪১৭. সুরা কাসাস, ৮৮

৪১৮. সুরা বাকারা, ১১৫

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমরা যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই আল্লাহ তাআলার চেহারা আছে?

দেহবাদী : না, মানে এখানে চেহারা দ্বারা উদ্দেশ্য কিবলা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : আচ্ছা আচ্ছা! আপনারা তাহলে আল্লাহ তাআলার সিফাতের মাঝেও তাবিল করছেন। এখানেও তো আপনাদের স্ববিরোধিতা পাওয়া গেল।

দেহবাদী : না মানে, আসলে... ইয়ে... এখানে...।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী : আমার ধারণা, আপনি বাংলা কিছু বই পড়ে বা কিছু ভিডিও দেখে 'সহিহ আকিদা' শিখেছেন। আসলে নামের শুরুতে শুধু 'সহিহ' শব্দ থাকলেই সেটা সহিহ হয়ে যায় না। মূলত আপনাদের মতো সাধারণ ব্যক্তিদের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্যই তারা এসব ভুল আকিদার শুরুতেও 'সহিহ' শব্দ যোগ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

অথচ বাস্তবতা হলো, এই 'সহিহ' নামের আড়ালে দেহবাদীরা দুনিয়ার যত পচা ও ভেজাল আকিদা আছে, সব আপনাদের খাওয়াচ্ছে। আর আপনারা সেটা না বুঝে গোগ্রাসে গিলে চলেছেন। টেরও পাচ্ছেন না যে, কী বিষ তারা ঢুকিয়ে দিচ্ছে আপনাদের ভেতরে। মনে রাখবেন, শয়তান সবসময়ই বাতিলকে চাকচিক্যময় রূপে তুলে ধরে, ফলে সাধারণ মানুষ ধোঁকাও খায় বেশি।

'আমরা কুরআন ও হাদিসের মাঝে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই ঈমান রাখব,' এটা হচ্ছে মিষ্টি একটি স্লোগান। বাস্তবে যদি কুরআন ও হাদিসের ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন না হতো এবং তাবিল বৈধ না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন আয়াত অবতীর্ণ করতেন না, মুফাসসিরগণ যে-সকল আয়াতের তাবিল বা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য।

আল্লাহ তাআলা জানেন সালাফি নামে একটি দল বের হবে, যারা মানুষকে এমন মিষ্টি মিষ্টি স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেবে, তাই তিনি নিজের সিফাতরূপে এবং নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে এমন আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যা তাবিল বা ব্যাখ্যা করা অবশ্যক, বরং তাবিল না করলে গোমরাহ হয়ে যাবে। সুতরাং কুরআন ও হাদিসে যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবেই ঈমান আনব, কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব না, এটা হচ্ছে ধোঁকা, প্রতারণা।

সুতরাং আপনি ভাই দয়া করে আপনার শায়েখদের নিকট প্রশ্ন করুন যে, শায়েখ! আমরা যে বলি, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন আমরা সেভাবেই ঈমান রাখি, কোনোরূপ তাবিল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না, আমাদের এই মূলনীতিটা ঠিক কোথায় প্রয়োগ হবে?

১. পুরো কুরআনে?

২. আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে?

৩. নাকি শুধু আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের মাঝে?

এরপর দেখুন আপনাদের তথাকথিত শায়েখগণ কী লম্ফ দেন। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের প্রদত্ত জবাবগুলো আমার দেওয়া সামান্য কয়েকটি দলিলের আলোকে মিলিয়ে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন, দেখবেন সবকিছু একদম সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে এটাও জিজ্ঞেস করতে ভুল করবেন না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় বলেছেন, ওপরের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত ও হাদিস এবং নামধারী সালাফিদের দলিলসমূহের মাঝে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না, এ ছাড়া বাকি সকল আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

যে-সকল আয়াত ও হাদিস আল্লাহ তাআলাকে বিভিন্ন দিকে, স্থানে থাকা ও বান্দার সাথে সাদৃশ্য বোঝায়, এ সকল আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম গাজালি রহ.-এর দেখানো পথটিই উত্তম ও নিরাপদ এবং যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন,

هو أنا نقول : الناس في هذا فريقان ؛ عوام ، وعلماء ، والذي نراه الائق بعوام الخلق : ألا يخاض بهم في هذه التأويلات بل ينزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ، ويحقق عندهم أنه موجود، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ، وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات ... زجروا عنها وقيل لهم : ليس هذا بغشكم ، فادرجوا عنه ، فلكل علم رجال ... وأما العلماء : فاللائق بهم تعرف ذلك وتفهمه ...

আমরা বলব, মানুষ দুই শ্রেণির, সাধারণ ও আলেম-ওলামা। সাধারণ মানুষের জন্য উপযুক্ত পন্থা হলো, তারা এ সকল আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে না। সাদৃশ্য ও সৃষ্ট

> বোঝায় এমন সকল বিশ্বাস থেকে তারা দূরে থাকবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে, আল্লাহ আছেন। 'কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৪১৯]

যদি (সাধারণ) মানুষেরা এ সকল আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাদের ধমকানো হবে এবং বলা হবে, এ বিষয়ে কথা বলার অধিকার তোমাদের নেই, সুতরাং তোমরা দূরে থাকো। কেননা প্রতিটি শাস্ত্রের রয়েছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পক্ষান্তরে আলেম-ওলামার জন্য উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে, তারা বিষয়গুলো ভালোভাবে জানবে ও বুঝবে।[৪২০]

❋❋❋

---

৪১৯. সুরা শুরা, ১১

৪২০. *আল-ইকতিসাদ*, ১৬৯-১৭০
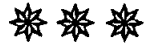
ইসতাওয়া (اسْتَوَى)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

তারপর তিনি আরশে ইসতাওয়া।[৪২১]

ইসতাওয়া শব্দটি নিয়ে বেশ মতানৈক্য আছে। কয়েকটি মত এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমিন।

'ইসতাওয়া' শব্দটির অর্থ করা হবে, না হবে না, এ নিয়ে দুটি মাজহাব—

১. এক মাজহাবমতে, ইসতাওয়া শব্দটি আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এর কোনো অর্থ না করে তাফবিদ করাই উত্তম। তখন আয়াতের অর্থ হবে, 'আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী আরশে ইসতাওয়া।' হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ : هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى.

'ইসতাওয়া আলাল আরশ' হলো 'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। (ফলে) এর ইলম আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করতে হবে।[৪২২]

ইবনে আদিল হাম্বলি রহ. বলেন,

وإذا ثبت هذا فنقول : إن قوله تعالى : ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ من المتشابهات التي يجب تأويلها ، وللعلماء ههنا مذهبان : الأول : أن يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ، ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل ، بل نفوض علمها إلى الله تعالى ونقول : الاستواء على العرش

---

৪২১. সুরা আরাফ, ৫৪

৪২২. *ফাতহুল বারি*, ১/১৭২

صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ونكل العلم فيه إلى الله عز وجل.

যখন সুসাব্যস্ত হলো, ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ—আয়াতটি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, ফলে আয়াতটির তাবিল করা আবশ্যক। তবে (মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে) আলেমদের দুটি মাজহাব—

এক. অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা আল্লাহ তাআলা স্থান-দিক থেকে পবিত্র এবং আমরা বিস্তারিতভাবে আয়াতটির ব্যাখ্যায় যাব না, বরং তার ইলম আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করে বলব, 'আরশের ওপর ইসতাওয়া' হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ধরনহীন একটি সিফাত। মানুষের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে আয়াতের ওপর ঈমান আনা এবং এই বিষয়ের জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার নিকট অর্পণ করা।[৪২৩]

ইমাম আলুসি রহ. বলেন,

وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل هذا تفويض المراد منه إلى الله تعالى ، فهم يقولون : استوى على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزها عن الاستقرار والتمكن.

তুমি জানো, এ জাতীয় ক্ষেত্রে সালাফদের মাজহাব হচ্ছে, উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করা। ফলে তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা নিজ উদ্দেশ্য মোতাবেক আরশে ইসতাওয়া। (তবে ইসতাওয়া) ওঠা ও স্থায়ীভাবে (কোনো স্থানে) অবস্থান করার অর্থ থেকে পবিত্র।[৪২৪]

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ হাফি. লেখেন,

ثم استوى على العرش : طريقة السلف في الأمور المتشابهة تفويض العلم إلى الله وهو الأسلم.

---

৪২৩. *আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব*, ৯/১৫০
৪২৪. *রুহুল মাআনি*, ৯/১৪২

> 'তারপর তিনি আরশে ইসতাওয়া', মুতাশাবিহ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সালাফদের পদ্ধতি হচ্ছে, শব্দের জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করা আর এটাই নিরাপদ।[৪২৫]

মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪২৬]

তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

> وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ، ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيئ من خلقه لكنه مستوعلى عرشه ، كما أخبر بلا كيف ، بلا أين ، بائن من جميع خلقه.

> মোটকথা এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলার ইসতাওয়া কোনোরূপ কাত-চিত বা কুঁজো থেকে সোজা হওয়া নয়। কিংবা কোনো স্থানে অবস্থান বা আরোহণ বা ওঠাও নয়। এমনকি তাঁরই সৃষ্ট কোনো বস্তুর সংস্পর্শে থাকাও নয়, বরং যেমনটা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যাবতীয় 'কোথায়' ও 'কীভাবে' জাতীয় প্রশ্নের উর্ধ্বে, এমনকি সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে আরশে ইসতাওয়া।[৪২৭]

শায়েখ আহমাদ নাফরাবি রহ. বলেন,

> والحاصل: أنه يجوز إطلاق لفظ الفوقية غير المقيدة بلفظ "الذات" على الله تعالى ، فيجوز قول القائل: الله فوق سمائه أو: فوق عرشه ، وتحمل على فوقية الشرف والجلال والسلطة والقهر ، لا فوقية حيز ومكان ، لاستحالة الفوقية الحسية عليه تعالى.

> সারকথা হলো, জাত বা সত্তা শব্দ যুক্ত না করে[৪২৮] 'ওপর' শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহার জায়েজ। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ আসমানের ওপরে বা আরশের ওপর, তাহলে এ কথা জায়েজ। তখন

---

৪২৫. *আত-তারিকু ইলা তাফসিরিল কুরআনিল কারিম*, ২/৩৯
৪২৬. *তাওজিহুল কুরআন*, ১/৪৬০
৪২৭. *আল-ইতিকাদ ওয়াল-হিদায়া*, ১২১-১২২
৪২৮. যেমন এভাবে বলা, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে আসমানের ওপর বা আরশের ওপর আছেন।

(অর্থ হবে) সম্মান-মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও প্রভাবের দিক থেকে ওপরে থাকা। জায়গা ও স্থানের দিক থেকে ওপরে থাকা নয়। (কেননা আমরা ওপর বলতে যে দিক বুঝি, তা) আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব।[৪২৯]

শায়েখ মুহাম্মাদ আহমাদ কানআন বিষয়টা আরও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন,

أننا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش ، وهو فوق العرش كما قال، لا كما يخطر بالبال ، لكن : لا يجوز أن يوصف استواؤه تعالى بأنه استواء استقرار وتمكن وجلوس واتصال ومماسة ، ولا بأنه في جهة من الجهات الست للعرش ولا لسواه.

আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই তিনি আরশে ইসতাওয়া, বা আরশের ওপর। সেভাবে নয়, যেভাবে আমরা ভাবি। কিন্তু তাঁর এই ইসতাওয়াকে 'আরশে ওঠা, অবস্থান করা, বসা, যুক্ত বা সংস্পর্শ করা' ইত্যাদি অর্থে ব্যক্ত করা জায়েজ হবে না। সেইসাথে এটি বলাও জায়েজ হবে না যে, তিনি আরশ কিংবা অন্য যেকোনোকিছুর ছয় দিকের কোনো একটি দিকে আছেন।[৪৩০]

শায়েখ সাইদ ফুদা হাফি. বলেন,

ومن أطلق من أهل السنة الفوقية فوق المخلوقات أو أطلق أنه فوق العرش فلم يرد التحديد ولا التشبيه ، ولم يرد المكان والتحيز كما بينا غير مرة ، بل يريد إطلاقه على ما يليق بالله تعالى مما لا يمكن لنا بعقولنا أن ندركه.

আহলে সুন্নাতের মধ্যে যারা বলেছেন, (আল্লাহ তাআলা) সকল মাখলুকের ওপর আছেন অথবা তিনি আরশের ওপর আছেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল না (আল্লাহর জন্য) কোনো সীমা নির্ধারণ করা এবং (তাঁকে) তাশবিহ বা উপমা দেওয়া এবং (তাঁর জন্য) কোনো স্থান বা স্থানে থাকা (সাব্যস্ত করাও) তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যা ইতিপূর্বে

---

৪২৯. *আল-ফাওয়াকিহু দাওয়ানি*, ১/৭৮
৪৩০. *জামিউল লালি শরহু বাদয়িল আমালি*, ১১২

কয়েকবার উল্লেখ করেছি, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর শান উপযোগী অর্থে কথাটা বলা, যা আমাদের আকল-বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব না।[৪৩১]

অর্থাৎ সালাফগণ 'তিনি আরশে ইসতাওয়া' বা 'তিনি আরশের ওপর'-জাতীয় কিছু বললেও, তা দ্বারা তারা মোটেও কোনো স্থানে ওঠা বা অবস্থানের আকিদা রাখতেন না।

২. আরেক মাজহাবমতে, ইসতাওয়া (اسْتَوَى) শব্দটি অর্থযোগ্য। তবে তা কি আল্লাহ তাআলার সত্তাগত সিফাত না কর্মগত সিফাত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে দুটি মত—

ক. প্রথম মত : 'ইসতাওয়া' হলো আল্লাহ তাআলার সত্তাগত সিফাত এবং এর অর্থ হলো علا—তথা সমুন্নত হওয়া।

সে ক্ষেত্রে اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ-এর অর্থ করা হবে, আল্লাহ তাআলা আরশে সমুন্নত। ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. এ মতটিকে সঠিক বলেছেন।[৪৩২]

তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। এখানে 'সমুন্নত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদাগত দিক থেকে তিনি সমুন্নত ও সর্বোচ্চ, স্থানগত দিক থেকে নয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس.

ওপর ও নিচ, এ দুটি দিক আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাঁকে সর্বোচ্চ ও সমুন্নত গুণে গুণান্বিত করা যাবে না, কেননা তাঁর সমুন্নত হওয়াটা হলো অর্থগত দিক থেকে, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে সমুন্নত বা ওপর (দিক তাঁর জন্য) অসম্ভব।[৪৩৩]

খ. দ্বিতীয় মত : ইসতাওয়া (اسْتَوَى) হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত সিফাত। এখানে বেশ কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। যার মধ্যে প্রসিদ্ধ চারটি মত উল্লেখ করছি—

---

৪৩১. *আশ-শারহুল কাবির*, ২/৯৬৩
৪৩২. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪৮৩
৪৩৩. *ফাতহুল বারি*, ৬/১৭৪

১. ইমাম রাজি রহ.-সহ বেশ কয়েকজন ইমামের মত হচ্ছে, اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ-এর উদ্দেশ্য হলো, কার্যত আল্লাহ তাআলার পরিচালনা শুরু হওয়া। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾

> নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশে ইসতাওয়া। তিনি (সকল) বিষয় পরিচালনা করেন।[৪৩৪]

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ-এর পর يُدَبِّرُ শব্দটা আছে, যার অর্থ হলো পরিচালনা করা। অর্থাৎ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর কার্যত তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রয়োগ শুরু হলো।

যদিও তিনি সৃষ্টির পূর্বে সকলকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি না থাকার কারণে কার্যত কোনো প্রয়োগ ছিল না। যেমন জীবন ও মৃত্যুদাতা, এই গুণ সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বেও তাঁর ছিল। তবে তার কার্যকারিতা শুরু হয়েছে প্রাণী সৃষ্টির পর। অনুরূপ রিজিকদাতা, এই গুণও তাঁর পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু কার্যকারিতা শুরু হয়েছে মাখলুক সৃষ্টির পর তাদেরকে রিজিক দানের মাধ্যমে। ঠিক তেমনই পূর্ব থেকেই তিনি সকলকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকলেও সৃষ্টি না থাকার দরুন কার্যত পরিচালনা ছিল না। ফলে আসমান জমিন সৃষ্টির পর কার্যত সকলকিছুতে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রয়োগ শুরু হয়।

কুরআনে যে সাতটি স্থানে اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ এসেছে। প্রতিটি আয়াতের পরবর্তী অংশ নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, তিনি নির্দিষ্ট একটি জিনিস পরিচালনা করছেন বা কোনো একটি জিনিস একমাত্র তাঁরই মালিকানাধীন, এমন কিছু বোঝাচ্ছে।

---

৪৩৪. সূরা ইউনুস, ৩

এসব কারণে ইমাম রাজি রহ.-সহ কতক ইমামের মত হলো, اسْـتَوَى عَلَى الْعَـرْشِ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কার্যত সৃষ্টির মাঝে তাঁর ক্ষমতা, পরিচালনা ও ইচ্ছার প্রয়োগ শুরু হওয়া।[৪৩৫]

২. ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

> ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلا سماه رزقا ونعمة.
>
> আবুল হাসান আশআরির মত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আরশে একটি কর্ম সম্পাদন করেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'ইসতাওয়া', যেমন অন্য কোথাও তিনি ভিন্ন কোনো কর্ম সম্পাদন করে তার নাম দেন রিজিক ও নেয়ামত।[৪৩৬]

৩. তৃতীয় আরেকটি মত হচ্ছে, ইসতাওয়া (اسْتَوَى)-এর অর্থ হলো استولى—অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করলেন। ইবনুল মুবারক রহ. বলেন,

> عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى : اسْتَوَىٰ : استولى.
>
> 'ইসতাওয়া'-এর অর্থ হলো 'ইসতাওলা'।[৪৩৭]

'ইসতাওলা' (اسـتولى) অনুসারে আয়াতের তরজমা হবে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর নিজ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করলেন।

৪. দেহবাদীরা ইসতাওয়া শব্দটির পাঁচটি অর্থ করে থাকে। যেমন—

ক. الاستقرار—তথা ওঠা বা স্থায়ীভাবে (কোনো স্থানে) অবস্থান করা।

খ. العلو—স্থানগতভাবে সমুন্নত হওয়া।

গ. الصعود—আরোহণ করা।

ঘ. الارتفاع—স্থানগতভাবে ঊর্ধ্বগমন করা।

---

৪৩৫. *আত-তাফসিরুল কাবির*, সুরা আরাফ, ৫৪
৪৩৬. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৩৮০
৪৩৭. *গারিবুল কুরআন ওয়া তাফসিরুহু*, ২৪৩

৬. الجلوس—বসা।

আমাদের দেশের সাধারণ ঈমানদার ভাইগণ নামধারী সালাফি শায়েখদের নামের আগে-পরে বিশাল ভারী ভারী ডিগ্রি দেখে অনেক সময় ধাঁধায় পড়ে বিশ্বাস করেন যে, ইসতাওয়ার সঠিক ব্যাখ্যা মনে হয় তারা যা বলছে তা-ই। অথচ ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

> قالت الجسمية : معناه الاستقرار ... وأما قول المجسمة ففاسد أيضا لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهى وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات.
>
> দেহবাদীরা বলে ইসতাওয়ার অর্থ হলো ওঠা বা স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থান করা।... তাদের এ কথা বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য। কেননা ওঠা ও স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থান করা, এটা দেহের গুণাগুণ; এর দ্বারা হুলুল তথা সৃষ্টির সাথে মিশে যাওয়া ও সীমা-পরিসীমা সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহর বেলায় এ সবকিছু অসম্ভব। এগুলো তো বরং মাখলুকের জন্য প্রযোজ্য।[৪৩৮]

আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

> صانع العالم ليس بمتمكن في مكان ، وعند المشهبة والمجسمة والكرامية متمكن على العرش لقوله تعالى ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾.
>
> বিশ্বজগতের স্রষ্টা কোনো স্থানে অবস্থান করেন না। (কিন্তু) সাদৃশ্যবাদী, দেহবাদী ও কাররামিয়াদের নিকট (আল্লাহ তাআলা) আরশে অবস্থান করেন। দলিল তাঁর এই কথা, 'রহমান আরশে ইসতাওয়া'।[৪৩৯]

কামালুদ্দিন মাকদিসি রহ. বলেন,

> والحشوية – وهم المجسمة – يصرحون بالاستقرار على العرش ، وتمسكوا بظواهر ، منها قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾.

---

৪৩৮. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪৮৩

৪৩৯. *আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ১৬৪

আর হাশাবি সম্প্রদায়ই হলো দেহবাদী। যারা পরিষ্কার আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আরশের ওপর ওঠা ও অবস্থানের দাবি করে। এ ক্ষেত্রে কিছু আয়াত-হাদিসের বাহ্যিক অর্থকে তারা দলিল হিসাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো 'রহমান আরশে ইসতাওয়া'।[৪৪০]

আকমালুদ্দিন বাবারতি রহ. বলেন,

ذهبت المشبهة والمجسمة والكرامية إلى أنه تعالى متمكن على العرش ، واحتجوا بقوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى).

সাদৃশ্যবাদী, দেহবাদী ও কাররামিয়াদের মত হলো, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর অবস্থান করেন। দলিল হিসাবে তারা এই আয়াত পেশ করে, 'রহমান আরশে ইসতাওয়া।'[৪৪১]

কাসতাল্লানি রহ. বলেন,

وقالت المجسمة : معناه الاستقرار ودفع بأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول وهو محال في حقه تعالى.

দেহবাদীরা বলে, (ইসতাওয়া) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ইসতিকরার' বা ওঠা ও অবস্থান করা। অথচ ওঠা ও অবস্থান করা দেহের গুণাগুণ। যা থেকে অন্য বস্তুর সাথে মিশে যাওয়া সাব্যস্ত হয়, ফলে এ অর্থ আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।[৪৪২]

ইসতাওয়া শব্দের অর্থ ইসতিকরার ও জুলুস বা ওঠাবসা না করা

১. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

نقر بأن الله تعالى على العرش استوى ، من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه ، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالَم وتدبيره كالمخلوقين ، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

---

৪৪০. *আল-মুসামারা*, ১৮৫
৪৪১. *শারহুল ওয়াসিয়্যা*, ৯৮
৪৪২. *ইরশাদুস সারি*, ১৫/৩৮৬

আমরা এটা স্বীকার করি যে, আরশের প্রতি কোনোরূপ মুখাপেক্ষিতা এবং আরশের ওপর ওঠা ও অবস্থান গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলা আরশে ইসতাওয়া[৪৪৩]। কোনোপ্রকার মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই তিনি আরশ ও অন্যান্য সবকিছুর সংরক্ষণকারী। সৃষ্টিজীবের মতো যদি মুখাপেক্ষীই হতেন, তবে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও তা পরিচালনায় তিনি সক্ষম হতেন না। (একইভাবে) আরশের ওপর বসা, ওঠা ও অবস্থানের মুখাপেক্ষীও যদি হতেন তিনি, তাহলে (প্রশ্ন জাগে,) আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন? কাজেই তিনি এ সবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ও পবিত্র।[৪৪৪]

২. ইমাম শিরাজি রহ. বলেন,

---

৪৪৩. শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া হাফি. 'ইসতাওয়া' শব্দটির অর্থ 'ইসতিকরার' বা ওঠা ও অবস্থান করার পক্ষে। তিনি মনে করেন এটাই সঠিক ও কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত অর্থ এবং সালাফদের বিশ্বাস। এজন্য তিনি তার কিতাবের নামকরণ করেছেন 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন'। শায়েখ এই কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্যের 'من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه' অংশের তরজমা করেছেন, 'তবে সেটার প্রতি প্রয়োজনীয়তা কিংবা সুস্থিরতার জন্য।' (পৃষ্ঠা ১৬৭)

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. غير শব্দ ব্যবহার করে 'ইসতাওয়া' শব্দটি থেকে 'প্রয়োজনীয়তা ও ওঠা' অর্থকে নাকচ করছেন আর শায়েখ غير শব্দটির অর্থ বাদ দিয়ে 'প্রয়োজনীয়তা ও ওঠা' অর্থকে আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করছেন। এত বড় একটা ইলমি খেয়ানতের মাধ্যমে শায়েখ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা ও শায়েখের আকিদা অভিন্ন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও আমাদের আকিদা ভিন্ন। আমাদের আকিদা হচ্ছে জাহমিয়াদের আকিদা আর শায়েখের আকিদা হচ্ছে সালাফদের আকিদা। নাউজুবিল্লাহ।

শায়েখের এই কিতাবের বড় একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি এমন বহু ইলমি খেয়ানত ও বিকৃতির মাধ্যমে অনেক সাহাবি ও ইমামকে নামধারী সালাফি আকিদার অনুসারী বানাতে সক্ষম হয়েছেন। নাউজুবিল্লাহ। এজন্য আমার মতে নামধারী সালাফি আকিদার ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর, ১. জাল-জয়িফ বর্ণনা। ২. নুসুস ও ইমামদের বক্তব্যের বিকৃতি।

শায়েখ স্পষ্ট একটি সালাফবিরোধী ও দেহবাদী আকিদা প্রমাণ করতে গিয়ে এই কিতাবে সীমাহীন ইলমি খেয়ানত করেছেন। এমনকি নিজের ভুল একটি মতাদর্শ প্রমাণ করতে গিয়ে আকিদার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি জাল-জয়িফ বর্ণনা চালিয়ে দিতেও সামান্যতম ভয় করেননি, নুসুস ও ইমামদের বক্তব্যের বিকৃতি তো আছেই। আল্লাহ তাআলা শায়েখকে ক্ষমা করুন। আমিন।

ইউটিউব চ্যানেল লাব্বাইক বিডি (Labbaik bd) থেকে একটি সিরিজ শুরু করা হয়েছে। সেখানে দলিলসহ এই কিতাবে শায়েখের ইলমি খেয়ানতগুলো তুলে ধরা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা শায়েখসহ তার সকল অনুসারীকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রকৃত সালাফদের অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

চ্যানেলের লিংক : *https://www.youtube.com/labbaikbd24*

৪৪৪. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫০-৫১

وأن استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة لأن الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة والرب عز وجل قديم أزلي أبدا كان وأبدا يكون ، لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل ولا الانتقال ولا التحريك.

(আল্লাহ তাআলার) ইসতাওয়ার অর্থ অবস্থান, ওঠা ও সংস্পর্শ নয়। কেননা অবস্থান, ওঠা ও সংস্পর্শ হচ্ছে সৃষ্ট দেহের গুণ। অথচ আল্লাহ তাআলা অনাদি, অসীম। তিনি সর্বদা ছিলেন ও সর্বদা থাকবেন। তাঁর ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, স্থানান্তর ও নড়াচড়ার গুণাগুণ জায়েজ নেই।[৪৪৫]

৩. ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ، ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيئ من خلقه لكنه مستوعلى عرشه ، كما أخبر بلا كيف ، بلا أين ، بائن من جميع خلقه.

মোটকথা, এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলার ইসতাওয়া কোনোরূপ কাত-চিত বা কুঁজো থেকে সোজা হওয়া নয়। কিংবা কোনো স্থানে অবস্থান বা আরোহণ বা ওঠাও নয়। এমনকি তাঁরই সৃষ্ট কোনো বস্তুর সংস্পর্শে থাকাও নয়। বরং যেমনটা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যাবতীয় 'কোথায়' ও 'কীভাবে' জাতীয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, এমনকি সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে আরশে ইসতাওয়া।[৪৪৬]

৪. ইমাম গাজালি রহ. বলেন,

ندعي : أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش.

আমাদের দাবি হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা আরশে ওঠা বা আরশে স্থায়ীভাবে অবস্থানের গুণ থেকে চিরপবিত্র।[৪৪৭]

৫. ইবনুল আরাবি আল-মালিকি রহ. বলেন,

---

৪৪৫. আল-ইশারাতু ইলা মাজহাবি আহলিল হক, ১৫০

৪৪৬. *আল-ইতিকাদ ওয়াল-হিদায়া*, ১২১-১২২

৪৪৭. *আল-ইকতিসাদ*, ১৬৮

للاستواء في كلام العرب خمسة عشر وجها ما بين حقيقة ومجاز، منها ما يجوز على الله فيكون معنى الآية، ومنها ما لا يجوز بحال، وهو إذا كان الاستواء بمعنى التمكين والاستقرار والاتصال والمجاورة فإن شيئا من ذلك لا يجوز على الباري تعالى.

আরবদের কথায় বাস্তবিক ও রূপক মিলিয়ে 'ইসতাওয়া' শব্দটির ১৫টি অর্থ রয়েছে। কিছু অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বৈধ, তখন সে অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে। আর কিছু অর্থ কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেমন ইসতাওয়ার অর্থ যদি করা হয় স্থায়ীভাবে অবস্থান করা, ওঠা, যুক্ত ও সংস্পর্শ, তাহলে এগুলোর কোনো অর্থই আল্লাহর ক্ষেত্রে বৈধ হবে না।[৪৪৮]

৬. ইবনে আসাকির রহ. বলেন,

وأنه استوى على العرش على الوجه الذي قاله، بالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال.

(আল্লাহ তাআলা) যে উদ্দেশ্য ও অর্থে নিয়েছেন, (সে অর্থ ও উদ্দেশ্যে) তিনি আরশে ইসতাওয়া। (তাঁর ইসতাওয়া) সংস্পর্শ, ওঠা, অবস্থান, মিশে যাওয়া ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র।[৪৪৯]

৭. ইবনুল জাওজি রহ. বলেন,

ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة، والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين، والقائل بهذا شبه وجسم... فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار والتمكن فقد ساوى بينه عز وجل وبين خلقه.

একটি জ্ঞাত বিষয় হচ্ছে, ইসতাওয়া শব্দটির অর্থ যদি ওঠা, অবস্থান ও বসা করা হয়, তাহলে (দুটি জিনিসের মাঝে) পরস্পর সংস্পর্শ সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর সংস্পর্শ দেহ ও

---

৪৪৮. *আল-মাসালিক ফি শারহি মুয়াত্তা মালিক*, ৩/৪৫২
৪৪৯. *তাবয়িনু কাজিবিল মুফতারি*, ৫৫২

আয়তনবিশিষ্ট দুটি জিনিসের মাঝে হয়ে থাকে। সুতরাং যে (ইসতাওয়া শব্দটির) অর্থ ওঠা ও অবস্থান করবে, সে আল্লাহ তাআলাকে উপমা দিলো এবং তাঁকে দেহবিশিষ্ট সাব্যস্ত করল। 'ইসতাওয়া আলাল আরশ'-কে ওঠা ও অবস্থানের অর্থে নেওয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে সমমান সাব্যস্ত করা।[৪৫০]

৮. ইমাম রাজি রহ. বলেন,

فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش.

জেনে রাখো, ইসতাওয়া থেকে এটা মোটেও উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ আরশের ওপর উঠলেন বা অবস্থান করেন।[৪৫১]

استواء-এর অর্থ যে الاستقرار على العرش—তথা আরশে ওঠা বা অবস্থান করা না, এর পক্ষে মোট ১০টি দলিল উপস্থাপনের পর ইমাম রাজি রহ. লেখেন,

ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرار ، فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدرة وجريان أحكام الإلهية ، وهذا مستقيم على قانون اللغة.

উল্লিখিত দলিলের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, 'ইসতাওয়া' দ্বারা 'ইসতিকরার' তথা আরশে ওঠা ও অবস্থান উদ্দেশ্য নয়। এখানে বরং উদ্দেশ্য হলো, শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করা এবং প্রভুসুলভ ক্ষমতা ও বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা। বলাবাহুল্য, ব্যাকরণ অনুসারে এই অর্থটি সঠিক।[৪৫২]

৯. ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিন আবদিস সালাম রহ. বলেন,

وأنه استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله ، بالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والانتقال.

---

৪৫০. *দাফউ শুবাহি মান তাশাব্বাহা*, ১৮

৪৫১. *আত-তাফসিরুল কাবির*, ১৪/৮৩

৪৫২. *তাসিসুত তাকদিস*, ২০০

(আল্লাহ তাআলা) যে উদ্দেশ্য ও অর্থে নিয়েছেন, (সে অর্থ ও উদ্দেশ্যে) তিনি মর্যাদাবান আরশে ইসতাওয়া। (তাঁর ইসতাওয়া) সংস্পর্শ, ওঠা, অবস্থান ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র।[৪৫৩]

১০. ইমাম বাইজাবি রহ. বলেন,

والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن.

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি আরশে ইসতাওয়া। তাঁর ইসতাওয়া ওঠা ও স্থায়ীভাবে অবস্থান করা থেকে পবিত্র।[৪৫৪]

১১. আবু হাইয়ান আন্দালুসি রহ. বলেন,

وإما استواؤه على العرش فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم ، والجمهور من السلف السفيانان ومالك والأوزعي والليث وابن المبارك وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان بها وإمرارها على ما أراد الله تعالى من غير تعيين مراد.

একটি সম্প্রদায় (আল্লাহ তাআলার) আরশে 'ইসতাওয়াকে' বাহ্যিক অর্থে নিয়ে সত্তাগতভাবে তাঁর আরশে অবস্থান ও ওঠার অর্থ করে থাকে। তবে সিফাতের হাদিসের ক্ষেত্রে সালাফদের অধিকাংশ, যেমন সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মালেক, আওয়াজি, লাইস, ইবনুল মুবারকসহ অন্যান্য সকলের মত হচ্ছে (সিফাতের হাদিসের ওপর) ঈমান আনা এবং কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট না করে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা।[৪৫৫]

১২. ইমাম নাসাফি রহ. বলেন,

وتفسير العرش بالسرير ، والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل ، لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان وهو الآن كما كان.

---

৪৫৩. *তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা*, ৩/৩৬০

৪৫৪. *তাফসিরে বাইজাবি*, ৩/১৬

৪৫৫. *আল-বাহরুল মুহিত*, ৫/৬৫

সাদৃশ্যবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী আরশের ব্যাখ্যা সিংহাসন করা এবং ইসতাওয়ার ব্যাখ্যা অবস্থান ও ওঠা করা বাতিল। কেননা তিনি আরশ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং ছিলেন যখন কোনো স্থান ছিল না, ফলে তিনি এখনো তেমন আছেন, (এসব সৃষ্টির পূর্বে) তিনি যেমন ছিলেন।[৪৫৬]

১৩. খাতিব শারবিনি রহ. বলেন,

قال أهل السنة : الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالى ، والمعنى أنه له سبحانه وتعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزه عن الاستقرار والتمكن.

আহলে সুন্নাত বলেন, 'ইসতাওয়া আলাল আরশ' হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ধরনহীন একটি সিফাত। যার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক এবং এই বিষয়ের জ্ঞান তাঁর নিকট সোপর্দ করতে হবে। (আয়াতের অর্থ হচ্ছে) আল্লাহ তাআলা তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী আরশে ইসতাওয়া। (তাঁর ইসতাওয়া) ওঠা ও অবস্থান থেকে পবিত্র।[৪৫৭]

১৪. আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন,

أما الاستواء بمعنى جلوسه تعالى عليه فهو باطل لا يذهب إليه إلا غبي أو غوي.

ইসতাওয়া শব্দটির অর্থ বসা করলে তা বাতিল হবে। এমন অর্থ নির্বোধ বা পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।[৪৫৮]

১৫. আল্লামা কাওসারি রহ. বলেন,

ومن أنكر أن الرحمن على العرش استوى فقد أنكر آية من الذكر الحكيم فيكفر ، لكن الاستواء الثابت له جل جلاله استواء يليق بجلاله

---

৪৫৬. *তাফসিরুন নাসাফি*, ১/৫৭৩
৪৫৭. *আস-সিরাজুল মুনির*, ১/৪৮০
৪৫৮. *ফাইজুল বারি*, ৬/৫৬৩

على مراد الله ومراد رسوله من غير خوض في المعنى كما هو مسلك السلف . ومنهم ابن المهدي ، ومسلك الخلف الحمل على الملك ونحوه على مقتضى اللغة وليس في ذلك إنكار الآية فحاشاهم من ذلك ، وأما حمله على الجلوس والاستقرار فهو الزيغ المبين.

যদি কেউ 'আল্লাহ তাআলা আরশে ইসতাওয়া'—এটাকে অস্বীকার করে তাহলে সে প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের একটি আয়াতকে অস্বীকার করল, ফলে সে কাফের হয়ে যাবে।

সালাফদের মাজহাব হচ্ছে, কোনো অর্থ নির্ধারণ ছাড়া আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য ও তাঁর শান উপযোগী হয় এমনভাবে ইসতাওয়াকে সাব্যস্ত করা। যেমন ইবনুল মাহদি (করেছেন)। কিন্তু খালাফ ও পরবর্তীদের মাজহাব হচ্ছে রাজত্ব বা আরবি ভাষায় সমর্থিত একটি অর্থে নেওয়া। কিন্তু এই অর্থ নেওয়া দ্বারা আয়াতকে অস্বীকার করা হয় না। আর কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গর্হিত কুফরি থেকে তারা পবিত্র। কিন্তু 'ইসতাওয়া' শব্দটিকে বসা, অবস্থান ও ওঠার অর্থে নেওয়া স্পষ্ট গোমরাহি।[৪৫৯]

১৬. আহমাদ রিফায়ি রহ. বলেন,

أي سادة! نزهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار ...

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : من زعم أن الله في شيئ أو من شيئ أو على شيئ فقد أشرك ، إذ لو كان على شيئ لكان محمولا ولو كان في شيئ لكان محصورا ولو كان من شيئ لكان محدثا.

সম্মানিত পাঠক! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে সর্বপ্রকার সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ থেকে পবিত্র বিশ্বাস করো। আর তাঁর ক্ষেত্রে 'ইসতাওয়া' শব্দের অর্থ 'ইসতিকরার' বা ওঠা ও অবস্থান করা থেকে তোমরা তোমাদের আকিদাকে পবিত্র করো।

---

৪৫৯. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২৪১

> ইমাম জাফর আস-সাদিক আ. বলেন, যে বিশ্বাস করবে আল্লাহ তাআলা কোনোকিছুর মাঝে আছেন বা কোনোকিছু থেকে এসেছেন বা কোনোকিছুর 'ওপর' আছেন, তাহলে সে শিরক করল। কেননা তিনি যদি কোনোকিছুর ওপর থাকেন তাহলে তিনি বহনযোগ্য। আর যদি তিনি কোনোকিছুর মাঝে থাকেন তাহলে তিনি বেষ্টিত। আর যদি তিনি কোনোকিছু থেকে হন তাহলে তিনি সৃষ্ট।[৪৬০]

মাত্র ১৬ জন ইমাম থেকে প্রমাণ দেওয়া হলো যারা সকলে একমত যে, 'ইসতাওয়া' শব্দটির অর্থ 'ইসতিকরার' ও 'জুলুস' বা ওঠাবসা করা যাবে না। পূর্বযুগের পথভ্রষ্ট সাদৃশ্যবাদী ও দেহবাদীগণ ইসতাওয়ার অর্থ করত ইসতিকরার, তথা আরশে ওঠা ও অবস্থান করা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আকিদা ছিল, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে শুধু আরশে আছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পূর্বেকার সেই পথভ্রষ্ট দেহবাদী একটি আকিদাকে নামধারী সালাফি শায়েখরা বাংলাদেশে 'সহিহ আকিদা' নামে প্রচার করছে এবং সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের একটি ভুল ও সালাফবিরোধী আকিদার অনুসারী বানিয়ে গোমরাহ ও বিভ্রান্ত করছে। শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া হাফি. তো 'ইসতিকরার' শব্দের ওপর ভিত্তি করে নিজ কিতাবের নামকরণ করেছেন 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন' এবং প্রচার করেছেন, এটাই কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত অর্থ এবং এটাই সালাফদের আকিদা। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

৪৬০. *আল-বুরহানুল মুয়াইয়াদ*, ১৬/১৯
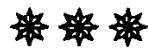
সারকথা

ইসতাওয়ার অর্থ করা হবে, না হবে না, এ ব্যাপারে দুটি মাজহাব—

১. অর্থ করা হবে না, বরং তাফবিদ করাই উত্তম। তখন আয়াতের অর্থ হবে, 'আল্লাহ তাআলা (নিজ শান অনুযায়ী) আরশে ইসতাওয়া।'

২. অর্থ করা হবে।

তবে 'ইসতাওয়া' কি আল্লাহ তাআলার সত্তাগত সিফাত না কর্মগত, তা নিয়ে আবার দুটি মত—

ক. সত্তাগত সিফাত। সে ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, 'আল্লাহ আরশে সমুন্নত।'

খ. কর্মগত সিফাত। এখানে আবার মতানৈক্য আছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চারটি—

১. কর্মগত সিফাত বটে, তবে আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কার্যত সৃষ্টির মাঝে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রয়োগ শুরু হওয়া।

২. কর্মগত সিফাত হলেও ইসতাওয়ার অর্থ হচ্ছে ইসতাওলা (استولى)। তখন আয়াতের অর্থ হবে, 'আল্লাহ আরশের ওপর নিজ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করলেন।'

৩. আরশে আল্লাহ তাআলা কোনো একটি কর্ম সম্পাদনের নাম তিনি দিয়েছেন 'ইসতাওয়া'। অন্যান্য কর্মের যেমন তিনি আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন, যেমন রিজিক দান, জীবন দান ও মৃত্যু দান করা ইত্যাদি।

৪. কর্মগত সিফাত, তবে 'ইসতাওয়া'-এর অর্থ হচ্ছে—

ক. الاستقرار—আরশে ওঠা ও আরশে অবস্থান করা।

খ. العلو—স্থানগতভাবে সমুন্নত হওয়া।

গ. الصعود—আরোহণ করা।

ঘ. الارتفاع—স্থানগতভাবে ঊর্ধ্বগমন করা।

ঙ. الجلوس—বসা।

তখন আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ আরশে উঠলেন বা আরোহণ করলেন বা বসলেন ইত্যাদি।

আকিদার সারাংশ

সর্বোত্তম আকিদা হলো, 'ইসতাওয়া' শব্দটিকে আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা এবং এর কোনোরূপ অর্থ গ্রহণ না করে তাফবিদ করে বলা, আল্লাহ তাআলা (নিজ শান অনুযায়ী) আরশে ইসতাওয়া। এটাই উত্তম এবং নিরাপদ। অথবা ইচ্ছা হলে 'ইসতাওয়া' শব্দটিকে সত্তাগত সিফাত ধরে এভাবে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা আরশে সমুন্নত। কিংবা 'ইসতাওয়া' শব্দটিকে কর্মগত সিফাত ধরে ইমাম আশআরি রহ. অথবা ইমাম রাজি রহ.-এর মতানুসারেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আবার ইবনুল মুবারক রহ.-এর অর্থ অনুসারেও তরজমা করা যেতে পারে। তবে এই অর্থের পক্ষে যেমন অনেকে মত দিয়েছেন, তেমনই কেউ কেউ তা নাকচও করেছেন।

পক্ষান্তরে 'ইসতাওয়া'-কে কর্মগত সিফাত ধরে এমন অর্থ করা, ক. তিনি আরশে উঠলেন, খ. আরোহণ করলেন, গ. স্থানগতভাবে আরশে সমুন্নত, ঘ. স্থায়ীভাবে আরশে অবস্থান করেন, ঙ. তিনি আরশে বসলেন ইত্যাদি, তাহলে তা স্পষ্ট গোমরাহি হবে। কাজেই এগুলোর কোনোটিই করা যাবে না। কেননা এগুলো সরাসরি পথভ্রষ্ট সাদৃশ্যবাদী ও দেহবাদী ফেরকার মত ও আকিদা, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মত ও আকিদা নয়।
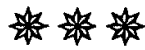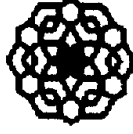
আহলে সুন্নাত ও সালাফিদের মধ্যে আস-সিফাতুল খাবারিয়া-সংক্রান্ত তফাত

নামধারী সালাফিরা আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে সিফাত বলে স্বীকার করে। অনুরূপ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতও আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে সিফাত বলেই স্বীকার করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মাঝে কোনো তফাত নেই। তবে হ্যাঁ, এটা ছাড়া মোট তিনটি বিষয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে—

ক. সিফাতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা না-করা।

খ. সিফাতের ধরন সাব্যস্ত করা না-করা।

গ. আস-সিফাতুল খাবারিয়া কি صفات معان-এর অন্তর্ভুক্ত, না صفات أعيان-এর অন্তর্ভুক্ত?

এবার আসা যাক ব্যাখ্যায়—

ক. আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত সিফাত হিসাবে সাব্যস্ত করেন বটে, তবে আল্লাহ তাআলার শানের সাথে উপযোগী নয় এমন অর্থকে তারা নাকচ করে দেন। যেমন يد বা হাত, এখানে তারা يد-কে সিফাতরূপে সাব্যস্ত করলেও শব্দটির শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করেন।

পক্ষান্তরে সালাফিরা আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে হাকিকি ও বাহ্যিক অর্থে সিফাত বলে বিশ্বাস করে। ফলে তারা বলে, মানুষের যেমন হাত রয়েছে, আল্লাহ তাআলারও তেমনই হাত রয়েছে, তবে হ্যাঁ, মানুষের হাত মানুষের মতো, আর আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো।

সিফাতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের বিষয়ে কতক ইমামের বক্তব্য

ইমাম নববি রহ. বলেন,

فهو من أحاديث الصفات ... نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه **لكن نعتقد أن ظاهره غير مراد وأن لها معنى يليق بالله تعالى** ، وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين.

এটি সিফাতের হাদিস। এ জাতীয় হাদিসের ওপর আমাদের ঈমান আছে। আমরা এর অর্থ জানি না এবং কোনোরূপ তাবিলও করব না। তবে আমরা এ বিশ্বাস রাখব যে, **বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়;** বরং আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী শব্দগুলোর একটি অর্থ রয়েছে। অধিকাংশ সালাফ ও মুতাকাল্লিমিনের কতক জামাতের মাজহাব এটাই।[৪৬১]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها ، مع قطعهم باستحالة ظواهرها فيقولون : أمروها كما جاءت.

সালাফদের প্রসিদ্ধ মাজহাব হলো (সিফাতের) ব্যাখ্যা তালাশে বিভোর না হওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, **সিফাতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ অসম্ভব**। ফলে তারা বলতেন, যেটা যেভাবে এসেছে, সেটা সেভাবেই বর্ণনা করো।[৪৬২]

ইমাম আইনি রহ. বলেন,

ولها معنى يليق به وظاهرها غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين.

আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী এ শব্দগুলোর একটি অর্থ রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, **বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়** আর (এই মতের) ওপর ছিলেন অধিকাংশ সালাফ এবং মুতাকাল্লিমিনের একটি জামাত।[৪৬৩]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال ، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة ، تعالى الله عن قولهم.

'নুজুল' (অবতরণ) শব্দটির অর্থ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে, তবে একদল অবতরণকে বাহ্যিক ও বাস্তবিক অর্থে গ্রহণ করে। আর তারা

---

৪৬১. *আল-মিনহাজ*, ১২/২৯২
৪৬২. *তাফসিরে কুরতুবি*, ৫/২৩
৪৬৩. *উমদাতুল কারি*, ৯/২৬৯

হলো মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা থেকে চিরপবিত্র।[৪৬৪]

উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট যে, সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফগণ শব্দের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ নিতেন না, বরং ইবনে হাজার রহ.-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা ছিল পথভ্রষ্ট মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদীদের মাজহাব।

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত সিফাতের কোনো কাইফিয়াত তথা ধরন সাব্যস্ত করে না, বরং তারা বলে, এগুলো হচ্ছে তাঁর ধরনহীন সিফাত।

পক্ষান্তরে সালাফিরা সিফাতের পাশাপাশি কাইফিয়াত তথা ধরনও সাব্যস্ত করে। এজন্য তারা বলে, يـد তথা হাত আল্লাহ তাআলার সিফাত। কিন্তু এর ধরন কেমন তা আমরা জানি না, আল্লাহর ধরন আল্লাহর মতোই।

সিফাতের ধরন সাব্যস্তের বিষয়ে কতক ইমামের বক্তব্য

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات "بلا كيف".

কুরআনে আল্লাহ তাআলা চেহারা, হাত, নফস বলে যে-সকল শব্দ উল্লেখ করেছেন, তা মূলত তাঁর ধরনহীন গুণ।[৪৬৫]

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية.

যে-সকল হাদিস সাদৃশ্য বোঝায়, ইমাম আওজায়ি, মালেক, সুফিয়ান সাওরি ও লাইস বিন সাদ রহ.-কে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, হাদিসগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ধরনহীনভাবে সেরকমই বর্ণনা করো।[৪৬৬]

---

৪৬৪. *ফাতহুল বারি*, ৩/৩৫
৪৬৫. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬
৪৬৬. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৪১৮

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন,

> رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَمِرُّوهَا بِلاَ كَيْفٍ.
>
> ইমাম মালেক, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এবং আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত, এসব হাদিসের ক্ষেত্রে তারা বলেন, কোনো ধরন ব্যতিরেকেই তোমরা হাদিসগুলো বর্ণনা করো।[৪৬৭]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

> إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية.
>
> তবে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) দিক ও কাইফিয়াত বা ধরন থেকে চিরপবিত্র।[৪৬৮]

উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সিফাতের ক্ষেত্রে কোনো কাইফিয়াত তথা ধরন সাব্যস্ত না করাই ছিল সালাফদের মানহাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি।

কাইফিয়াত সাব্যস্তের পক্ষে নামধারী সালাফিরা ইমাম মালেক রহ.-এর একটা কথা দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে। তিনি বলেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة.

বাক্যে والكيف مجهول অংশটুকু বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়, যেমন—

১. الكيف غير معقول—অর্থাৎ ধরন বোধগম্য নয় তথা অসম্ভব।[৪৬৯]

২. ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع—অর্থাৎ তবে এ কথা বলা যাবে না যে, তা কীভাবে? কেননা তাঁর ক্ষেত্রে কোনো ধরন প্রযোজ্য নয়।[৪৭০]

৩. استواؤه مجهول والفعل منه غير معقول—তথা তাঁর ইসতাওয়া অজ্ঞাত এবং কাজটি বোধগম্য নয়।[৪৭১]

---

৪৬৭. *তিরমিজি*, ৬৬২
৪৬৮. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫০৫
৪৬৯. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৩৭৯
৪৭০. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ৩৭৯
৪৭১. *আত-তামহিদ*, ৬/১৩৮

৪. سألت عن غير مجهول وتكلمت في غير معقول—অর্থাৎ তুমি অজ্ঞাত নয় এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ এবং বোধগম্য নয় এমন বিষয়ে কথা বলছ।[৪৭২]

উল্লিখিত চারটি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটির সনদকে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. জাইয়িদ (جيد) বলেছেন।[৪৭৩] আর দ্বিতীয়টির সনদকে সহিহ বলেছেন ইমাম যাহাবি রহ.।[৪৭৪]

ধরন সাব্যস্তের জন্য সালাফিরা সাধারণত দুপ্রকারের জালিয়াতি করে থাকে

এক. بلا كيف—তথা 'ধরনহীন' শব্দের অনুবাদ করে, 'ধরন আছে সত্য, কিন্তু ধরনের ইলম আমাদের নেই।' আবার কেউ অনুবাদ করে, 'সেগুলো কারও সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়', আবার কেউ করে, 'কোনোপ্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত' ইত্যাদি। অথচ আরবি ভাষার সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক আছে, সেও পরিষ্কার বুঝতে পারবে তাদের এই লুকোচুরির ব্যাপারটা।

দুই. ইমাম মালেক রহ. থেকে সহিহ বর্ণনা পেশ না করে অশুদ্ধ একটি বর্ণনা তারা দলিল হিসাব পেশ করে থাকে। ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

> فأما القول بكيفية لا يعرفها إلا هو فهو مما لم يرو عن أحد من أهل السنة البتة وإنما هو شيئ روي عن الكرامية الأولى.
>
> 'ধরন আছে কিন্তু তা তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) ছাড়া আর কেউ জানেন না', এমন কথা আহলে সুন্নাতের কারও থেকে পাওয়া যায় না, বরং তা পাওয়া যায় পূর্ববর্তী কাররামিয়াদের থেকে।[৪৭৫]

আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

> وقول بعض الكرامية إن لله تعالى كيفية لا يعرفها إلا هو، وهو فاسد.
>
> কতক কাররামিয়ার বক্তব্য হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একটি ধরন রয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। অথচ এটা (একটা) নষ্ট (কথা)।[৪৭৬]

---

৪৭২. *আত-তামহিদ*, ৬/১৩৮

৪৭৩. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৪০৮

৪৭৪. *আল-উলু*, ১৩৮

৪৭৫. *তাবসিরাতুল আদিল্লাহ*, ১/১৬৪

ইমাদুদ্দিন আহমাদ বলেন,

وأما ما يروى عنه أنه قال "الاستواء معلوم والكيفية مجهولة" فهذا لم يثبت عن مالك ولا غيره من الأئمة.

এই যে বলা হয়, 'ইসতাওয়া জ্ঞাত কিন্তু ধরন অজ্ঞাত', এমন কথা ইমাম মালেক ও অন্য কোনো ইমাম থেকে সাব্যস্ত নয়।[৪৭৭]

গ. জ্ঞান-ক্ষমতা-ইচ্ছা ইত্যাদি সিফাতের মতো আস-সিফাতুল খাবারিয়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট صفات معان—তথা 'অর্থগত' সিফাতের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে নামধারী সালাফিরা আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে মনে করে صفات أعيان, অর্থাৎ প্রতিটি সিফাত আলাদা আলাদা একটি অংশ ও অঙ্গ। যার একটি পরিমাপ ও পরিধি রয়েছে। ফলে তাদের নিকট আল্লাহ তাআলা মানুষের মতো বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গ দ্বারা গঠিত। যেমন হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি। তবে পার্থক্য হলো, মানুষের অঙ্গের ধরন জানা গেলেও আল্লাহ তাআলার অঙ্গের ধরন জানা নেই।

আল্লাহ তাআলার জন্য দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তের বিষয়ে কতক ইমামের বক্তব্য

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

تعالى .. عن الأعضاء والأدوات.

আল্লাহ তাআলা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র।[৪৭৮]

আইনি রহ. বলেন,

قد تقرر أن الله ليس بجسم.

একটি সুসাব্যস্ত বিষয় বা আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট নন।[৪৭৯]

---

৪৭৬. *আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ১৬০
৪৭৭. তাহকিক, *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২/১৫১
৪৭৮. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৫
৪৭৯. *উমদাতুল কারি*, ২৫/১৭৮

আবু হাইয়ান আন্দালুসি রহ. বলেন,

نعوذ بالله أن نكون كالكرامية ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم ونسبة الأعضاء لله.

আমরা কাররামিয়া এবং তাদের অনুসারীদের মতো হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কারণ তারা আল্লাহ তাআলার জন্য দেহ ও শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে।[৪৮০]

কুরতুবি রহ. বলেন,

الغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية ، وأن الله تعالى شخص ذو جوارح ، كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الملة.

দেহবাদী বিশ্বাস ইহুদিদের ওপর প্রবল এবং (তারা বিশ্বাস করে,) আল্লাহ তাআলা এমন এক সত্তা, যার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। যেমন ইহুদিপন্থী কট্টর হাশাবিরা এ আকিদায় বিশ্বাসী।[৪৮১]

সারকথা

নামধারী সালাফিরা আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে নিয়ে আল্লাহ তাআলার জন্য শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সেগুলোর ধরন সাব্যস্ত করে। তারপর সে ধরনের জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আস-সিফাতুল খাবারিয়াকে সিফাতরূপে স্বীকার করে, কিন্তু শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে না এবং শারীরিক কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নেয় না এবং কোনোরূপ ধরন সাব্যস্ত না করে বলে, **এগুলো আল্লাহ তাআলার ধরনহীন সিফাত বা গুণ।**

নামধারী সালাফিদের এ সকল বিভ্রান্তিকর দেহবাদী আকিদা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

❋ ❋ ❋

---

৪৮০. *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, ১/৫৩১

৪৮১. *আল-মুফহিম*, ৭/৩৮৯

কুরআন কি সৃষ্ট?

এখানে মোট পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

১. কালাম বা কথা কাকে বলে?

২. আল্লাহ তাআলার কালাম কেমন?

৩. কোন কুরআন সৃষ্ট, আর কোনটা সৃষ্ট নয়?

৪. আল্লাহ তাআলার কালাম নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত এবং মুতাজিলা ও দেহবাদীদের মধ্যকার পার্থক্য।

৫. কুরআনের চারটি স্তর।

১. কালাম বা কথা কাকে বলে?

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অভিমত হচ্ছে, কথার প্রকৃত স্থান হলো কলব তথা মন, ফলে মনের কথাকেই বলা হয় প্রকৃত কথা। তারপর শব্দ, লেখা ও ইশারা হলো মনের কথা প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾

> আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি, সেজন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?[৪৮২]

'আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন', এ কথাটি তারা শব্দে বলেনি, বরং মনে মনে বলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা মনের কথাকেই কথা হিসাবে বিবেচনা করে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, কথার প্রকৃত স্থান হচ্ছে মন।

---

৪৮২. সুরা মুজাদালা, ৮

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾

(ভাইয়েরা) বলল, যদি সে (বিন ইয়ামিন) চুরি করে থাকে, তাহলে (আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা) ইতিপূর্বে তার এক ভাইও চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বললেন, তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর। আর তোমরা যা বলছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহই ভালো জানেন।[৪৮৩]

'তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর' কথাটি ইউসুফ আ. ভাইদের শব্দে বলেননি, বরং তিনি তা মনে মনে বলেছিলেন। এ থেকেও বোঝা যায়, কথার প্রকৃত স্থান মন।

হজরত উমর রা. বলেন,

وقد زورت في نفسي مقالة.

আমি আমার মনে একটি কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম।[৪৮৪]

বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। যেমন আমি আমার সম্মানিত পাঠককে প্রশ্ন করলাম, নিশ্চুপ অবস্থায় আপনার মুখ থেকে কি কোনো আওয়াজ বের হওয়া সম্ভব?

আশা করি জবাব দেবেন যে, না, সম্ভব না।

এখন যদি প্রশ্ন করি, নিশ্চুপ থেকে আপনি কি আপনার মনের সাথে কথা বলতে পারেন?

তখন নিশ্চয় জবাব দেবেন, জি, পারি।

মূলত 'কথা' বলা হয় মনের এ কথাকেই, যার কোনো অক্ষর ও স্বর হয় না।

উল্লিখিত তিনটি দলিল ও উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূলত কথার প্রকৃত স্থান হচ্ছে মন। বাংলায় একটি প্রবাদও আছে, 'মনের কথা মনেই থাক।'

---

৪৮৩. সুরা ইউসুফ, ৭৭

৪৮৪. *সিরাতে ইবনে হিশাম*, ৪/৩১০

মনের সেই কথার না আছে কোনো অক্ষর, না আছে তার স্বর; বরং তা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হয় শব্দ, লেখা ও ইশারার।

২. আল্লাহ তাআলার কালাম কেমন?

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত বলেন, আল্লাহ তাআলা কালাম করেন। এই কালাম বা কথা তাঁর অন্যান্য সিফাতের মতোই অনাদি এবং তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সিফাত। তাতে না আছে কোনো অক্ষর আর না আছে কোনো স্বর। হিব্রু, গ্রিক বা আরবি—কোনো ভাষায়ই তাকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না, বরং আল্লাহ তাআলার কালাম তাঁর মতো। অক্ষর ও স্বর যেহেতু সৃষ্ট, তাই সৃষ্ট কিছু তাঁর সিফাত হতে পারে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة وحروف.

আমরা কথা বলি বিভিন্ন অঙ্গে ও শব্দে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কালাম করেন কোনোপ্রকার অঙ্গ ও শব্দ ছাড়া।[৪৮৫]

ইমাম গাজালি রহ. বলেন,

وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، ليس بحرف ولا صوت.

আর (কথা) আল্লাহ তাআলার সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনাদি একটি সিফাত। যা অক্ষর ও স্বর নয়।[৪৮৬]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

فلا يكون كلامه بحروف وأصوات.

তাঁর কালাম (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কথা) অক্ষর ও স্বর নয়।[৪৮৭]

৩. কোন কুরআন সৃষ্ট, আর কোনটা সৃষ্ট নয়?

কুরআনকে বলা হয় আল্লাহ তাআলার কালাম। কেননা তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কুরআন বলতে যেমন আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথাকে বোঝায়, তেমনই সকলের কাছে থাকা আরবি

---

৪৮৫. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

৪৮৬. *আল-ইকতিসাদ*, ২৫৭

৪৮৭. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫৪১

অক্ষরে লিখিত কিতাবকেও বোঝায় এবং সেখান থেকে আমাদের কোনো আয়াত পড়া ও শোনাকেও কুরআন বলা হয়। **কাজেই কেউ যদি 'কুরআন' বলে উদ্দেশ্য নেয় আল্লাহ তাআলার সত্তাগত কথা, তাহলে সেটা গায়রে মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি 'কুরআন' বলে উদ্দেশ্য নেয় সকলের কাছে থাকা আরবি অক্ষরে লিখিত 'কুরআন', অথবা আমাদের পড়া বা শোনা আয়াত, তাহলে সেটা মাখলুক তথা সৃষ্ট।** আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

> আমি তো একে বানিয়েছি আরবি ভাষার কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[৪৮৮]

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের বোঝার সুবিধার্থে তাঁর সত্তাগত কথাকে আরবি অক্ষরে প্রকাশ করেছেন।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾

> আর আমি যদি এ (কুরআন)-কে অনারবি কুরআন বানাতাম, তবে তারা নিশ্চিতভাবেই বলত, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না কেন? (এটা কেমন কথা যে, কুরআন) অনারবি আর (রাসুল) আরবি?[৪৮৯]

উল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কুরআনকে অনারবি ভাষায় সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ তখন লোকেরা বলবে, প্রেরিত রাসুল হলেন আরবিভাষী, অথচ তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব হলো অনারবি ভাষার!

কুরআনকে বলা হয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় মুজিজা। সুতরাং মুজিজা কখনো আল্লাহ তাআলার অনাদি সিফাত তথা গুণ হতে পারে না; বরং মুজিজা হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, যা তাঁর নির্দেশেই নবি-রাসুলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

---

৪৮৮. সুরা জুখরুফ, ৩
৪৮৯. সুরা হা-মিম সাজদা, ৪৪

উল্লিখিত দলিলসমূহ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথা সৃষ্ট নয়, তবে তিনি যে তাঁর সত্তাগত কথাকে আরবি অক্ষর ও স্বরের অবয়বে প্রকাশ করেছেন, সেটা মাখলুক তথা সৃষ্ট।

৪. আল্লাহ তাআলার কালাম নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত, মুতাজিলা ও দেহবাদীদের মধ্যকার পার্থক্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কালাম করেন। এই কালাম বা কথা তাঁর অন্যান্য সিফাতের মতো অনাদি ও তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সিফাত। তাতে না আছে অক্ষর আর না আছে স্বর। হিব্রু, গ্রিক বা আরবি, কোনো ভাষাতেই না তা; বরং আল্লাহ তাআলার কালাম তাঁর মতো। অক্ষর ও স্বর যেহেতু সৃষ্ট, তাই সৃষ্ট কিছু আল্লাহ তাআলার সিফাত হতে পারে না।

মুতাজিলারা আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথাকে অস্বীকার করে এবং তাদের মত অনুসারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বান্দার নিকট বার্তা পৌঁছানোর ধরন হলো, তিনি কিছু অক্ষর ও স্বর সৃষ্টি করবেন, যা তাঁর সেই অর্থকে বোঝাবে যা তিনি বান্দার নিকট পৌঁছানোর ইচ্ছা করছেন। আর দেহবাদীরা বলে, আল্লাহ তাআলার কথা অক্ষর ও স্বর দ্বারা গঠিত। তিনি যখন ইচ্ছা নিজ স্বরে কথা বলেন এবং তা তাঁর সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্মগত একটি সিফাত।

দেহবাদী ও মুতাজিলা উভয়ের বক্তব্যের ভিত্তি হলো, 'অক্ষর ও স্বর ছাড়া কখনো কথা হয় না'। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কথাকে অক্ষর ও স্বর দ্বারা গঠিত বললে সৃষ্টির কথার সদৃশ হয়ে যায়। এজন্য মুতাজিলারা আল্লাহ তাআলার সত্তাগত কালামকে অস্বীকার করে। দেহবাদীরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিভিন্ন কিতাব অক্ষর ও স্বরের গঠনে তৈরি হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত কালামকে অক্ষর ও স্বর দ্বারা গঠিত বলে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথাকে মুতাজিলাদের মতো অস্বীকার করে না, আবার দেহবাদীদের মতো অক্ষর ও স্বর দ্বারা গঠিতও বলে না, বরং তারা আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসিকে স্বীকার করে, যাতে না আছে অক্ষর আর না আছে স্বর এবং তা না হিব্রু, না গ্রিক, না আরবি, বরং তাঁর কথা তাঁরই মতো। তবে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় অক্ষর ও স্বরের অবয়বে কালামে নাফসি প্রকাশ

করেছেন। সুতরাং অক্ষর ও স্বরের অবয়বে প্রকাশটা সৃষ্ট, কিন্তু কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথা সৃষ্ট নয়।

৫. কুরআনের স্তর চারটি

ক. আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথাকে আরবি অক্ষর ও স্বরের অবয়বে প্রকাশ করেন।

খ. তারপর তিনি সেটাকে লাওহে মাহফুজে রাখেন।

গ. হজরত জিবরিল আ.-কে একবারেই পুরো কুরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে আসার আদেশ করেন।

ঘ. হজরত জিবরিল আ. আল্লাহ তাআলার নির্দেশে বিভিন্ন পেক্ষাপট এবং প্রয়োজনে ২৩ বছরে পুরো কুরআনকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করেন।

উল্লিখিত চারটি স্তরই সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি তথা সত্তাগত কথা সৃষ্ট নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আল্লাহ তাআলার কালামে নাফসি বা সত্তাগত কথা শোনা যায় না, কেননা তা অক্ষর ও স্বর দ্বারা গঠিত নয়। মুসা আ.-কে কালিমুল্লাহ বলা হয়, কেননা তিনি কিতাব ও ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া কালামে নাফসি শুনেছেন আর অন্যরা কিতাব ও ফেরেশতার মাধ্যমে কালামে নাফসি শুনেছেন। তাঁর কালামে নাফসিকে অক্ষর ও স্বরের অবয়বে বৃক্ষের নিকট রাখা হয় এবং সেই বৃক্ষ থেকে হজরত মুসা আ.-কে সম্বোধন করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

তারপর তিনি যখন তার কাছে এলেন, তখন বরকতময় ভূমিতে (অবস্থিত) উপত্যকার ডান কিনারায় এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে (বলা হয়), হে মুসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের প্রভু।[৪৯০]

❋ ❋ ❋

৪৯০. সুরা কাসাস, ৩০

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যকে সালাফিদের বিকৃতি—১

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> من قَالَ لَا أعرف رَبِّي فِي السَّمَاء اَوْ فِي الأَرْض فقد كفر وَكَذَا من قَالَ إِنَّه على الْعَرْش وَلَا أدري الْعَرْش أَفِي السَّمَاء اَوْ فِي الأَرْض.
>
> যে ব্যক্তি বলবে আমার রব আসমানে না জমিনে আমি তা জানি না, তাহলে নিশ্চয় সে কাফের হয়ে যাবে। একইভাবে যদি কেউ বলে, আমি জানি যে, তিনি আরশের ওপর, তবে সে আরশ কি আসমানে না জমিনে তা আমি জানি না, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে।[৪৯১]

উপরোল্লেখিত বক্তব্যটি দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উদ্দেশ্য দুটি ভুল আকিদাকে খণ্ডন করা—

১. আসমান কিংবা জমিন উভয়ের কোনোটিকেই আল্লাহ তাআলার জন্য স্থানরূপে সাব্যস্ত করা যাবে না।

২. আরশকেও তাঁর জন্য স্থানরূপে সাব্যস্ত করা যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য অনুসারে প্রথম ব্যক্তিকে কাফের বলার কারণ হচ্ছে, তার এ কথা থেকে মনে হয়, যেন আল্লাহ আসমানে কিংবা জমিনে আছেন।

যেমন কেউ আপনার কাছে জানতে চাইল, আপনার ভাই কোথায়? আপনি বললেন, সে ঠিক ঢাকায় না গ্রামে আমি তা জানি না। অর্থাৎ কোথায় আছে এটা স্পষ্ট না জানলেও আপনি এটুকু অন্তত নিশ্চিত যে, সে হয় ঢাকায় আছে, নাহয় গ্রামে।

অতএব কেউ যদি বলে, আল্লাহ আসমানে আছেন, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আবার যদি বলে, আল্লাহ জমিনে আছেন, তবেও সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ তার উভয় কথাই আল্লাহ তাআলার জন্য একটি স্থান সাব্যস্ত করে।

---

৪৯১. *আল-ফিকহুল আবসাত*, ৮৩

একইভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে। কারণ সে আল্লাহ তাআলার জন্য আরশকে স্থান হিসাবে নিশ্চিত করেছে। যদিও আরশ কোথায় এ ব্যাপারে সে নিজের দ্বিধা প্রকাশ করেছে।

কাজেই কেউ যদি বলে, আল্লাহ আরশে আর আরশ আসমানে, তাহলে যেমন সে কাফের হয়ে যাবে, তেমনই যদি বলে, আল্লাহ আরশে আর আরশ জমিনে, তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ শুরুতেই সে আরশকে আল্লাহ তাআলার স্থানরূপে সাব্যস্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আরশের অবস্থান নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছে। ইমাম আবুল লাইস সামারকান্দি রহ. কুফরের কারণটি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له تعالى مكان فكان مشركا.

এই কথাটির দ্বারা ব্যক্তি এ ধারণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার একটি স্থান রয়েছে, তাই সে মুশরিক হয়ে যাবে।[৪৯২]

ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রহ. বলেন,

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر ، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ، ومن توهم أن للحق مكانا يعرف فهو مشبه.

আর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, আমি জানি না আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে, সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যাবে। কারণ এই বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলার কোনো স্থান রয়েছে। যে এই ধারণা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট কোনো স্থান রয়েছে, সে একজন সাদৃশ্যবাদী।[৪৯৩]

ইমাম তাকিসুদ্দিন হিসনি রহ. বলেন,

قال : من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر ، لأن هذا القول يؤذن أن لله سبحانه وتعالى مكانا ، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه.

---

৪৯২. *আল-ফিকহুল আওসাত*, ৮৩

৪৯৩. *হাল্লুর রুমুজ*, ১২১

> ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, আমি জানি না আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে, নিশ্চয় সে কাফের হয়ে যাবে, কারণ এ জাতীয় কথায় পরিষ্কার মনে হয়, যেন আল্লাহ তাআলার কোনো স্থান রয়েছে। এমন ধারণা যে পোষণ করবে যে, আল্লাহ তাআলার কোনো স্থান রয়েছে, সে একজন সাদৃশ্যবাদী।[৪৯৪]

উপরোল্লেখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে আবু হানিফা রহ.-এর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কেউ যদি আল্লাহ তাআলার জন্য স্থান সাব্যস্ত করে—চাই তা আরশ হোক বা জমিন—তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অথচ নামধারী সালাফিরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এ বক্তব্যটি উল্লেখ করে দাবি করে যে, তিনি নাকি এটা দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ শুধু আরশে আছেন এবং যে তাঁর আরশে থাকা অস্বীকার করবে সে কাফের। নাউজুবিল্লাহ। অথচ তিনি নিজেই আরশে থাকার আকিদাকে কঠিনভাবে খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

> نقر بأن الله تعالى على العرش استوى ، من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه ، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالَم وتدبيره كالمخلوقين ، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

> আমরা এটা স্বীকার করি যে, আরশের প্রতি কোনোরূপ মুখাপেক্ষিতা এবং আরশের ওপর ওঠা ও অবস্থান গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলা আরশে ইসতাওয়া। কোনোপ্রকার মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই তিনি আরশ ও অন্যান্য সবকিছুর সংরক্ষণকারী। সৃষ্টিজীবের মতো যদি মুখাপেক্ষীই হতেন, তবে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও তা পরিচালনায় তিনি সক্ষম হতেন না। (একইভাবে) আরশের ওপর বসা, ওঠা ও অবস্থানের মুখাপেক্ষীও যদি হতেন তিনি, তাহলে (প্রশ্ন জাগে,) আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন? কাজেই তিনি এ সবকিছু থেকে অনেক উর্ধ্বে ও পবিত্র।[৪৯৫]

---

৪৯৪. *দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা ওয়া-তামাররাদা*, ২৯৮

৪৯৫. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫০-৫১

ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন,

لو قيل : أين الله تعالى ؟ قيل له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق ، كان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيئ، وهو خالق كل شيئ.

যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা কোথায়? তাহলে বলা হবে, সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে (যখন) কোনো স্থান ছিল না, তখনও আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তিনি তখনও ছিলেন, যখন 'আইনা' (মানে 'কোথায়') শব্দটি (বলার মতো কিছু) ছিল না এবং ছিল না কোনো সৃষ্টি ও বস্তু। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন সকলকিছুকে।[৪৯৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য অনুসারে ফিকহে হানাফির ফতোয়া

আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফি রহ. বলেন,

وَيَكْفُرُ... بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصَدَ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرُ وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ كَفَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ كَفَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করা দ্বারা ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। অবশ্য কেউ যদি বলে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন এবং এ কথা দ্বারা সে কুরআন-হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনাকে উদ্ধৃত করতে চায়, তাহলে সে কাফের হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো স্থান আছে বলে উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এমনকি যদি তার কোনোরূপ নিয়তই না থাকে, তাহলেও অধিকাংশের দৃষ্টিতে সে কাফের হয়ে যাবে। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত এবং এর ওপরই ফতোয়া।[৪৯৭]

নামধারী সালাফিদের কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এ বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কেউবা আবার আরও জঘন্য জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর এ বক্তব্যকেই পালটে দিয়ে

৪৯৬. *আল-ফিকহুল আবসাত*, ৯৬
৪৯৭. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০২-২০৩

নিজেদের চাহিদামতো এবং মনগড়া শব্দ ও বাক্য যুক্ত করে পেশ করছে, যা পরিষ্কার অন্যায়, প্রবঞ্চনা ও জ্ঞানবিকৃতি।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আকিদা সম্পর্কে আমাদের আজকাল গুরুত্ব কম, ফলে এ সুযোগে নামধারী সালাফিদের মতো মাঝে মাঝে এ দেশে কিছু নামধারী হানাফিরও দেখা মেলে। আদতে যারা দেহবাদী হলেও পরিচয় দেয় হানাফি। ভয়ের কথা হচ্ছে, অনেকেই না জেনে-বুঝে এসব নামধারী হানাফিদেরকেই প্রকৃত হানাফি মনে করে নানারূপ বিভ্রান্তির শিকার হয়। অতঃপর প্রকৃত হানাফিদের বক্তব্যকে বাতিল বলে আখ্যা দেয়।

বিনয়ের সঙ্গে আমি আমার সে ভাইদের সমীপে আরজ করতে চাই যে, হানাফি মাজহাব কিন্তু সাম্প্রতিক সৃষ্ট কোনো মাজহাব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ১৩০০ বছরের সমৃদ্ধ ও বিশাল গৌরবময় ইতিহাস। এ মাজহাবের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে এ যাবৎ রচিত হয়েছে অযুত-সহস্র কিতাব। অসংখ্য-অগণিত ইমাম-মুহাদ্দিস-মুফাসসির-হাফেজে হাদিস ও যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের নাম মিশে আছে এ মাজহাবের পরতে পরতে।

কাজেই বর্তমানে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিরাট আলখেল্লা-পাগড়িধারী কারও হালি হালি ডিগ্রি ও সুমিষ্ট প্রলাপে প্রভাবিত না হয়ে আমাদেরকে যাচাই করতে হবে যে, হাজার বছর ধরে চলে আসা হানাফি মাজহাবের যে স্বীকৃত ফতোয়া ও ইমামদের গবেষণা, তার সাথে এ মৌলবির বক্তব্য মেলে কি না। তবেই দেখবেন, আপনি অতি সহজেই চিহ্নিত করে ফেলতে পারছেন, কে প্রকৃত হানাফি আর কে নামধারী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ, সঠিক জায়গা থেকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যকে সালাফিদের বিকৃতি—২

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف.
>
> কুরআনে আল্লাহ তাআলা চেহারা, হাত ও নফস বলে যা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত তাঁর 'ধরনহীন গুণ'। কাজেই এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত হচ্ছে তাঁর কুদরত বা নেয়ামত। কারণ এতে করে তাঁর গুণটা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়, যা কাদারিয়্যা ও মুতাজিলাদের অভিমত। তাঁর হাত মূলত তাঁর 'ধরনহীন গুণ'।[৪৯৮]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এ বক্তব্যটিকে নামধারী সালাফিরা তাদের আকিদার সমর্থনে নেওয়ার জন্য তিনটি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন—

১. 'চেহারা, হাত, নফস' উল্লেখের পর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, فهو له صفات—অর্থাৎ এগুলো তাঁর 'গুণ'। কেন বলেছেন? কারণ এ শব্দগুলো মাখলুকের ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝালেও আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নয়, বরং এগুলো তাঁর অন্যান্য সিফাতে মাআনির মতো 'ধরনহীন গুণমাত্র', কোনো অঙ্গ নয়। অথচ মানুষের ক্ষেত্রে হাত, চোখ, চেহারা গুণ নয়, বরং শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। পক্ষান্তরে নামধারী সালাফিগণ এগুলোকে নিছক গুণ মনে করে না, বরং তাদের আকিদা হচ্ছে এগুলো আল্লাহ তাআলার অঙ্গবিশিষ্ট সিফাত। (নাউজুবিল্লাহ) তিনিও মাখলুকের মতো বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট। তাঁরও হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি অঙ্গ রয়েছে, তবে মাখলুকের ধরন জানা গেলেও তাঁর ধরন জানা যায় না।

অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. ও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত যে আল্লাহ তাআলাকে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র মনে করতেন, এটা ইমাম

---

৪৯৮. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

তাহাবি রহ.-এর কথা থেকেই স্পষ্ট। তিনি ভূমিকায় দাবি করেছেন, এই কিতাবে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. ও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা উল্লেখ করবেন এবং তিনি স্পষ্ট লেখেন,

تعالى ... عن الأعضاء والأدوات.

আল্লাহ তাআলা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চিরপবিত্র।[৪৯৯]

এমনকি শব্দ থেকে মানুষের জন্য নির্ধারিত অর্থ আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের নিকট কুফর। ইমাম তাহাবি রহ. বলেন,

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.

যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য মানুষের কোনো অর্থ সাব্যস্ত করে, তাহলে অবশ্যই সে কুফরি করল।[৫০০]

যেমন আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে اليد শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত এবং নামধারী সালাফিরা এ বিষয়ে একমত যে, اليد শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত। কিন্তু اليد শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে একটি অঙ্গ বোঝায়, অর্থাৎ 'হাত', এই অর্থকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করেন না, বরং নাকচ করেন।

পক্ষান্তরে নামধারী সালাফিরা اليد শব্দটিকে আল্লাহ তাআলার সিফাত বিশ্বাসের সাথে সাথে মানুষের জন্য নির্ধারিত অর্থ, অর্থাৎ 'হাত' বা 'অঙ্গ' এই অর্থও আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করে এবং ধরনকে তাঁর নিকট সোপর্দ করে। এজন্যই তারা বলে থাকেন, আল্লাহ তাআলার হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি অঙ্গ রয়েছে, কিন্তু তা কেমন, এটা আমরা জানি না।

অথচ ইমাম তাহাবি রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নামধারী সালাফিদের এমন কথা কুফর, কেননা তারা শব্দ থেকে মানুষের জন্য নির্ধারিত অর্থকে আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করছে।

---

৪৯৯. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৫

৫০০. *আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া*, ১৩

আফসোসের জায়গাটি হচ্ছে, এমন স্পষ্ট একটি ভুল ও কুফরি আকিদা পোষণের পর যখন নামধারী সালাফি ভাই ও শায়েখরা প্রচার করেন, তারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদার ওপর আছেন আর আমরা ভিন্ন আকিদার ওপর আছি। তারা সালাফদের আকিদার ওপর আছেন আর আমরা জাহমিয়াদের আকিদার ওপর আছি। নাউজুবিল্লাহ। অথচ ইমাম তাহাবি রহ. কিতাবের শুরুতে স্পষ্ট লিখেছেন, তিনি এই কিতাবে যে-সকল আকিদা উল্লেখ করবেন, তা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদা। সুতরাং ইমাম তাহাবি রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে আমরাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আকিদার ওপর আছি, পক্ষান্তরে নামধারী সালাফিরা গোমরাহির মাঝে আছে।

সারকথা হচ্ছে, উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'চেহারা, হাত, নফস' মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলেও আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, বরং এগুলো তাঁর সিফাত বা গুণমাত্র।

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. بلا كيف—তথা 'ধরনহীন গুণ' শব্দটি উল্লেখ করে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, উক্ত সিফাতগুলোর কোনোরকম ধরন নেই। অথচ সালাফিদের আকিদা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাতের ধরন আছে, তবে সেটা কেমন, তা আমরা জানি না।

জনৈক সালাফি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যে উল্লিখিত فهو له صفات بلا كيف-এর তরজমা করেছেন, 'সেগুলো তাঁর গুণ, কিন্তু কারও সাথে তা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়'। অর্থাৎ তিনি بلا كيف-এর অনুবাদ 'ধরনহীন' না করে করেছেন, 'সেগুলো কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়'। নাউজুবিল্লাহ। আবার কিতাবের নাম দিয়েছেন 'ভ্রান্ত আকিদা বনাম সঠিক আকিদা'। শায়েখ আবু বকর জাকারিয়া হাফি. بلا كيف-এর তরজমা করছেন, 'কোনোপ্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত'।[৫০১]

বাস্তব কথা হচ্ছে, بلا كيف এমন একটি শব্দ, সালাফি আকিদায় থেকে শব্দটির সঠিক তরজমা করা অসম্ভব। সালাফি আকিদায় থাকতে হলে

---

৫০১. *রহমান আরশে উঠেছেন*, ৮৩

শব্দটির ভুল তরজমা করতেই হবে, কেননা সঠিক তরজমা ও সালাফি আকিদা পরস্পর সাংঘর্ষিক।

بلا كيف বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উল্লিখিত সিফাত থেকে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করে তাফবিদ করা। আর এই মূলনীতি সালাফি আকিদার ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। পূর্ববর্তী বহু ইমাম থেকে بلا كيف শব্দটি পাওয়া যায় এবং তাদের উদ্দেশ্যও হচ্ছে আয়াত, হাদিস বা সিফাতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করে তাফবিদ করা, কিন্তু সালাফিরা জোর করে বিভিন্ন ইমামকে নামধারী সালাফি আকিদার অনুসারী প্রমাণের জন্যই এই জালিয়াতি করে থাকে।

অথচ আরবির সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক থাকা ব্যক্তিটিও জানে بلا অর্থ হচ্ছে 'ছাড়া' আর كيف অর্থ 'ধরন'। কাজেই দুটি মিলে অর্থ হয় 'ধরন ছাড়া' বা 'ধরনহীন'। যেমন আবু দাউদের হাদিসে এসেছে,

> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيَى.
>
> হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর অথবা উসমান রা. আজান-ইকামত ছাড়া ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।[৫০২]

সালাফিদের নিকট প্রশ্ন, হাদিসে বর্ণিত একটি শব্দ হচ্ছে بِلاَ أَذَانٍ, এখানে এই بِلاَ أَذَانٍ-এর অর্থ কী করা হবে? 'আজান ছাড়া', নাকি 'আজান দিয়েছেন, কিন্তু তার ধরন আমাদের জানা নেই'? নাকি 'সেই আজান কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়'? নাকি 'সে আজানের কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীত'?

বুখারির একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে باب الكفن بلا عمامة— 'পাগড়িবিহীন কাফন'। এখানেও একই প্রশ্ন, بلا عمامة-এর অর্থ কী হবে? পাগড়ি ছাড়া? নাকি সালাফিদের তরজমা অনুসারে 'পাগড়িসহ কাফন' হবে? সে ক্ষেত্রে কি তারা বলবেন, পাগড়ি তো ছিল, কিন্তু এর ধরন যে কেমন, তা

---

৫০২. *আবু দাউদ*, ১১৪৭

আমাদের জানা নেই? নাকি বলবেন, সেই পাগড়িটি আসলে কারও সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। নাউজুবিল্লাহ।

মূলত আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত থেকে কাইফ বা ধরনকে নাকচ করেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। কেননা কোনো জিনিসের ধরন থাকার অর্থই হচ্ছে তার একটি আকার-আকৃতি থাকবে, নির্দিষ্ট একটি আয়তন ও সীমা ইত্যাদি বিষয়গুলো থাকবে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও সে কারণে ধরনকে নাকচ করেছেন। পক্ষান্তরে সালাফিরা যেহেতু ধরন সাব্যস্তের আকিদা রাখে, এজন্যই সালাফদের বক্তব্যকে বিকৃতি এবং এমন জালিয়াতিপূর্ণ একটা তরজমা করে নিজেরা গোমরাহ হচ্ছে এবং অন্যান্য সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের গোমরাহ করছে। নাউজুবিল্লাহ।

৩. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

> ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف.
>
> এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত হচ্ছে তাঁর কুদরত বা নেয়ামত। কারণ এতে করে তাঁর গুণটা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়, যা কাদারিয়্যা ও মুতাজিলাদের অভিমত; বরং তাঁর হাত মূলত তাঁর 'ধরনহীন গুণ'।[৫০৩]

সিফাত বা গুণ নিয়ে মুতাজিলা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মধ্যকার যে পার্থক্য, তা জানা না থাকার ফলে সালাফিরা বিষয়টা গুলিয়ে ফেলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত শব্দগুলোকে আল্লাহ তাআলার সিফাতরূপেই স্বীকার করেন এবং প্রথমে তাফবিদ করেন। তবে আয়াতের পূর্বাপর দেখে তারা কখনোবা ভিন্ন অর্থে নেন কিংবা তাবিল করেন। কিন্তু এই তাবিল কোনোরকম ইয়াকিন বা দৃঢ়তার স্তরের নয়, বরং তা ধারণার স্তরের। পক্ষান্তরে মুতাজিলাগণ শব্দগুলোকে আল্লাহ তাআলার সিফাতরূপে স্বীকার না করে এগুলোকে ইয়াকিনি পর্যায়ে তাবিল করে। ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফি রহ. বলেন,

---

৫০৩. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

ومذهب الخلف أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته ، ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى ، لعدم دليل يوجب القطع على المراد.

খালাফ বা পরবর্তীদের মাজহাব হচ্ছে, আমরা (শব্দগুলোকে) আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাতের শান অনুযায়ী অর্থে তাবিল করব। কিন্তু অকাট্যভাবে বলব না, (এই অর্থই) আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। কেননা অকাট্যভাবে উদ্দেশ্য বোঝানোর মতো মজবুত কোনো দলিল নেই।[৫০৪]

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

وهذا التأويل لهذه الألفاظ لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن الجسمية وهو ممكن أن يراد ، ولا يجزم بإرادته.

শব্দগুলোর তাবিল করা হয়েছে আসলে সাধারণ মানুষকে দেহবাদী আকিদা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। কাজেই তাবিলকৃত অর্থ গ্রহণ করা গেলেও এটাই মূল অর্থ, এমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যাবে না।[৫০৫]

কাদারিয়্যা ও মুতাজিলারা সিফাতকে অস্বীকার করে এবং ইয়াকিনি পর্যায়ের তাবিল করে, ফলে সিফাতই বাতিল হয়ে যায়। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা রহ. এটাকে নিষেধ করেছেন। হাতকে কুদরত বা নেয়ামতের অর্থে নিলেই মুতাজিলা, কাদারিয়্যা হয়ে যাবে, এটা মূলনীতি হলে, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের বহু প্রসিদ্ধ ইমাম মুতাজিলা, কাদারিয়্যা হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। এমন কি শায়েখ উসাইমিন রহ. বলেন,

ولو قال في قوله تعالى ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر ؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية... لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر ؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة.

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বরং তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) উভয় হাত প্রসারিত।[৫০৬]

---

৫০৪. *আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ*, ১৬৬

৫০৫. *আল-মুসামারা*, ২১৪

৫০৬. সুরা মায়েদা, ৬৪

> এখন কেউ যদি বলে, এখানে আল্লাহর দু-হাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমান ও জমিন, তাহলে কিন্তু সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা আরবি ভাষায় (হাত শব্দের) এ ধরনের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। আর যদি কেউ বলে যে, এখানে হাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নেয়ামত বা শক্তি, তাহলে সে কাফের হবে না, কেননা আরবি ভাষায় হাত নেয়ামতের অর্থে ব্যবহার হয়।[৫০৭]

প্রশ্ন হচ্ছে, সালাফিরা কি এখন বলবে যে, শায়েখ উসাইমিন মুতাজিলা ছিলেন? কারণ তিনি কুরআনে বর্ণিত 'হাত' শব্দকে নেয়ামতের অর্থে গ্রহণ করা শুদ্ধ বলছেন।

উল্লিখিত বক্তব্যটি দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর তিনটি উদ্দেশ্য—

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শব্দগুলোকে নিজের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সুতরাং এগুলো তাঁর গুণ, অঙ্গ নয়।

২. সিফাতগুলোর কোনো ধরন ও আকার-আকৃতি নেই।

৩. কাদারিয়্যা ও মুতাজিলাদের মতো সিফাতকে অস্বীকার করে ইয়াকিন বা দৃঢ়তার পর্যায়ে তাবিল করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা নামধারী সালাফিদের হেদায়েত দান করুন এবং তাদের বিকৃতি ও গোমরাহি থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমিন।

৫০৭. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম*, ৯২

আল্লাহ তাআলা সুরাত বা আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত আল্লাহ তাআলাকে সুরাত বা আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করেন। কেননা 'সুরাত' বলতে এমন জিনিসকে বোঝায়, যার একটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে, যা বিভিন্ন জিনিস দ্বারা গঠিত হয়, যার একটি কাঠামো থাকে এবং যা একটি সীমায় আবদ্ধ হয়। আর এ সবকিছু মাখলুকের সিফাত, এগুলো কখনো খালেকের সিফাত হতে পারে না। ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন,

فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه : أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية.

আমরাসহ সকল মুসলিমের এটা জেনে রাখা আবশ্যক (বা এই আকিদা রাখা ওয়াজিব) যে, আমাদের প্রতিপালক সুরাত বা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট কোনো সত্তা নন। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সুরাত বা আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র।) কেননা আকৃতি থাকার দাবি হলো, ধরন থাকা। কিন্তু 'ধরন' আল্লাহ তাআলা এবং তার সিফাত থেকে মুক্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত ধরন থেকে পবিত্র।)[৫০৮]

ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. বলেন,

اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف.

জেনে রাখো, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে এই আকিদা রাখা যে, আল্লাহ তাআলার জন্য সুরাত বা আকার-আকৃতি জায়েজ নেই। (কেননা সুরাত বলতে এমন জিনিসকে বোঝায়) যার একটি আকৃতি রয়েছে এবং যা বিভিন্নকিছু দ্বারা গঠিত হয়।[৫০৯]

---

৫০৮. *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, ২৮২

৫০৯. *দাফউ শুবহাতিত তাশবিহ*, ৩৫

ইমাম নববি রহ. বলেন,

فإن الله خلق آدم على صورته فهو من أحاديث الصفات ... وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ، ولها معنى يليق بها ، وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شيئ.

'নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন', এই হাদিসটি সিফাতের হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। কতক আলেম হাদিসটিকে তাবিল করা থেকে বিরত থাকেন ও বলেন, **আমরা বিশ্বাস করি তা সত্য, কিন্তু এখানে সুরাতের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়,** বরং আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী তার একটি অর্থ রয়েছে। আর এটাই অধিকাংশ সালাফের মতামত এবং এই মতামতের মাঝেই নিরাপত্তা ও সতর্কতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত কতক আলেম (সুরাত শব্দটিকে) তাঁর শান উপযোগী অর্থে তাবিল করেন। সাথে সাথে তাঁকে (মাখলুকের সদৃশ হওয়া থেকে) চিরপবিত্র বিশ্বাস করেন, কেননা কোনোকিছুই তাঁর মতো বা সদৃশ নয়।[৫১০]

ইমাম কাজি ইয়াজ রহ. বলেন,

واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره وقال : فإن الله سبحانه له صور لا كالصور ، وأجرى الحديث على ظاهره والذي قال لا يخفى فساده ، لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والباري - سبحانه وتعالى - ليس بمحدث فليس بمركب وما ليس بمركب فليس بمصور.

জেনে রাখো, 'নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন', এই হাদিসটির ক্ষেত্রে ইবনে কুতাইবা ভুল করেছেন, কেননা তিনি হাদিসটিকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার সুরাত রয়েছে, তবে তা অন্যান্য সুরাতের মতো নয়।' তিনি হাদিসটিকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে যা বলেছেন, তা স্পষ্ট বাতিল কথা,

---

৫১০. *শারহু মুসলিম*, ১১/২৫০

কেননা 'সুরাত' শব্দটি বিভিন্নকিছু দ্বারা গঠিত জিনিসকে বোঝায়। আর প্রত্যেক গঠিত জিনিস সৃষ্ট অথচ আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট নন, সুতরাং তিনি বিভিন্ন জিনিস দ্বারা গঠিত নন আর তিনি যেহেতু গঠিত নন, সুতরাং তিনি সুরাত বা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট নন।[৫১১]

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

ليس سبحانه بذي لون ولا رائحة ولا صورة ولا شكل.

আল্লাহ তাআলা রং, ঘ্রাণ, সুরাত ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট কোনো সত্তা নন।[৫১২]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনে বাত্তাল রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করে লেখেন,

فيأتيهم الله في صورة" ... تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة.

'মুজাসসিমা বা দেহবাদী' আকিদার অনুসারীরা, 'আল্লাহ আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন', (হাদিসের এ অংশটিকে) দলিল হিসাবে গ্রহণ করে। তারপর আল্লাহ তাআলার জন্য সুরাত বা আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করে।[৫১৩]

শায়েখ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউছুফ হাফি. লেখেন, আর আল্লাহকে নিরাকার মনে করা হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের নামান্তর।[৫১৪]

শায়েখ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউছুফ সাহেব কি মনে করেন, ইমাম বাইহাকি, ইমাম ইবনুল জাওজি, ইমাম নববি, ইমাম কাজি ইয়াজ, ইমাম ইবনুল হুমাম, ইমাম ইবনে বাত্তাল, ইমাম ইবনে হাজার, তারা সবাই হিন্দু ছিলেন? তারা কেউ হাদিসটি সঠিকভাবে বুঝলেন না? এত বড় বড় কুরআন ও হাদিসবিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তারা সবাই এখানে ভুল করলেন এবং একটি হিন্দু আকিদা পোষণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন? নাউজুবিল্লাহ।

---

৫১১. *ইকমালুল মুলিম*, ৮/৮৬
৫১২. *আল-মুসামারা*, ১৭১
৫১৩. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫০৭
৫১৪. *কে বড় লাভবান*, ১৯

আল্লাহ তাআলা আমার নামধারী সালাফি শায়েখদের ক্ষমা করুন, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের একটি আকিদাকে কীভাবে আজ তারা হিন্দুদের আকিদা বানিয়ে দিচ্ছেন আর স্পষ্ট একটি দেহবাদী আকিদাকে সালাফদের আকিদা নামে প্রচার করছেন। নাউজুবিল্লাহ।

মূলত নামধারী সালাফিরা আল্লাহ তাআলার সুরাত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে তিনটি স্থানে ভুল করে থাকেন—

১. আল্লাহ তাআলার সুরাত নেই, এটার দলিল কোথায়?

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি অজানা থাকার কারণে সালাফিরা এই ভুলটি করে থাকেন। মূলনীতিটি হচ্ছে, **'আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্তের দলিল লাগে, কিন্তু নাকচের দলিল লাগে না'**। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সবকিছু নেই, নেই। তবে তিনি যতটুকু সাব্যস্ত করেছেন শুধু ততটুকু সাব্যস্ত করা হবে। তা না হলে বিভিন্ন মানুষ আল্লাহ তাআলার জন্য বহুকিছু দাবি করবে, পরবর্তী সময়ে দলিল না থাকার কারণে তা সাব্যস্তও হয়ে যাবে। যেমন কেউ দাবি করল, আল্লাহ তাআলার রক্ত বা পশম আছে, এখন কেউ কি পারবে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল দিতে যে, আল্লাহ তাআলার রক্ত ও পশম নেই? পারবে না, ফলে দাবিকারীর দাবিও সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

এজন্যই মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্তের দলিল লাগে, কিন্তু নাকচের দলিল লাগে না। পবিত্র কুরআনে সুরাতের কথা নেই। তবে দেহবাদীদের অনুসরণে সালাফিরা সুরাত সাব্যস্তের জন্য যে-কয়টি হাদিস পেশ করে থাকে, বিভিন্ন ইমাম বহু আগেই হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা করে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং ধোঁকা খাওয়ার কিছু নেই।

২. কুরআনে বর্ণিত হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি শব্দগুলোকে সালাফিরা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নেওয়ার সাথে সাথে সবগুলোকে একত্র করে 'সুরাত' সিফাতটিও সাব্যস্ত করে। কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف.

> কুরআনে আল্লাহ তাআলা চেহারা, হাত ও নফস বলে যা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত তাঁর 'ধরনহীন গুণ'।[৫১৫]

কথাটি উল্লেখ করে সালাফিরা বোঝাতে চান, ইমাম আবু হানিফাও সুরাতের আকিদা রাখতেন, কেননা সুরাত না থাকলে হাত, চেহারা, নফস কোথায় থাকবে? সালাফিরা শব্দগুলোকে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নিলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত শব্দগুলোকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নেন না। সেখানে সবগুলোকে মিলিয়ে ভিন্ন আরেকটি সিফাত সাব্যস্ত করা তো বহুত দূরের বিষয়।

হাতের দলিল পাওয়া যাচ্ছে, সুতরাং এটা সিফাত হিসাবে সাব্যস্ত হবে। চেহারার দলিল পাওয়া যাচ্ছে, সুতরাং এটাও সিফাত হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদি শব্দগুলোকে যুক্ত করে ভিন্ন আরেকটি সিফাত সাব্যস্ত করা, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মানহাজ নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও ঠিক একই কারণে শব্দগুলোকে সিফাতরূপে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সবগুলোকে মিলিয়ে তিনি ও পরবর্তী হানাফি উলামায়ে কেরাম বা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অন্যান্য ইমামের কেউ সুরাত সাব্যস্ত করেননি, বরং ইমাম বাইহাকি ও ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. তো বলেন, **আল্লাহ তাআলা সুরাত ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট নন, এই আকিদা রাখা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব।** তবে সালাফিরা দেহবাদীদের অনুসরণে শব্দগুলোর ওপর কিয়াস করে ভিন্ন আরেকটি সিফাত 'সুরাত'-কে সাব্যস্ত করে থাকে, যা স্পষ্ট ভুল ও তাদের বিচ্যুতির আরেকটি কারণ।

৩. যদি সুরাত না থাকে, তাহলে জান্নাতে দেখব কী?

সালাফিদের এ দাবির ভিত্তি কিয়াস। যদিও তারা কালামিদের কিয়াসের কারণে অপছন্দ করে, কিন্তু নিজেরাও অনেক জঘন্য জঘন্য কিয়াসে অভ্যস্ত। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত দেখাকে সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দুনিয়ায় দেখার জন্য যে-সকল শর্ত প্রযোজ্য তা সাব্যস্ত করেন না। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

---

৫১৫. *আল-ফিকহুল আকবার*, ৬

والله تعالى يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة.

আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দেখা পাওয়া যাবে। মুমিনগণ তাঁকে জান্নাত থেকে স্বচক্ষে দেখবে। কোনো উপমা ও ধরন ছাড়াই দেখবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর ও সৃষ্টির মাঝে থাকবে না কোনো ব্যবধান বা দূরত্ব।[৫১৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন,

ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهةٍ.

কোনো ধরন-সাদৃশ্য-দিক ছাড়াই জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ সত্য।[৫১৭]

দুনিয়াতে যা-কিছু দেখা যায়, সবকিছুর একটি সুরাত আছে এবং সবকিছু একটি স্থানে ও সীমায় আবদ্ধ এবং উভয়ের মাঝে একটি দূরত্ব থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্থান, সীমা, দেহ, আকার-আকৃতি এবং ধরন থেকে চিরপবিত্র, তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. বলছেন, তাঁকে দেখার সময়ও স্থান, সীমা, ব্যবধান, দূরত্ব, এ সবকিছুর লেশমাত্র থাকবে না।

চিন্তা করুন, একটি জিনিসকে দেখা যাবে, কিন্তু জিনিসটি কোনো স্থানে ও সীমায় আবদ্ধ হবে না এবং উভয়ের মাঝে কোনো দূরত্ব থাকবে না, দুনিয়ায় এমন জিনিস কি দেখা সম্ভব? সম্ভব না। কিন্তু আখেরাতে সম্ভব, কেননা আখেরাতের বহুকিছুই অলৌকিক। দুনিয়ার রীতিনীতিতে আখেরাতের অনেককিছুকে অসম্ভব মনে হবে, কিন্তু আমরা মুসলিমরা যুক্তিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে কোনো চোখ ছিল না। অথচ আমরা *বুখারি*র হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি, তিনি পেছন থেকেও সাহাবিদের দেখতে পেতেন। অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

৫১৬. *আল-ফিকহুল আকবার*, ১০

৫১৭. *আল-ওয়াসিয়্যা*, ৫৩

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ...আমি যা দেখি, তোমরা যদি তা দেখতে, তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে ও অধিক কাঁদতে।[৫১৮]

শারীরিক গঠনে তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ ও সাহাবিদের চোখের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর দৃষ্টিতে এমন কিছু দান করেছিলেন, যা সাহাবিদের চোখে দান করেননি। ফলে তিনি এমন অনেককিছুই দেখতে পেতেন, যা সাহাবিরা দেখতে পেতেন না।

ঠিক তেমনই মুমিনদের জান্নাত থেকে কোনো উপমা, ধরন, দূরত্ব, স্থান, দিক ছাড়াই আল্লাহ তাআলাকে দেখার বিষয়টা কারও চিন্তাভাবনায় অযৌক্তিক মনে হলেও পূর্ণ বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, এটা বিলকুল সম্ভব; কারণ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছামাফিক সবকিছু করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলাকে যাবতীয় সুরাত ও আকার-আকৃতি থেকে চিরপবিত্র বিশ্বাস করাও জরুরি।

❋ ❋ ❋

৫১৮. *নাসায়ি*, ১৩৬৭

আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তাআলার দেখা পাওয়াকে কেন্দ্র করে মোট চারটি আলোচনা—

ক. দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দেখা।

খ. দুনিয়াতে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে দেখা।

গ. মেরাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখা।

ঘ. আখেরাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা।

ক. দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দেখা

১. দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব, তবে তা কখনো ঘটবে না। হজরত মুসা আ. কর্তৃক আল্লাহ তাআলাকে দেখার ইচ্ছা পোষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দুনিয়ায় তাঁকে দেখা সম্ভব, কারণ কোনো নবির পক্ষে আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব, এমন কিছু চাওয়া বা এমন কিছু সম্পর্কে না জানা অবিশ্বাস্য।

২. দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পারবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ.

তোমরা জেনে রাখো যে, মৃত্যুর আগে তোমাদের কেউ তার রবকে কিছুতেই দেখতে পাবে না।[৫১৯]

খ. দুনিয়াতে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে দেখা

১. আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখার বিষয়ে ইমাম নববি রহ. লেখেন,

اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها.

---

৫১৯. *মুসলিম*, ২৯৩১

আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি সঠিক ও বৈধ।[৫২০]

২. আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখাটা কীরকম হবে, এ বিষয়ে ইমাম নববি রহ. বলেন,

رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب.

আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখার ব্যাপারটি অনেকটা মনে উদীয়মান নানান চিন্তাভাবনার মতো।[৫২১]

৩. স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে কেমন আকৃতিতে দেখা যাবে, এ বিষয়ে ইমাম নববি রহ. বলেন,

وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام ، لأن ذلك المرئى غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال.

যদি কেউ (আল্লাহ তাআলাকে) দৈহিক আকৃতিতে কিংবা এমন কোনো গুণ বা ধরনে দেখে, যা তাঁর শান উপযোগী না, তাহলে (বুঝতে হবে) সেই দৃশ্য আল্লাহ তাআলার নয়। কারণ তাঁর জন্য দেহধারী হওয়া ও বিভিন্ন অবস্থা বা আকার-আকৃতি ধারণ (বিশ্বাস করা) জায়েজ নেই। (তিনি এসব থেকে চিরপবিত্র।)[৫২২]

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখা জায়েজ ও সম্ভব, তবে তাঁকে এমন কোনো আকৃতিতে দেখা যাবে না, যা তার শানের উপযোগী নয়, বরং দেখাটি হবে আমাদের মনে উদীয়মান বিভিন্ন চিন্তাভাবনার মতোই।

গ. মেরাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখা

১. হজরত আয়েশা রা.-এর মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি। তিনি বলেন,

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ.

---

৫২০. *আল-মিনহাজ*, ১৫/৩৮
৫২১. *আল-মিনহাজ*, ১৫/৩৮
৫২২. *আল-মিনহাজ*, ১৫/৩৮

যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে (বুঝে নিয়ো) সে মিথ্যা বলেছে।[৫২৩]

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-সহ কতক সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী বহু ইমামের মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله عليه أجمعين.

হজরত ইবরাহিম আ. (আল্লাহ তাআলার) বন্ধু হওয়া, মুসা আ.-এর সাথে (আল্লাহ তাআলার) কথা বলা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহ তাআলাকে দেখা, (এ বিষয়গুলোতে) তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ?

ইমাম হাকিম রহ. বলেন,

هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

হাদিসটি ইমাম বুখারির শর্ত অনুযায়ী সহিহ।[৫২৪]

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে অন্য হাদিসে এসেছে,

وَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে দুবার দেখেছেন।[৫২৫][৫২৬]

একটি প্রশ্ন : দর্শনটি কি চর্মচক্ষু দ্বারা হয়েছে, না অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা?

বিষয়টি নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতেলাফ রয়েছে। কতক ইমামের মতে চর্মচক্ষু দ্বারা, আবার কতকের মতে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। এ বিষয়ে ইমাম আইনি রহ. বলেন,

---

৫২৩. *বুখারি*, ৪৮৫৫
৫২৪. *মুসতাদরাকে হাকিম*, ২/৫১০, হাদিস : ৩৭৪৭
৫২৫. *তিরমিজি*, ৩৫৬৩
৫২৬. শায়েখ শুআইব আরনাউত রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। (*তিরমিজি*, ৫/৪৭৯, হাদিস : ৩৫৬৩)

والأشهر عنه أنه رآه بعينيه.

(হজরত ইবনে আব্বাস রা.) থেকে প্রসিদ্ধ মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দুই চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন।[৫২৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন,

الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء.

অধিকাংশ আলেমের নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজের রাতে স্বচক্ষে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন।[৫২৮]

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আয়েশা রা.-এর মধ্যকার এই মতানৈক্যের সমন্বয় কেউ কেউ এভাবে করেছেন যে, হজরত আয়েশা রা.-এর অস্বীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা আর হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب.

ইবনে আব্বাসের সাব্যস্ত করা এবং আয়েশার নাকচের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা যায়, (আয়েশার) নাকচের উদ্দেশ্য হচ্ছে চর্মচক্ষু (দিয়ে দেখেননি) এবং ইবনে আব্বাসের সাব্যস্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তর্দৃষ্টি (দিয়ে দেখেছেন)।[৫২৯]

৩. কতক ইমামের মত হলো, এই বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম।

হজরত সাইদ ইবনে জুবায়ের রা.-সহ ইমাম দারিমি ও যাহাবি প্রমুখ ইমামের মত হলো, এ বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম। হাফেজ যাহাবি রহ. বলেন,

---

৫২৭. *উমদাতুল কারি*, ১৫/১৯৭
৫২৮. *আল-মিনহাজ*, ৩/৬-৭
৫২৯. *ফাতহুল বারি*, ৮/৫২৪

ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها بل نقول الله ورسوله أعلم.

আমরা ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করব না, যিনি দুনিয়াতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য (আল্লাহ তাআলার) দর্শনলাভ সাব্যস্ত করেন এবং তাকেও তিরস্কার করব না, যিনি তা নাকচ করেন; বরং আমরা বলব, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।[৫৩০]

এ ক্ষেত্রে মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. তৃতীয় মতটিকেই সঠিক বলেছেন।[৫৩১]

ঘ. আখেরাতে আল্লাহ তাআলাকে দেখা

একমাত্র মুমিন বান্দারাই জান্নাত থেকে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

৫৩০. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১০/১১৪

৫৩১. *ইনআমুল বারি*, ৮/৭৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার ব্যাপারটি দুভাবে হতে পারে—

ক. স্বপ্নে দেখা।

খ. জাগ্রত অবস্থায় দেখা।

ক. স্বপ্নে দেখা

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার বিষয়ে ইমামদের দুটি মাজহাব—

ক. ইমাম ইবনে সিরিন রহ.-সহ কতক ইমামের মত হলো, হাদিসের কিতাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর মুবারকসহ তাঁর অবয়ব ও গুণের যে বর্ণনা এসেছে, যদি কেউ তাঁকে সেভাবে দেখে, তাহলে এ স্বপ্ন সত্য এবং তাতে শয়তানের কোনো প্রভাব নেই।

খ. কতক ইমামের মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পরিচিত অবয়বে দেখা শর্ত নয়, বরং দেখার সময় যদি ইয়াকিন ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাহলে তার স্বপ্ন সত্যি, কারণ তিনি বলেন,

وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي.

> যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[৫৩২]

ইমাম নববি রহ. এ সম্পর্কে বলেন,

بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أم غيرها.

---

৫৩২. *বুখারি*, ৬১৯৭

বরং সঠিক মত হলো, সে বাস্তবেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখছে, চাই তিনি তাঁর পরিচিত গুণে ও আকৃতিতে থাকুন বা ভিন্ন কোনো গুণে ও আকৃতিতে।[৫৩৩]

২. স্বপ্ন তিন প্রকার, বলাবাহুল্য, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখাটা সেই তিন প্রকার স্বপ্নের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তা ভালো স্বপ্ন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুসংবাদস্বরূপ।

৩. কেউ যদি স্বপ্নে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম আকৃতি ও চমৎকার অবস্থায় দেখে, তাহলে এটা হবে তার জন্য সুসংবাদ। আর যদি অনুত্তম আকৃতি বা অপ্রত্যাশিত অবস্থায় দেখে, তাহলে বুঝতে হবে, তার দ্বীনদারিতে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে।

৪. কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছুর আদেশ করছেন বা নিষেধ করছেন, তাহলে সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, এই স্বপ্ন শরিয়তের দলিল হবে না, বরং তাঁকে দেখতে হবে, বিষয়টি কি শরিয়তের অনুকূল না বিপরীত? যদি অনুকূল হয়, তাহলে আদব হিসাবে আমল করা যেতে পারে। কিন্তু যদি বিপরীত হয়, তাহলে আমল করবে না, বরং নিজের দ্বীনদারির কমতি মনে করে ইসতেগফার করবে এবং নিজ অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করবে।

৫. স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার দ্বারা সাহাবি হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

খ. জাগ্রত অবস্থায় দেখা

১. জাগ্রত অবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার বিষয়ে ইমাম গাজালি, শায়েখ আবদুল কাদির জিলানি, ইবনে হাজার হাইতামি রহ.-সহ আলেমদের বিশাল একটি জামাতের মত হলো, জাগ্রত অবস্থায় দেখা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-সহ আরেকটি জামাতের মত হলো, জাগ্রত অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়।

যারা সম্ভব বলেন, তারা *বুখারির* নিম্নোক্ত হাদিসটি দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৫৩৩. *আল-মিনহাজ*, ১৫/৩৭

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

> যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, শীঘ্রই সে জাগ্রত অবস্থাতেও আমায় দেখবে, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[৫৩৪]

এ বিষয়ে আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন,

ويمكن عندي رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة لمن رزقه الله سبحانه.

> আমার মতে আল্লাহ তাআলা যদি কারও ব্যাপারে ইচ্ছা করেন, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব।[৫৩৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাওয়া জায়েজ ও সম্ভব। তবে তা বাস্তবিক দর্শন বা চর্মচক্ষু দ্বারা নয়, বরং তা ঘটে অন্তর্দৃষ্টি ও কাশফের মাধ্যমে। সাধারণত এ সৌভাগ্য অর্জিত হয় তখনই, যখন কেউ রাসুলপ্রেমের সুউচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং সর্বদা রাসুলের ভালোবাসায় নিমজ্জিত থাকে। ঘুমন্ত অবস্থার মতো তখন জাগ্রত অবস্থায়ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হতে পারে। তবে এ দর্শনের অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাঁর রওজা মুবারক থেকে বের হয়ে আসেন বা তিনি সব দেখেন কিংবা সব মজলিসে তিনি উপস্থিত হতে পারেন, বরং এটা আল্লাহ তাআলার কারামতের অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা এ সৌভাগ্য দান করেন।

দুটি ফেরকা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র, কিন্তু একদল আরশকে তাঁর স্থান হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁকে আরশে অবস্থান করান। পক্ষান্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ হিসাবে স্থানের মুখাপেক্ষী, ফলে তিনি এখন তাঁর রওজা মুবারকে আছেন। কিন্তু একদল তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে বিভিন্ন মজলিসে নিয়ে আসে। উভয় আকিদাই বাড়াবাড়ি ও গোমরাহি।

❋ ❋ ❋

---

৫৩৪. *বুখারি*, ৬৯৯৩

৫৩৫. *ফাইজুল বারি*, ১/২৯২

অসিলা

শাব্দিক অর্থে কাঙ্ক্ষিত কোনোকিছু অর্জনের মাধ্যম বা উপায়-উপকরণকে অসিলা বলে। আর পারিভাষিকভাবে অসিলা বলা হয়, কোনো আমল বা ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট চাওয়া, দোয়া করা। পারিভাষিক অসিলার ব্যবহারকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

ক. জায়েজ অসিলা।

খ. নাজায়েজ অসিলা।

গ. মতবিরোধপূর্ণ অসিলা।

ক. জায়েজ অসিলা

১. আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও গুণাবলির অসিলায় দোয়া করা।

২. নিজ ঈমান ও নেক আমলের অসিলায় দোয়া করা।

৩. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দোয়া চাওয়া বা তাঁর প্রতি ঈমান ও ভালোবাসার অসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

৪. জীবিত কোনো দ্বীনদার-পরহেজগার-মুত্তাকি আল্লাহওয়ালার কাছে দোয়া চাওয়া।

খ. নাজায়েজ অসিলা

১. আল্লাহ কাউকে অন্যের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিংবা সে নিজ ক্ষমতায় কারও উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, এমন বিশ্বাস নিয়ে কারও অসিলা গ্রহণ করা।

২. অসিলা গ্রহণ ছাড়া দোয়া কবুল হয় না, এমন আকিদা লালন করা।

৩. অসিলা গ্রহণ ছাড়া দোয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না।

৪. অসিলা গ্রহণ না করলে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন না।

৫. অসিলার মাধ্যমে দোয়া করলে আল্লাহর জন্য কবুল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নাউজুবিল্লাহ। এ জাতীয় কোনো বিশ্বাস বা আকিদা নিয়ে অসিলা গ্রহণ জায়েজ নেই।

গ. মতবিরোধপূর্ণ অসিলা

১. চার মাজহাবের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো, নবি-অলি-সিদ্দিক-শহিদ-পরহেজগার ব্যক্তিদের নাম ও শানের অসিলায় দোয়া করা জায়েজ, চাই জীবিত হোক বা মৃত। তবে শর্ত হচ্ছে, অন্তরে এই আকিদা পোষণ করতে হবে যে, সকলকিছু করার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। নিছক তাদের অসিলা দিয়ে দোয়া করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি, এই যা, কারণ তারা ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

২. হাম্বলি মাজহাবের একটি ক্ষুদ্র অংশের মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাত তথা সত্তা ও সেইসাথে অন্য কারও অসিলায় দোয়া করা জায়েজ নেই।

৩. শুধু নবিদের অসিলা গ্রহণ জায়েজ। চাই তাদের জীবদ্দশায় বা তিরোধানের পর। নবিগণ ব্যতিরেকে অন্য কারও অসিলা গ্রহণ জায়েজ নেই। ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিন আবদিস সালাম রহ.-এর মত বলে এটাকে উল্লেখ করা হয়।

অধিকাংশ আলেমের দলিল

১. জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁর রোগ মুক্তির দোয়া চাইলে তিনি তাঁকে উত্তমরূপে অজু করে এসে দুই রাকাত সালাত পড়ে এ দোয়া করতে বললেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

হে আল্লাহ! আমি দয়ার নবি মুহাম্মাদের অসিলা নিয়ে আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি ও আপনার অভিমুখী হচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি আপনার অসিলা দিয়ে আমার

রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যেন আমার প্রয়োজনটা মিটে যায়। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনি তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।[৫৩৬]

উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাত তথা সত্তার অসিলায় দোয়া চাওয়া জায়েজ। ইমাম শাওকানি রহ. হাদিসটি উল্লেখ করে লেখেন,

وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى.

এ হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলা গ্রহণ জায়েজ। তবে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, সকলকিছুর একক ক্ষমতাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলা।[৫৩৭]

২. অন্য হাদিসে এসেছে,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

অনাবৃষ্টির সময় সাধারণত হজরত উমর ইবনু খাত্তাব রা. বৃষ্টির জন্য হজরত আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব রা.-এর অসিলায় দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আগে আমরা নবির অসিলায় দোয়া করলে আপনি বৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা সেই নবির চাচার অসিলায় দোয়া করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।[৫৩৮]

উল্লিখিত হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন সৎ ব্যক্তির অসিলায় দোয়া চাওয়া জায়েজ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. হাদিসটির ব্যাখ্যায় লেখেন, হজরত উমর রা. তখন খুতবায় এ কথাও বলেছেন,

واتخذوه وسلية إلى الله.

---

৫৩৬. *ইবনে মাজাহ*, ১৩৮৫
৫৩৭. *তুহফাতুজ জাকিরিন*, ১৮০
৫৩৮. *বুখারি*, ১০১০

আল্লাহর নিকট তোমরা তাঁকে (হজরত আব্বাসকে) অসিলা হিসাবে গ্রহণ করো।[৫৩৯]

শাওকানি রহ. বলেন, أما التوسل بالصالحين—অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের নামে যে অসিলা জায়েজ, তার পক্ষে এ হাদিসটিকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন।[৫৪০]

৩. ইমাম তাবারানি রহ. একটি ঘটনা বয়ান করেন। কোনো একটি প্রয়োজন নিয়ে হজরত উসমান রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি বেশ কয়েকবার এসেছেন। কিন্তু ব্যস্ততার দরুন তিনি তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না। এমনকি তার বিষয়টা নিয়ে তেমন ভাবতেও পারছিলেন না। লোকটি তখন হজরত উসমান বিন হুনাইফ রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিষয়টা তুলে ধরে তার কাছে অনুযোগ করে। জবাবে তিনি তাকে বলেন, তুমি এক কাজ করো। অজুখানায় গিয়ে অজু করো। তারপর মসজিদে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়ো এবং দোয়া করো,

اللّٰهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.

হে আল্লাহ! আমি দয়ার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলা নিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি ও আপনার অভিমুখী হচ্ছি।[৫৪১]

হাদিসটির মান বিষয়ে ইমাম তাবারানি রহ.-এর মন্তব্য হচ্ছে, এটি সহিহ।[৫৪২]

উল্লিখিত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃত্যুর পরও জাত তথা সত্তার অসিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েজ।

অসিলা বিষয়ে কতক ইমামের বক্তব্য

ইমাম ইবনুল হাজ মালেকি রহ. বলেন,

يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ... وبمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ... ثم يتوسل بأهل تلك المقابرأعني بالصالحين ... إن

---

৫৩৯. *ফাতহুল বারি*, ২/৬১৩
৫৪০. *তুহফাতুজ জাকিরিন*, ৫০
৫৪১. *আল-মুজামুস সাগির*, ১/১৮৩
৫৪২. *আল-মুজামুস সাগির*, ১/১৮৪

بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين من أئمة الدين.

দোয়াকারী আল্লাহর নিকট দোয়া শুরু করবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলা দিয়ে এবং তাদের অসিলা দিয়ে, কেয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করে গেছেন। অতঃপর সে অসিলা গ্রহণ করবে শায়িত সৎ ব্যক্তিদের...। বলাবাহুল্য, সৎ ব্যক্তিদের বরকত যেমন জীবিত অবস্থায় বহমান থাকে, তেমনই তা চলমান থাকে মৃত্যুর পরও। সৎ ব্যক্তিদের কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও তাদের অসিলায় সাহায্য চাওয়া ইমাম ও মুহাক্কিক আলেমদের আমল।[৫৪৩]

ইমাম সুবকি শাফেয়ি রহ. বলেন,

إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال، قبل خلقه وبعد خلقه، في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ.

সর্বাবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলা গ্রহণ জায়েজ। চাই তাঁর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হোক বা পরে। কিংবা পার্থিব জীবনে হোক বা বরজখি জীবনে।[৫৪৪]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. বলেন,

ومن آدب الدعاء تقديم الثناء على الله والتوسل بنبي الله ليستجاب.

দোয়ার মুসতাহাব পদ্ধতি হলো, শুরুতেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা এবং অতঃপর আল্লাহর নবির অসিলা গ্রহণ করা, যেন দোয়াটা কবুল হয়।[৫৪৫]

শাওকানি রহ. বলেন,

قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه.

---

৫৪৩. *আল-মাদখাল*, ১/২৫৫
৫৪৪. *শিফাউস সাকাম*, ৩৫৮
৫৪৫. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, ২/১০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর অসিলা গ্রহণ তো সুসাব্যস্ত। আর তাঁর ইন্তেকালের পর অন্যদের দ্বারা অসিলা গ্রহণ, এটা সাহাবিদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কেননা হজরত উমর রা. যখন হজরত ইবনে আব্বাসের অসিলায় দোয়া করেন, তখন (সাহাবিদের কেউ হজরত উমরের কাজটিতে) আপত্তি তোলেননি বা অস্বীকার করেননি।[৫৪৬]

৫৪৬. *আদ-দুররুন নাদিদ*, ২০
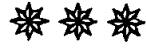
অসিলা গ্রহণ বিষয়ে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর অবস্থান

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. লেখেন,

عقد له مجلس لكلامه في ابن عربي وغيره وادعى عليه ابن عطاء بأشياء ولم يثبت منها شيئا ، ولكنه اعترف أنه قال : لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة ، ولكن يتوسل به.

ইবনুল আরাবি ও অন্যদের বিষয়ে ইবনে তাইমিয়ার কথার কারণে তার সাথে আলোচনার জন্য এক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে ইবনু আতা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তার ওপর আপত্তি তোলেন, যার কোনোটিই তিনি সাব্যস্ত করতে পারেননি। তবে (ইবনে তাইমিয়া) এটা স্বীকার করেন যে, ইবাদতের অর্থে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাওয়া না গেলেও তাঁর অসিলা গ্রহণ করা যাবে।[৫৪৭]

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ছাত্র ইবনে কাসির এ বিষয়ে লেখেন,

لكنه قال لا يستغاث إلا بالله ، ولا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة ، ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله.

তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেন, সাহায্য চাওয়া হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট। ইবাদতের অর্থে নবিজির কাছে সাহায্য চাওয়া না গেলেও তাঁর অসিলা গ্রহণ করা যাবে এবং তাঁর অসিলায় আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে।[৫৪৮].

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সমকালীন দুজন ইমামের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, অসিলার বিষয়ে প্রথমদিকে ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ভিন্নমত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি এ মত থেকে ফিরে এসেছেন।

---

৫৪৭. *আজ-জাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা*, ৪/৫১৫

৫৪৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১৪/৪৫

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদা হচ্ছে, নবি-অলি-সিদ্দিক-শহিদ-পরহেজগার ব্যক্তিদের নাম ও শানের অসিলায় দোয়া করা জায়েজ, চাই জীবিত হোক বা মৃত। তবে শর্ত হচ্ছে, অন্তরে এই আকিদা পোষণ করতে হবে যে, সকলকিছু করার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। নিছক তাদের অসিলা নিয়ে দোয়া করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি, এই যা। কেননা তারা ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। সুতরাং ঢালাওভাবে অসিলাকে নাজায়েজ ও শিরক বলা হাদিস, সাহাবা ও সালাফদের বক্তব্যের সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক ও বিরোধী।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সাহাবা ও প্রকৃত সালাফদের মানহাজে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।
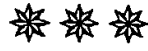
তাসাউফ

১. আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে জানা এবং তার চিকিৎসার নামই 'তাসাউফ'। কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় 'তাজকিয়াতুন নাফস' তথা আত্মশুদ্ধি, আর হাদিসের ভাষায় বলা হয় 'আল-ইহসান'।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, **তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন**, শিক্ষা দেন কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় এবং শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।[৫৪৯]

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব রহ. বলেন,

اعلم – أرشدك الله – أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي هو: العلم النافع، ودين الحق الذي هو: العمل الصالح؛ إذ كان من ينتسب إلى الدين: منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين.

জেনে রাখো যে, (আল্লাহ তোমাকে সঠিক বুঝ দান করুন) আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'হুদা' তথা 'উপকারী ইলম' এবং 'দ্বীনে হক' তথা 'সৎকর্ম' দিয়ে প্রেরণ করেছেন। দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত কতক ব্যক্তি ইলম ও ফিকহ চর্চা করে থাকেন, যেমন ফকিহগণ। আবার কতক ব্যক্তি ইবাদত ও পরকাল তালাশে

---

৫৪৯. সুরা বাকারা, ১৫১

নিমগ্ন থাকেন, যেমন সুফিগণ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তার নবিকে এমন এক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা (ইলম ও আত্মশুদ্ধি) উভয় প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে।[৫৫০]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে কারিমা থেকে বোঝা যায়, নবির ওপর দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি দায়িত্ব ছিল অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব রহ.-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবির ইন্তেকালের পর যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি ফিকহ চর্চা করেছেন এবং মানুষদের বিভিন্ন মাসআলার সমাধান দিয়েছেন, ঠিক তেমনই কিছু ব্যক্তি তাসাউফের চর্চা করেছেন এবং মানুষের আত্মশুদ্ধির কাজও করেছেন। সুতরাং তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি কোনো বিদআত নয়, বরং তা নবিওয়ালা কাজ। যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে এ মহান কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

৩. যারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾

আত্মাকে যে পরিশুদ্ধ করেছে, অবশ্যই সে সফল হয়েছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সে, যে তাকে বিনষ্ট করেছে।[৫৫১]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আত্মাকে পরিশুদ্ধির ব্যাপারে জোর দিচ্ছেন এবং আত্মশুদ্ধিকে বলছেন সফলতা, আর আত্মশুদ্ধি না করাকে বলছেন ব্যর্থতা।

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জিবরিল আ.-এর প্রশ্নের জবাবে বলেন,

مَا الإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

ইহসান কী? তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না

---

৫৫০. *ফাতাওয়া ওয়া মাসায়িল*, ৩১

৫৫১. সুরা শামস, ৯-১০

পাও, তবে (এ বিশ্বাস রাখবে যে,) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।[৫৫২]

ব্যাখ্যা : বান্দা যখন সর্বদা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন, তখন তার মাঝে ইখলাস পয়দা হবে এবং সে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করবে। সেইসাথে যাবতীয় মন্দ গুণ, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, গিবত, পরনিন্দা, নেফাক, লৌকিকতা ইত্যাদি থেকে সে বেঁচে থাকবে। কেননা তাসাউফের চেষ্টাই হলো, কীভাবে মানুষের মন্দ স্বভাবকে দমন করা যায় এবং উত্তম গুণকে আরও শক্তিশালী করা যায়।

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ছেড়ে দাও।[৫৫৩]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন। প্রকাশ্য গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত গুনাহ আর গোপন গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের মাধ্যমে হওয়া গুনাহ।

৬. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

শোন! নিশ্চয় (মানুষের) দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন সমগ্র দেহ ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোন! সেটি হচ্ছে 'কলব' (বা অন্তর)।[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : হাদিসটি থেকে বোঝা যায়, মানব-সংশোধনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো 'অন্তর'। অন্তর যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের ভেতর-বাহির উভয়টাই

---

৫৫২. *বুখারি*, ৫০
৫৫৩. সুরা আনআম, ১২০
৫৫৪. *বুখারি*, ৫২

তখন পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর তাসাউফের কাজই হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে জানা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার চিকিৎসা করা।

৭. আল্লাহ তাআলা যেমন প্রসিদ্ধ চার ইমামের মাধ্যমে ফিকহ ও হাদিসের খেদমত নিয়েছেন, ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি এবং ইমাম আশআরি রহ.-এর মাধ্যমে আকিদার বিরাট একটি খেদমত নিয়েছেন। ঠিক তেমনই শায়েখ আবদুল কাদের জিলানি রহ., হজরত মাইনুদ্দিন চিশতি রহ., হজরত শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ারদি রহ., ইমাম বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহ. প্রমুখ শায়েখদের মাধ্যমে তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির বিরাট খেদমত নিয়েছেন।

৮. তাসাউফের চারটি সিলসিলা অধিক প্রসিদ্ধ—

ক. কাদেরিয়া : যা শায়েখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. (৪৭১-৫৬১ হি.)-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়।

খ. চিশতিয়া : যা হজরত মাইনুদ্দিন চিশতি রহ. (৫৩৬-৬২৭ হি.)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

গ. সোহরাওয়ারদিয়া : হজরত শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ারদি রহ. (৫৩৯-৬৩২ হি.)-এর নাম অনুসারে বলা হয়।

ঘ. নকশবন্দিয়া : ইমাম বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহ. (৭১৮-৭৯১ হি.)-এর নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৯. অতীতের কোনো এক সময়ে আত্মশুদ্ধির ব্যাপারটা তাসাউফ নামে পরিচিতি পেয়ে যায় এবং উপমহাদেশীয় অঞ্চলে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে 'পির-মুরিদি' নামে।

১০. তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি বিদআত নয়, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি ছিল আত্মশুদ্ধি। যুগের কারণে এতে পদ্ধতিগত ভিন্নতা আসতে পারে, কিন্তু মূল বিষয় যেহেতু অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তাই আত্মশুদ্ধি তথা তাসাউফকে বিদআত বলার সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, পরবর্তী সময়ে যদি কেউ তাসাউফের সাথে এমন কিছু যুক্ত করে বা তাসাউফ নাম দিয়ে এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যা শরিয়ত সমর্থন করে না, তাহলে তা স্পষ্ট বিদআত হবে এবং নাজায়েজ হবে। তবে এই নাজায়েজ অংশের কারণে মূল সঠিক তাসাউফকে অস্বীকার করা যাবে না।

১১. কেউ যদি তাসাউফকে শুধু আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে জানা এবং তার চিকিৎসার মাধ্যম মনে করে, তাহলে তা বিদআত হবে না। কিন্তু কেউ যদি এটাকে ইবাদত মনে করে অথবা ওয়াজিব মনে করে, কিংবা তাসাউফের সাথে যারা যুক্ত হচ্ছে না, তাদেরকে নিন্দা ও তিরস্কার করে, তাহলে এটা বিদআতে পরিগণিত হবে।

কারামত

১. কারামত (كرامـة)-এর আভিধানিক অর্থ আল-ইকরাম (الإكـرام) সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া।

২. আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনো কখনো তার মাধ্যমে অস্বাভাবিক, জটিল ও অলৌকিক বিভিন্ন জিনিস প্রকাশ করে থাকেন। পরিভাষায় এটাকে বলা হয় কারামত। যেমন পানাহার ব্যতীত একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আসহাবে কাহফের ঘুমিয়ে থাকা। হজরত মারইয়াম আ.-এর স্বামী ছাড়াই সন্তানলাভ এবং তাঁর কাছে অমৌসুমি ফলমূল থাকা। হজরত উমর রা.-এর 'ইয়া সারিয়া, আল-জাবাল!' (يـا سـارية الجبـل) বলার ঘটনা ইত্যাদি।

৩. নবি-রাসুলদের মুজিজা যেমন সত্য, তেমনই অলিদের কারামতও সত্য। তবে মুতাজিলা ও খারেজিগণ অলিদের কারামতকে অস্বীকার করে। ইমাম আবুল মুইন আন-নাসাফি রহ. বলেন,

قالت المعتزلة والرافضة والجهمية: كرامات الأولياء باطلة.

> মুতাজিলা, রাফেজি ও জাহমিয়ারা বলে, অলিদের কারামত মিথ্যা।[৫৫৫]

৪. অলি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যথাসম্ভব অবগত হবেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যব্যয়ে পালনকারী হবেন। সেইসাথে নিজের স্বাদ-আহ্লাদ ও নফসের খাহেশাতে লিপ্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকবেন।

ওয়ালায়াত (ولاية)-এর দুটি দিক—

ক. বান্দার সাথে।

খ. আল্লাহ তাআলার সাথে।

---

৫৫৫. *বাহরুল কালাম*, ১১৫

ক. বান্দার সাথে ওয়ালায়াতের সম্পর্ক হলো, বান্দা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। আর বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবে।

খ. আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়ালায়াতের সম্পর্ক হলো, এমন বান্দাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন, সাহায্য করবেন এবং তাদের দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করবেন।

৫. নবি-রাসুলদের থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে, তাকে বলা হয় মুজিজা। আর নবির কোনো নেক ও সৎ অনুসারী থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে, তাকে বলা হয় কারামত। আর যদি সাধারণ কোনো মুসলিম থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে বলা হয় মাউনাহ (معونة)। পক্ষান্তরে কোনো কাফের, মুনাফেক, ফাসেক, ফাজের, বা মুত্তাকি নয়, এমন কারও থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে, তাকে বলা হয় ইসতিদরাজ ও ইহানাত (الاستدراج والإهانة)।

৬. অলি যত বড়ই হোক, কোনো নবির সমমর্যাদার হতে পারবে না। যতক্ষণ অলির জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনাবোধ সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে, ততক্ষণ তার জন্য শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থাকা ফরজ, চাই তিনি আল্লাহ তাআলার যত প্রিয় পাত্রই হোন না কেন। নামাজ-রোজাসহ কোনো ফরজ ইবাদতই তার জন্য মাফ হয়ে যায় না এবং গুনাহের কোনো বিষয়ও তার জন্য জায়েজ হয়ে যায় না। মনে রাখতে হবে, **শরিয়তের খেলাফ আমলকারী কোনো ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার অলি ও বন্ধু কিংবা প্রিয়পাত্র হতে পারে না।**

৭. কেউ যদি দাবি করে যে, সে হাকিকত ও মারেফতের এমন স্তরে উপনীত হয়েছে, যার কারণে তার থেকে শরিয়তের বিধিবিধান রহিত হয়ে গেছে, তাহলে সে স্পষ্ট নাস্তিক। কেননা কোনো নবি থেকেই তো কখনো ইবাদত রহিত করা হয়নি, অলি তো বহুত দূর। তা ছাড়া হাকিকত-মারেফতের ফলে যদি ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকত, তাহলে প্রথমে নবিদের থেকেই তা হতো, কেননা তারা তো হাকিকত-মারেফতের এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন, কোনো মানুষের পক্ষেই যেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৮. কারামত কোনো যুগ ও সময়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৯. একজন অলি যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, তার পক্ষে কাউকে রিজিক ও সন্তান দেওয়া, কিংবা কারও বিপদ দূর করা সম্ভব নয়। বরং তিনিও অন্যান্য মানুষের মতোই আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

১০. কারামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বান্দার কোনো ক্ষমতা ও ইখতেয়ার থাকে না।

১১.অলি-বুজুর্গদের কারামত ও কাশফ সত্য। তবে তা প্রকাশ পাওয়া শর্ত নয়। তা ছাড়া কারামত প্রকাশ পাওয়া কারও বুজুর্গ হওয়ার দলিলও নয়, বরং শরিয়তের ওপর চলা এবং সুন্নত অনুসরণই হলো প্রকৃত বুজুর্গির আলামত। হতে পারে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অলি, কিন্তু জীবনভর কোনো কারামত তার থেকে প্রকাশ পায়নি।

১২. অলির পক্ষে কি বোঝা সম্ভব যে, সে একজন অলি?

বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মাঝে ইখতেলাফ আছে। কারও মত হলো যে, না, তা বোঝা সম্ভব না। কারণ তখন তার থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় দূর হয়ে যাবে। আবার কতকের মত হলো যে, হ্যাঁ, তার পক্ষে বোঝা সম্ভব। কেননা এটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে সম্মান করা। আর তখন আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

১৩. মৃত্যুর পরও অলির কারামত প্রকাশ হতে পারে।

ব্যাখ্যা : কতক ব্যক্তি মৃত্যুর পর কারামত প্রকাশকে অস্বীকার করেন। মূলত কারামত শব্দের সঠিক অর্থ না জানার দরুন তারা এ ভুলটা করে থাকেন। কারামত অর্থ অলি নিজের পক্ষ থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ করা নয়, বরং কারামত হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তার অলির মাধ্যমে অলৌকিক কিছু প্রকাশ করা। অলি তো জীবিত অবস্থায়ই অলৌকিক কিছু প্রকাশ করতে পারে না, মৃত্যুর পর কীভাবে পারবে? তবে আল্লাহ তাআলা যেমন অলির জীবিত অবস্থায় অলৌকিক কিছু প্রকাশ করতে সক্ষম, তেমনই মৃত্যুর পরেও সক্ষম। কাজেই মৃত্যুর পর কারামত প্রকাশকে অস্বীকার করার দুটি কারণ থাকতে পারে—

ক. কারামত শব্দের অর্থ ভালোভাবে না জানা।

খ. কারামত শব্দের অর্থ জানা, কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে না করা।

১৪. অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো কারামতকে কেউ অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।

১৫. শিরক ও কারামত এক নয়। শিরক হলো, মহান আল্লাহর সত্তা বা সিফাতের মাঝে কাউকে শরিক ও সমকক্ষ মনে করা। আর কারামত হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর কোনো প্রিয় বান্দার মাধ্যমে অলৌকিক কিছু প্রকাশ করা।

১৬. বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সাথে কারামতের ঘটনা বর্ণনা করতে কোনো দোষ নেই। তবে এটুকু যাচাই করতে হবে যে, যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তা আসলেই ঘটেছে কি না। দ্বিতীয়ত কারামতের ঘটনায় যদি এমন কোনো বিষয় থাকে, যা শুনলে বা পড়লে সাধারণ মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে প্রভাব পড়তে পারে, বা তারা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে, তাহলে তা যথাসম্ভব সাধারণদের মজলিসে চর্চা না করা।

১৭. কারামতের কারণে ঘটা অলৌকিক কোনো ঘটনাকে স্বাভাবিক নিয়ম বা আকিদা-বিশ্বাস বানিয়ে নেওয়া যাবে না। যেমন কোনো কবরস্থ ব্যক্তির সাথে সরাসরি মুসাফাহা করার ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে মনে করতে হবে, এটি স্বাভাবিক নিয়মে নয়, বরং কারামত হিসাবে ঘটেছে। তাই এখান থেকে এ আকিদা পোষণ করা যাবে না যে, কবরস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই তার হাত কবর থেকে বের করতে পারে। তদ্রূপ কারামতের মাধ্যমে কোনো ঘটনা ঘটলে আর এর রহস্য বুঝে না এলে অলিদেরকে এ কারণে দোষারোপও করা যাবে না।

কারামত প্রকাশের কারণ

১. কারামত প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। সেইসাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুই তাঁর আদেশে হয়।

২. কারামতের মাধ্যমে ওই সকল ব্যক্তি মিথ্যুক প্রমাণিত হয়, যারা বলে সবকিছু প্রাকৃতিকভাবে হয়। অথচ তা হচ্ছে না। কাজেই স্বভাব ও প্রকৃতির বিপরীতে কিছু ঘটা থেকে বোঝা যায়, এগুলোর একজন স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রণকারী আছেন।

৩. কারামত মূলত নবির মুজিজা, কারণ কারামত নবিকে অনুসরণের বরকতেই হয়ে থাকে।

৪. কারামত দ্বারা মূলত অলিকে সম্মান করা হয় এবং তাকে ঈমান ও আমলের ওপর অবিচল রাখা হয়। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অন্যদের তুলনায় বেশি মজবুত থাকার কারণে তাদের মাঝে কারামতের প্রকাশও কম।

৫. কারামতের সাহায্যে মুসলিমদেরকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করা হয়। সুবহানাল্লাহ!

স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম

১. অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তিনটি মাধ্যম—

ক. নিজ শক্তির মাধ্যমে পূর্বাপর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ইলম ও জ্ঞান থাকা। এটাকে বলা হয়, 'ইলমুল গাইব'। এই ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট আছে।

খ. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে অদৃশ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞান অকাট্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তা শরিয়তের দলিল। তবে এই জ্ঞান শুধুই নবিদের সঙ্গে খাস। নবিরা এ ক্ষেত্রে ততটুকুই জানতে পারেন, যেটুকু আল্লাহ তাদের জানান।

গ. স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অদৃশ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা। এই জানাটা যেহেতু হয় অনুমাননির্ভর, সেহেতু এই জানা দ্বারা অকাট্য কোনো জ্ঞান অর্জন হয় না। আর এই প্রকারের জ্ঞান শরিয়তের কোনো দলিলও নয়।

২. স্বপ্ন বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ.
>
> স্বপ্ন তিন প্রকার : (১) ভালো স্বপ্ন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা সুসংবাদস্বরূপ। (২) শয়তানের পক্ষ থেকে পেরেশানকারী স্বপ্ন। (৩) কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন।[৫৫৬]

৩. কাশফ ও মুকাশাফাহ বলা হয়, অদৃশ্য জগতের কোনো কথা প্রকাশিত হওয়াকে। কাশফ কখনো সঠিক, আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত, কখনো আবার বাস্তবপরিপন্থীও হয়।

---

৫৫৬. *তিরমিজি*, ২২৭০

৪. শুহুদ ও মুশাহাদাহ বলা হয়, সরাসরি দেখাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তার অলিদের ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায় অদৃশ্য জগতের অথবা দূরবর্তী কোনো স্থান ও ঘটনার পর্দা ও প্রাচীর উন্মুক্ত করে বিষয়টি সরাসরি অবগত করিয়ে থাকেন।

৫. ইলহামের পারিভাষিক অর্থ হলো চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোনো কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। অনেকে এটাকে ফিরাসাতও বলেন।

৬. কাশফ-মুকাশাফাহ, শুহুদ-মুশাহাদাত ও ইলহাম—এগুলো মূলত কারামতেরই প্রকার।

৭. আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ও কারামতের মাধ্যমে কোনো বিষয় জানতে পারাকে ইলমুল গাইব বলে না। কেননা এটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, বরং আল্লাহ যখন জানান তখনই তিনি জানতে পারেন। আবার এ জানাটা নিশ্চিত জ্ঞানও নয়। তাই এ ধারণা রাখার কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাগণ গায়েব জানেন।

৮. স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান যদি শরিয়তবিরোধী অথবা শরিয়তের সাথে মানানসই না হয়, তাহলে তার অনুসরণ জায়েজ নেই। আর শরিয়তবিরোধী না হলে, তা কেবল ওই ব্যক্তির সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে, অন্যের ওপর এর প্রয়োগ জরুরি নয়।

৯. স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম—এগুলো বিশ্বাস করা যাবে, যদি তাতে কুরআন-সুন্নাহ ও শরিয়তবিরোধী কিছু না থাকে, বরং শরয়ি বিধানের অনুকূলে থেকে এর দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হতে পারলে তাও করা যাবে। যেমন কেউ স্বপ্নে দেখল অমুক কাজটা করলে তার ব্যবসায় বরকত হবে। আর এ কাজটা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়, বরং ভালো। তাহলে তার জন্য এ কাজ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু স্বপ্নে দেখা এই নির্দেশকে শরিয়তের হুকুম মনে করা যাবে না।

১০. কেউ যদি কোনো বুজুর্গ সম্পর্কে এমন আকিদা রাখে যে, তিনি সবসময় আমার অবস্থা জানেন, তাহলে তা শিরক হবে।

১১.কোনো পির ও বুজুর্গকে দূর দেশ থেকে এই বিশ্বাস নিয়ে ডাকা যে, তিনি শুনছেন বা জানছেন, তাহলে তা শিরক হবে।

১২. স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম সম্পর্কে একটি সর্ববিদিত মৌলিক কথা হলো, এগুলো সবই ইচ্ছাশক্তির বাহিরের বস্তু। কাজেই এগুলো শরিয়তের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং শরিয়তের কাম্য বস্তু হতে পারে না। কাজেই বিধিবিধানের ভিত্তি হলো শরিয়তের দলিলসমূহের ওপর, কাশফ, ইলহাম ও স্বপ্নের ওপর নয়।

ওহি, স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের মধ্যকার পার্থক্য

১. ওহি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়। ফলে তার জ্ঞান নিশ্চিত ও অকাট্য এবং তাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এর বিপরীতে স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের সংবাদ কোনোটিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হওয়া নিশ্চিত নয়, তাই এগুলো সন্দেহযুক্ত।

২. ওহি কখনো ভুল হয় না। কিন্তু স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম ভুল হওয়ার অবকাশ রাখে।

৩. নবির জন্য ওহি বুঝতে পারা ও সংরক্ষণ করে রাখার বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। আল্লাহ নিজেও তা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। বিপরীতে স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম বান্দার জন্য বুঝতেও অনেক সময় ভুল হয়। আবার বুঝলেও অনেক সময় তা ঠিকঠাক স্মরণ রাখা যায় না।

৪. নবি-রাসুলদের ওহি শরিয়তের দলিল, কিন্তু কারও কাশফ, ইলহাম ও স্বপ্ন শরিয়তের দলিল নয়, ফলে এসব দ্বারা কোনো বিধিবিধান সাব্যস্ত হবে না এবং কোনো বিধানকে রহিত করা যাবে না। আকিদা-বিশ্বাস প্রমাণ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

❋❋❋
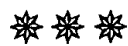
দেহবাদী আকিদা হতে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রত্যাবর্তন

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. উল্লেখ করেন,

ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال : أنا أشعري، ثم وجد خطه بما نصه الذي اعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت، وأن قوله (الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ) ليس على ظاهره ولا أعلم كنه المراد به بل لا يعلمه إلا الله ، والقول في النزول كالقول في الاستواء ، وكتبه أحمد بن تيمية ثم شهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختارا.

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সাথে একবার কতক ফুকাহায়ে কেরামের বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। যার সারাংশ হলো তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেন, আমি আশআরি। তার স্বহস্তে লিখিত কাগজে পাওয়া যায় যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, কুরআন আল্লাহ তাআলার সত্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অনাদি সিফাত, যা সৃষ্ট নয় এবং আল্লাহর কালাম তথা কথা শব্দ ও স্বরবিশিষ্ট নয়। الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ—'রহমান আরশে ইসতাওয়া', আয়াতটি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। তবে আমি জানি না এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ ছাড়া এটা কেউই জানেন না। ইসতাওয়ার বিষয়ে যা বলেছি, নুজুল (অবতরণ) সম্পর্কেও আমার একই কথা।

উপরোল্লেখিত কথাগুলো লিখেছেন আহমাদ বিন তাইমিয়া। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় পূর্বের অসংগতিপূর্ণ আকিদা থেকে তাওবা করেছেন।[৫৫৭]

---

৫৫৭. *আদ-দুরারুল কামিনা*, ১/৮৯-৯০

আকিদা ও শাখাগত মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ. যে ভুলগুলো করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে তার ও পরবর্তী যুগের অনেক ইমামই উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম তাকিউদ্দিন ও তাজুদ্দিন সুবকি, ইমাম ইবনুল মুআল্লিম আল-কুরাশি, ইমাম জামলাকানি, আল্লামা আখনায়ি, ইবনে জাহবাল, ইবনে জামায়া, ইমাম হিসনি, ইবনে হাজার হাইতামি, আলাউদ্দিন বুখারি প্রমুখ অন্যতম।

হাফেজ যাহাবি ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে বলেন,

> وأنا (الذهبي) لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية.
>
> আমি তাকে (অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়া)-কে ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করি না, বরং কিছু আকিদা ও শাখাগত মাসআলায় আমি তার বিরোধিতা করি।[৫৫৮]

আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন,

> واعلم أن الذهبي كتب كتابا إلى ابن تيمية : إنك تزعم أنك كتبت عقائد السلف في رسائلك وهذا غلط فإنه من آرائك.
>
> জেনে রাখো, যাহাবি ইবনে তাইমিয়ার নিকট একটি চিঠিতে লেখেন, আপনার ধারণা, আপনার কিতাবাদিতে যে আকিদাগুলো আপনি লিখছেন, তা সালাফদের আকিদা, অথচ এটা ভুল, এগুলো বরং আপনারই মত।[৫৫৯]

ইবনে হাজার রহ. যেমন ইবনে তাইমিয়ার প্রশংসা করেছেন, তেমনই তার ভুলেরও সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে। যেমন তার একটি মত হচ্ছে, শুধু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নেই। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার এই মত সম্পর্কে লেখেন,

> وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.

---

৫৫৮. আদ-দুরারুল কামিনা, ১/৯১

৫৫৯. *ফাইজুল বারি*, ৫/৬২৪

ইবনে তাইমিয়া থেকে বর্ণিত জঘন্য ও কুৎসিত মাসআলাসমূহ থেকে এটি একটি।[৫৬০]

ইবনে হাজার হাইতামি রহ. বলেন,

وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما.

তুমি ইবনে তাইমিয়া, তার ছাত্র ইবনুল কাইয়ুম এবং তাদের অন্যান্য অনুসারীদের কিতাব শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকো।[৫৬১]

আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন,

أما الحافظ ابن تيمية فلا ريب أنه بحر مواج لا ساحل له ، ولكن شذ في مسائل من الأصول والفروع جمهور الأمة المحمدية والحق مع الجمهور ... غير أن في طبعه حدة وشدة ، فيزعم تحقيقه كالوحي النازل من السماء وإن كان خلاف الواقع ولا يبالي بمن خالفه وإن كان على الحق.

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফেজ ইবনে তাইমিয়ার ইলম অসীম সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু কিছু আকিদা ও শাখাগত মাসআলায় তিনি উম্মতে মুহাম্মাদির সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সাথে মতানৈক্য করেছেন। অথচ এসব মাসআলায় প্রকৃত সত্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতোই। ...তা ছাড়া তার স্বভাবের মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা বিদ্যমান। ফলে তিনি তার গবেষণাকে জ্ঞান করতেন যেন আকাশ থেকে নেমে আসা ওহি। যদিও কিনা সেই গবেষণাগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো মিলই ছিল না। এমনকি তার ভিন্ন মতধারী যদি হকের ওপরও থাকত, তবু তিনি তাকে পরোয়া করতেন না।[৫৬২]

তবে হ্যাঁ, একটা সময় ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মধ্যে এই বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হলেও জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং সে পথ পরিহার করেন। হাফেজ যাহাবি রহ. বলেন,

---

৫৬০. *ফাতহুল বারি*, ৩/৮০
৫৬১. *আল-ফাতাওয়া আল-হাদিসিয়া*, ২০৩
৫৬২. *ফাইজুল বারি*, ২/২১০-২১১

كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول : أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.

আমাদের শায়েখ ইবনে তাইমিয়া জীবনের শেষ দিনগুলোতে বলতেন, উম্মতের কাউকে আমি কাফের বলি না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনই কেবল যত্ন সহকারে অজু করে। কাজেই যে যত্ন সহকারে নিয়মিত অজু করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, সেই মুসলিম।[৫৬৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ইন্তেকালের পর হাম্বলি মাজহাবের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ অন্ধের মতো তার ভুলগুলোকে অনুসরণ করে এসেছে। বর্তমানেও তথাকথিত সালাফিগণ 'সহিহ' বা 'সালাফি আকিদা' নামে যে আকিদার প্রচার-প্রসার করে চলেছেন, তা মূলত তার সেই ভুল আকিদাগুলোই, যা থেকে তিনি পরবর্তী সময়ে তাওবা করে ফিরে এসেছিলেন।

বাংলাদেশের 'সহিহ' নামধারী শায়েখদের প্রতি আমাদের বিনীত আরজ থাকবে, আল্লাহকে ভয় করুন, দয়া করে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ মানুষ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে তারা কুরআন-হাদিস-আকিদা সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখে না এবং ততটা সচেতনও না। আপনারা কেন তাদের এই সারল্যকে পুঁজি করে তাদের পরকালকে এভাবে বরবাদ করে দিচ্ছেন?

কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রশ্ন করেন যে, কেন তোমরা জেনেশুনে ইবনে তাইমিয়ার সহিহগুলো বাদ দিয়ে ভুলগুলো গ্রহণ করলে এবং সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করলে? কী জবাব দেবেন তখন আপনারা? ভেবে দেখেছেন কি কখনো?

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইমাম বাকিল্লানি, বাইহাকি, কুরতুবি, রাজি, নববি, এমনকি ইবনে হাজার রহ.-এর মতো এমন শত-সহস্র ইমামের আকিদা তো এমন ছিল না। আপনারা বরং সহিহ বা সালাফিদের নামে যেসব ভুলভাল আকিদা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তা ছিল ভ্রান্ত দেহবাদীদের

---

৫৬৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৮৮

আকিদা। প্রতিটি শতাব্দীতেই সমকালীন নির্ভরযোগ্য মুহাক্কিক আলেমগণ এসব আকিদার বিরোধিতা করেছেন। এমনকি এগুলোর বিরুদ্ধে উম্মাহকে সতর্ক করার জন্য তারা কলমও ধরেছেন। অথচ আজ কিনা সেই ভ্রান্ত দেহবাদী আকিদাকেই আপনারা মানুষের আবেগ কুড়ানোর জন্য 'সহিহ' ও 'সালাফি' নাম দিয়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আর ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের ঈমানের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। দ্বীনের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাকে কাজে লাগিয়ে বরবাদ করে দিচ্ছেন তাদের আখেরাতকে। আমার প্রিয় ভাই ও শায়েখগণ, আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহর কসম! আপনারা আল্লাহকে একটু ভয় করুন।

উম্মাহর উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে মানুষকে বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকা সম্পর্কে সচেতন করে এসেছেন। এজন্য তারা যে যেভাবে পেরেছেন, খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। যার শক্তি ও প্রতিভা যেমন ছিল, সেটাকেই তারা কাজে লাগিয়ে হকের পয়গাম তুলে ধরেছেন। আমি অধম, তাদের পায়ের ধুলারও সমান নই। তবু তাদের দেখানো পথে কদম রাখার ঈষৎ প্রয়াস পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সাধ্যে যেটুকু সম্ভব, কুরআন, হাদিস ও সালাফদের কথাগুলোকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে যা-কিছু সঠিক, নিশ্চয় তা আল্লাহরই অনুগ্রহ। আর যা-কিছু ভুল, তা অধমের ভুল মেনে নিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। আল্লাহ আমার এ যৎসামান্য খেদমতকে কবুল করে নিন এবং সালফে সালেহিনের মুবারক কাতারে অধমের নামকে শামিল করে নিন। আমিন।

নিশ্চয় আল্লাহ যার কল্যাণ চান, প্রকৃত সালাফদের আকিদা সেই গ্রহণ করবেন। তবে ভয়ের কথা হলো, আল্লাহ না করুন, যদি কারও অন্তরে তিনি মোহর মেরে দেন, তবে কেইবা আর পারবে তাকে হেদায়েত দিতে! আল্লাহ আমাদের সকলকে তা থেকে হেফাজত করুন এবং প্রকৃত সালাফদের আকিদা অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমিন। জগতের সকল ভুলকে ভুল এবং সঠিককে সঠিক হিসাবে মেনে নিয়ে যাবতীয় বুঝহীন অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ, যা আমাদের বীভৎস গোমরাহির অতলে নিমজ্জিত করবে, আল্লাহ তা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

ولله الحمد

চেতনা থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
স্বপ্নের চেয়েও বড়	মাহমুদ তাশফীন	আত্মশুদ্ধি
তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরের ডাক	ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া	ইবাদাত
ইকরা বিসমি রাব্বিকা	ড. আয়েয আল কারনী	ইলম শেখার দিকনির্দেশনা
সৌভাগ্যের দুয়ার	ড. আয়েয আল কারনী	আত্মশুদ্ধি
রাজার মত দেখতে	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
শিক্ষিত বালক	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে	ড. সালিহ্ আল মুনাজ্জিদ	আত্মশুদ্ধি
ইলম অন্বেষণে সফর	ড. সালিহ্ আল মুনাজ্জিদ	ইলম
মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি	কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ	ইতিহাস
স্মরণীয় মনীষী	জুবাইর আহমদ আশরাফ	জীবনী
ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস পাঠের দিকনির্দেশনা
সিন্ধু থেকে বঙ্গ	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
মুখতাসার রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	কুরআনি চিকিৎসা
নির্মল জীবন	ইমরান রাইহান	আত্মশুদ্ধি
শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল	ইতিহাস
মাওয়ায়েজে সাহাবা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
আকিদার মর্মকথা	সামিরুদ্দিন কাসেমি	ঈমান আকিদা
সালাফদের ইবাদাত	মাহমুদ তাশফীন	ইবাদাত
সকাল সন্ধ্যার দুআ ও যিকির	মুফতি ইবরাহীম হাসান	দুআ ও যিকির
ইলাল কুরআনিল কারীম	তাওসীফ মুসান্না	কুরআন শিক্ষা
মুসলিম জাতির ইতিহাস	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
দ্রোহের তপ্ত লাভা	আলী হাসান উসামা	সংস্কার ও দর্শন
মুরিদপুরের পীর	ইমরান রাইহান	রম্যরচনা
শাকহাব প্রান্তরে	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বিবাহভাবনা	ওয়াহিদুর রহমান	বিশেষ সংখ্যা
রুকইয়ার আয়াত	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	রুকইয়া

বই	লেখক	বিষয়
আলোর পিদিম	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	প্রবন্ধ সংকলন
মুশাজারাতে সাহাবা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
ইতিহাসের অজানা অধ্যায়	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বুনিয়াদি আকাইদ	মাওলানা বেলাল বিন আলী	আকিদা
গোসলবিহীন জানাজা	এনামুল হক মাসউদ	শহিদের মর্যাদা
লেজেন্ডস অব ইসলাম ২খণ্ড	শায়খ আহমাদ মুসা জিবরীল	ইতিহাস

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
নবিজি : যেমন ছিল তাঁর দিনগুলো		সিরাত
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	আলী হাসান উসামা	স্বপ্নের ব্যাখ্যা
সাফাভি সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
ইমাম গাজালির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
ইবনে তাইমিয়ার নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
হাসান বসরির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
উমাইয়া সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
পলাশি থেকে ধানমণ্ডি	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
পশ্চিমা সভ্যতার মূল ভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা : পরিচয় ও উদ্দেশ্য	আব্দুল্লাহ বিন বশির	পুঁজিবাদ
সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া	মুফতি মোহাম্মদ শফি রহ.	সিরাত
ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম	সদরুল আমীন সাকিব	ইসলামধর্ম
দাওয়াহ	ডা. শামসুল আরেফীন	দাওয়াতি পদ্ধতি
ক্যারিয়ার ভাবনা	ডা. শামসুল আরেফীন	ক্যারিয়ার
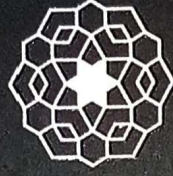
লেখক পরিচিতি

জন্ম আশির দশকের শেষে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার নোয়াখলা ইউনিয়নের সর্দার বাড়িতে। শনির আখড়া বাইতুর রাসুল মাদরাসা থেকে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করে মাদরাসাতুল মাদিনায় ভর্তি হন। দাওরা শেষ করেন মাদানীনগর মাদরাসা থেকে ২০১৩ সালে। আল-মারকাজুল ইসলামি'তে মাওলানা শহিদুল্লাহ ফাজলুল বারী রহ.-এর নিকট আদব পড়েন। আকবর কমপ্লেক্সে উলুমুল হাদিস পড়েন। তারপর এক বছরের একটি ইফতা বিভাগে ইফতা শেষ করে তাদরিস ও লেখালেখির কাজ করছেন।

“বুনিয়াদি আকাইদ” হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকিদার ওপর লেখা একটি কিতাব। কিতাবটিকে দুই ভাগে সাজানো হয়েছে; প্রথমভাগে রয়েছে আকিদার বুনিয়াদি ছয়টি বিষয় যেমন, আল্লাহ তাআলা, নবি-রাসুলগণ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল ও তাকদির এবং এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, জিন ও শয়তান, আরশ, কুরসি, কলম, লাওহে মাহফুজ, ঈমান, কুফর ও শিরক ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আকিদাসমূহকে দলিলসহ খুবই সহজ সরলভাবে এবং নাম্বার দিয়ে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ভাগে আকিদার সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনকিছু বিষয়কে দালিলিকভাবে পেশ করা হয়েছে, যে-সকল বিষয়কে পুঁজি করে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের দেহবাদী, হাশাবি ও বেদআতী বানিয়ে দিচ্ছে। যেমন আল্লাহ তাআলা কোথায়?, আল্লাহ তাআলার কি হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে?, আল্লাহ তাআলার কি সুরাত রয়েছে?, আল্লাহ তাআলা কি বিশ্বের ভেতরে আছেন না বাহিরে?, আল্লাহ তাআলার সিফাত কত প্রকার ও কী কী?, তাওহিদ কত প্রকার?, আল্লাহ তাআলার কালাম কি মাখলুক?, তাফবিদ, তাবিল, ইসতাওয়া, অসিলা, কারামাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যসহ পেশ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।